ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

দ্বিতীয় বর্ষ □ অষ্টম সংখ্যা □ মার্চ ২০১৪ □ ৩০ টাকা

Read Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

জাহানারা ইমামের
একাত্তরের দিনগুলি
মুক্তিযুদ্ধের আগুনঝরা দিনের চাক্ষুষ ধারাভাষ্য

শুভাপ্রসন্নর
ধারাবাহিক আত্মকথা
আমার ছবিজীবন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্ট্রিট লেন বাই-লেন

নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস
নীলকণ্ঠ ঘোষালের
কমলহিরের আলো

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ছিন্নবিচিন্তা

চিঠিপত্রে কমলকুমার
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি

বুদ্ধদেব গুহর দু'টি গল্প
'তা' ও 'ব্রন্টি'

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ কথা
তিন নৌকায় তেইশজন

কালীকৃষ্ণ গুহর কলমে গ্রিক কথামৃত | নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত একাদশ কবিতা
কবিতা-পরিচয় | রম্য-পাঠ | চণ্ডীমণ্ডপ | বই-ঠেক | ক্ষণের বচন | শব্দবক্র

২৪"×৩০" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

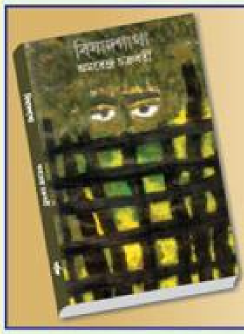

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
প্রথম উপন্যাস
বিষাদগাথা
হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান
অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস।
নদীহারা এক গ্রামের দর্পণে
দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র
কিংবা সমকালীন রূপকথা।
₹২০০

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in

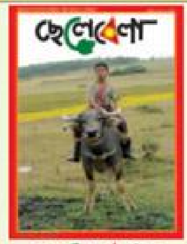
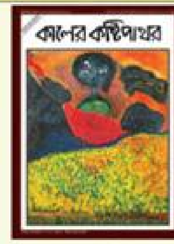

ভ্রমণ www.bhraman.com
ছেলেবেলা www.echhelebela.com
কালের কষ্টিপাথর www.ekashtipathar.com

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

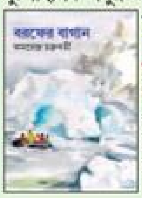

বরফের বাগান
আন্টার্কটিকার রহস্যময়
তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
₹১২০

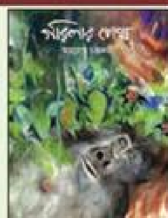

নতুন কিশোর উপন্যাস
গরিলার চোখ ₹৮০

শাদা ঘোড়া ₹৩০

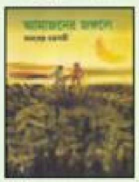
আমাজনের জঙ্গলে
সপ্তম মুদ্রণ ₹৭০

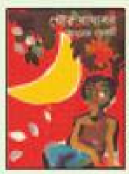
গৌর যাযাবর
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১২০

লেখকের অন্যান্য বই: ঋষিকুমার ₹২০ ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ ভূতের বাঁশি ₹৪০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

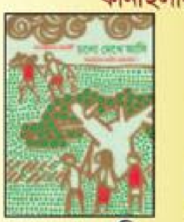
চলো দেখে আসি ₹২০

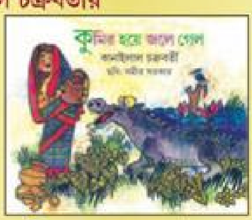
কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

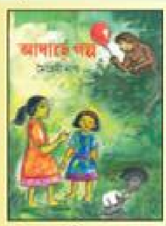
মৈত্রেয়ী নাগের
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

Buy Online ▸ www.swarnakshar.in

সিডি হীরু ডাকাত বই

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে
জমজমাট
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
হীরু ডাকাত
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি
সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়। ₹৯৯

পাগলকরা ছন্দে দম বন্ধ
করা ডাকাতের গল্প

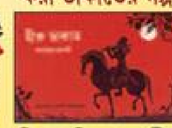

শিশুসাহিত্যে জাতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত।
৯ম মুদ্রণ ₹৪৫

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০
শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা ₹১৫০
নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০
প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে ₹৭৫
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

১ম খণ্ড। ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে
থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়,
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা
নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন
বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন
দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com
www.ekashtipathar.com

আমাদের সব বই
সব পত্রিকা ও
হীরু ডাকাতের সিডি
এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম
চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও
অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা ₹৫০ আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০ আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০
এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া।
সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান।
অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

এবার অর্ধেক দামে

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলেও খোঁজ করতে পারেন।

প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

**ঘরে বসে অর্ধেক দামে
নিয়মিত পত্রিকা পেতে
অনলাইন গ্রাহক হোন**
www.swarnakshar.in

নিখরচায় পড়তে পারেন:
www.ekashtipathar.com

**এখনই গ্রাহক হয়ে সারা বছর অর্ধেক দামে পত্রিকা পেতে
নীচের নামে ও ঠিকানায় ১৮০ টাকার চেক পাঠান**

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

₹২০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

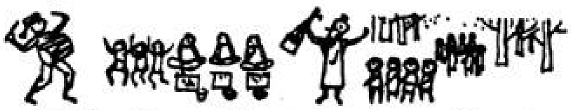

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

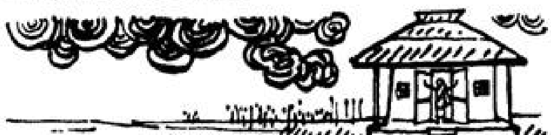

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

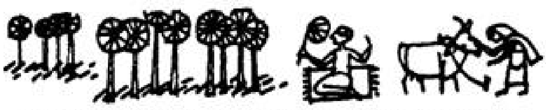

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

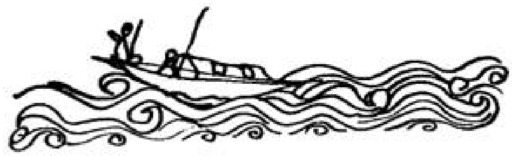

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

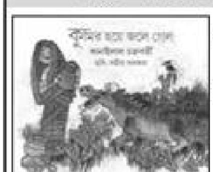

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

দ্বিতীয় বর্ষ। অষ্টম সংখ্যা। মার্চ ২০১৪। চৈত্র ১৪২০

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৭

ক্ষণের বচন ১০। শব্দবক্র ১০

চণ্ডীমণ্ডপ। ড. কালিদাস নাগ। চণ্ডী লাহিড়ী ৯

চিঠিপত্রে কমলকুমার ২১

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি ২৭

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের দলিল

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৩

নি য় মি ত

গ্রিক কথামৃত। কালীকৃষ্ণ গুহ ১৯

আত্মজীবনী

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৪০

প্রসঙ্গ মহাজনসঙ্গ: শেষ কথা ১১

মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

ছিন্নবিচিন্তা। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৩

গ ল্প

দু'টি গল্প: 'তা' ও 'ব্রন্টি'। বুদ্ধদেব গুহ ৪৬

র ম্য - পা ঠ

বইবাজার। সাগর চৌধুরী ৫২

ক বি তা র পা তা

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত একাদশ কবিতা ৬৭

কবিতা-পরিচয়

গ্যেটের অষ্টম প্রণয়: বুদ্ধদেব বসু ৬২

নরেশ গুহ ● শুভময় রায়

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● সিদ্ধেশ্বর সেন ৬৫

ভ্র ম ণ ক থা

তিন নৌকায় তেইশজন। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩২

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
চিৎপুর রোড ৭০

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

কমলহিরের আলো। নীলকণ্ঠ ঘোষাল ৫৭

অ ন্যা ন্য

কয়েকটি চিঠি ৭২। বই-ঠেক ৭৫

প্রচ্ছদ: ২৪"×৩০" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in

Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

নারীযুগ

রাস্তায় রাক্ষসদের রুখে দিন

মেয়েদের হয়ে কথা বলুক

সাহস থাকলেই নিশ্চিন্ত

প্রতিফলিত হোক মেয়েদের ভাবনা

নারীযুগ

ভারতীয় ভাষায় প্রথম মহিলাদের দৈনিক সংবাদপত্র

রোজ সকালে সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে পাওয়া যায়

না পেলে ফোন করুন: 9830883322 **বা SMS:** 9051414333

অথবা **E-mail:** narijug@gmail.com **Website:** www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

চৈত্র ১৪২০ □ মার্চ ২০১৪

উদ্ধৃতি

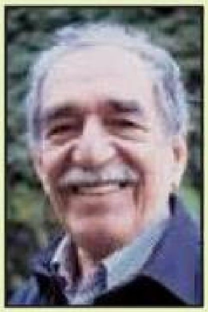

মা যখন জন্ম দেন একমাত্র তখনই জন্ম নেয় না মানুষ. নিজের জীবনে সে বার বার নিজেকেই জন্ম দেয়।

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ
'লাভ ইন দ্য টাইম অব কলেরা' উপন্যাস থেকে

স ম্পা দ কী য়

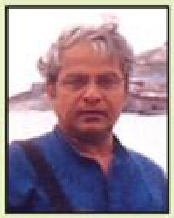

বায়ুদূষণ আয়ুদূষণ ভাবদূষণ ভাবনাদূষণে চারদিক যখন ক্রমশ আরও কালো হয়ে আসে তখনই হয়তো কোনও কোনও বিস্ময়-বইয়ের আলো এসে মানুষকে বাঁচায়। অথবা হয়তো যুগের কালো আর বইয়ের আলো চিরকালই সমান্তরালে চলতে থাকে।

নাকি, আমাদের ভাষায় অন্ধকার-থেকে-আলো-অভিমুখি তেমন সৃষ্টি সম্প্রতি আর হচ্ছেই না? দুর্যোগ-আচ্ছন্ন এই যুগে আমরা কি তবে আমাদের প্রাপ্য সাহিত্যই পাচ্ছি, এজরা পাউন্ড যেমন বলে গিয়েছেন?

অথচ, আমার আবছা বিশ্বাস, নির্মল বায়ু ছাড়া যেমন আমরা বাঁচি না, মহৎ বই ছাড়াও তেমনই আমাদের জীবন অন্ধকার। এ কথার সবটাই যদি আমার ইচ্ছাপূরক কথা বলে ধরে না নেন, তাহলে পাঠকের প্রতি আমার বিনীত আবেদন— যে-কোনও যুগের যে-কোনও ভাষার ভালো বইয়ের আলোর সন্ধান দিন আমাদের। জীবনের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রার পথ-দেখানো বইয়ের নাম-পরিচয় অন্তত লিখে জানান। এরকম সব বইয়ের নাম ও পরিচিতি 'কালের কষ্টিপাথর'-এর প্রতি সংখ্যার একটা পৃষ্ঠাও যদি ভরে থাকে তাহলে সেও এই বিষাদছাওয়া দেশে-কালে ক্ষীণ একটা আশার আলো দেখাবে।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

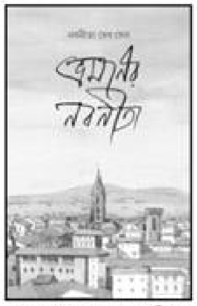

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

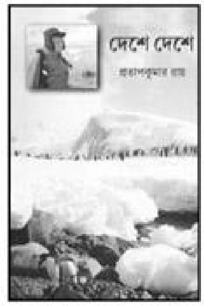

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

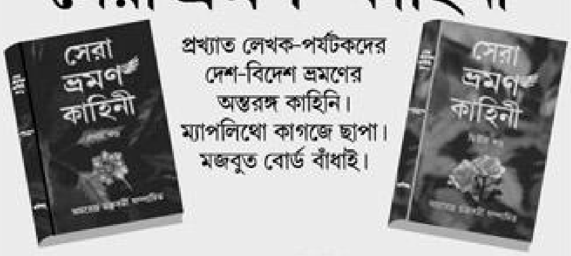

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড । ৪র্থ মুদ্রণ ₹৫০০ **দ্বিতীয় খণ্ড** । ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

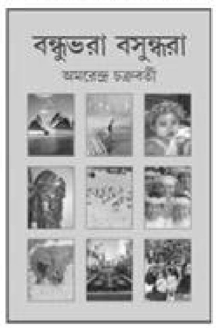

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

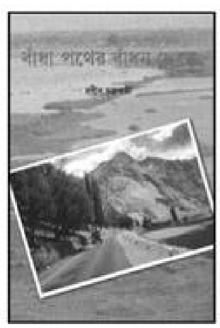

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

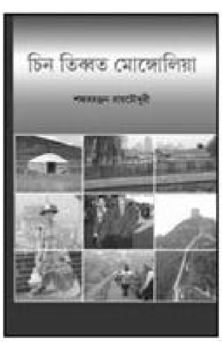

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: **2283 2320** Fax: **2287 6448**
E-mail: **info@swarnakshar.in**

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

ড. কালিদাস নাগ

লেখা ও ছবি: চণ্ডী লাহিড়ী

রবীন্দ্র পরিকরদের মধ্যে একটি অনালোচিত অথচ অতি শ্রদ্ধেয় নাম ড. কালিদাস নাগ। কল্লোলখ্যাত গোকুল নাগের দাদা হিসেবে তাঁর নাম মাঝে মাঝে অবশ্য উচ্চারিত হয়।

যে গল্পটির কথা লিখতে বসেছি সেটা পরস্মৈপদী। প্রবাসীর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন নলিনীকুমার ভদ্র। তাঁর কাছে শোনা। ড. কালিদাস নাগ ছিলেন কানে কালা। বিয়ে করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা শান্তা দেবীকে। বিয়ের পরদিন ফুলসজ্জার রাত্রে সমবয়সি বন্ধুদের স্ত্রীরা আড়ি পাতলেন, ফুলসজ্জার রাত্রে পাত্র-পাত্রীর (বর-কনে) মধ্যে গোপন আলাপচারিতা কী হয় সেটা জানার কৌতূহল নিয়ে। সাধারণত নতুন সদ্যবিবাহিত দম্পতি ফুলসজ্জার রাত্রে প্রেম-প্রণয়, ওগো তোমায় আমি কত ভালোবাসি, বা কোথায় হানিমুন করা যেতে পারে এসব নিয়েই কথা বলেন। অর্থাৎ তরল বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়। কিন্তু ড. নাগ শুরু করলেন ইন্দোনেশিয়ার বেরোবুদুরে ভারতীয়রা কীভাবে গিয়েছিল এবং সেখানে মন্দির বানাতে শুরু করেছিল সেই তত্ত্ব দিয়ে। যারা আড়ি পেতেছিল তারা হতাশ। কোথায় প্রেম নিবেদনের কথা শুনবেন তার বদলে বেরোবুদুরের মন্দির-ভাস্কর্য! তোবা! তোবা! তোবা!!!

রবীন্দ্রনাথ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে জাভা সুমাত্রা ঘুরে এসেছেন। চোল আমলে ওইসব দেশে বহু ভারতীয় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ওইসব দেশকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর ভারত গঠন নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছিল। এই 'প্যান ইন্ডিয়া' ধারণার পুরোধা ছিলেন ড. কালিদাস নাগ। সেই অ্যাকাডেমিক তত্ত্বকথা সদ্যবিবাহিতা শান্তাকে কানে শুনতে হবে এমন দুর্ঘটনা আড়িপাতা মেয়েরা ভাবতেও পারেননি।

ড. নাগ ছিলেন বহুমাত্রিক পণ্ডিত মানুষ। প্যারিসের সোরবোন ইউনিভার্সিটি থেকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করে পি এইচ ডি করেন। প্যারিসে তাঁর সঙ্গে একই পাড়ায় থাকতেন বসন্ত গাঙ্গুলি (সরকারি আর্ট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল) এবং নিউ থিয়েটার্সখ্যাত অমর মল্লিক।

আমি তাঁকে তাঁর বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে মোটে একবার দেখেছি। আমাদের ছবি আঁকার স্কুল কলাভারতীর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও ড. কালিদাস নাগের ইতিহাস বই পাঠ্য ছিল স্কুলে। আমরা পড়েছি।

ক্ষনেরবচন

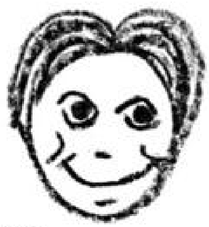

১০১
সরলতা বড় শক্তি
করো তাকে ভয়-ভক্তি।

১০২
খুবই সোজা দয়ামায়া
মধ্যাহ্নে বটের ছায়া।
অনায়াসে অজ্ঞাতে
ছায়া দানে গাছ তাতে।

১০৩
আস্ফালন দম্ভ ক্রোধ
বর্ষশেষে হয় শোধ।

১০৪
প্রত্যেকের মনে দুঃখনদী
বয়ে চলে সান্ত্বনা অবধি
সেই সান্ত্বনা তাকে দিলে
ঠাঁই হবে বিশ্ব নিখিলে

ক্ষণকথক

ছবি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

শব্দবক্র

১০১। প্রতিদাহ

বিশেষ্য; প্রবল ক্ষোভে জ্বলে উঠে কোনও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ক্ষতিপূরণের নামে যে প্রবলতর অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে।

১০২। ফোনগাঁ

বিশেষ্য; যে গ্রামে মোবাইল ফোনের সংখ্যা গ্রামের বাড়িঘর, গাছপালা এমনকী জনসংখ্যার চেয়েও বেশি।

১০৩। নিশানকোণ

বিশেষ্য; ঘর গুছানোর সময় কোনও জিনিস যখন ফেলাও যায় না আবার রাখাও যায় না, ঘরে যে নির্দিষ্ট কোণাটিতে তা ফেলে রাখার উদ্দেশ্যে সযত্নে জমা করা হয় তারই পোশাকি নাম—

— কী ঝামেলায় পড়েছি বলো তো! বাস্তু অনুযায়ী বাড়ি করেছি। খাওয়া, শোওয়া, খবরের কাগজ পড়া, পূজাপাঠ, সব নিয়ম মেনেই করি। নিশানকোণ সম্বন্ধে তো কিছুই তেমন লেখা নেই...

— এ তো সোজা ব্যাপার! দুর্যোগ যখন সাধারণত ঈশানকোণ থেকেই আসে, তখন ওদিকেই যত বাজে জিনিস রাখো না কেন?

১০৪। অংবঙ্গানুবাদ

বিশেষ্য; যে অনুবাদের গুণে বিজাতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের তুলনায় সে ভাষার বাক্যের গঠনরীতিই বাঙালি পাঠকের কাছে বেশি প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে—

— বইমেলা থেকে কাল যে বইটা কিনলাম, তা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। শব্দগুলো যদিও সবই বাংলা। এদিকে মলাটেও লেখা রয়েছে 'বঙ্গানুবাদ'...

— বোধহয় ছাপার ভুল। ওটা 'অংবঙ্গানুবাদ' হবে।

১০৫। হিজবিজনেস

বিশেষ্য; বিজনেস মিটিংয়ে টাই-জ্যাকেট পরিহিত গম্ভীর মুখধারীরা নোট নেওয়ার ভান করে খাতায় যেসব আঁকিবুঁকি কেটে থাকেন—

ম্যানেজার: ...অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এবারে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা নতুন ধরনের কালচারাল ইভেন্ট কী করা যায় বলুন দেখি। চ্যাটার্জি, খসখস করে কী অত নোট নিচ্ছেন বলুন তো?

চ্যাটার্জি: অ্যাঁ, হ্যাঁ তা বলছিলাম কী, একটা ইয়ে মানে হিজবিজনেসের প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী করলে হয় না?

শব্দবক্রমুণি

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ৩৩।

প্রসঙ্গ মহাজনসঙ্গ: শেষ কথা

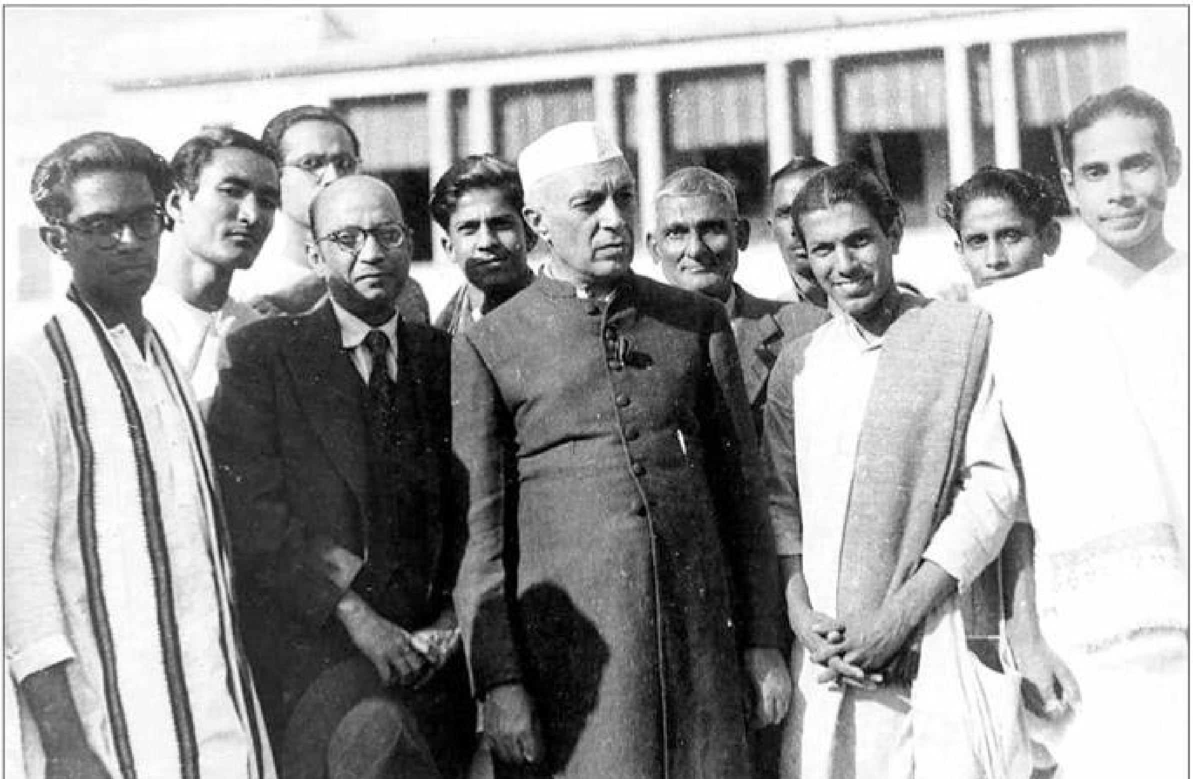

ওপরের ছবিতে
জওহরলাল নেহরুর সফরসঙ্গী
অমিতাভ চৌধুরি
(একেবারে বাঁদিকে)

লিখতে লিখতে ত্রিশ জনের বেশি হয়ে গিয়েছে। কত নাম মনে পড়েছে, আর কত নাম বাদ পড়েছে হিসেব নেই। ইচ্ছে ছিল উইনস্টন চার্চিল সম্পর্কে লেখার। ১৯৬৪ সালে লন্ডনের হাউস অব পার্লামেন্টে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়, কথাও হয়। সে-কথার একবর্ণও আমি বুঝিনি এবং তিনিও আমার ইংরেজি বোঝেননি। তবু তো দেখা হয়েছে। তেমনই দেখা ও কথা হয়েছিল এডওয়ার্ড কেনেডির সঙ্গে। এই কলকাতায়, কলামন্দির নাট্যগৃহে। তিনি দমদম বিমানবন্দর থেকে সোজা কলামন্দিরে এসেছিলেন রবিশঙ্করের সেতার-বাজনা শুনতে। রবিশঙ্কর আগেভাগেই আমাকে টিকিট দিয়েছিলেন তাঁর বাজনা শোনার জন্য। গিয়েছিলাম এবং মমতাশঙ্কর ও চন্দ্রোদয় ঘোষ বলেন, দাঁড়ান, অমিতদা কেনেডি এক্ষুনি আসবেন, এলেনও। আমি এগিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম এবং বেশিক্ষণ কথা বলার অজুহাতে লিফটে না উঠে দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম এবং সামনের আসনে তাঁকে বসিয়ে দিলাম। এমন ভাব দেখালাম যেন উনি আমার অনেকদিনের পরিচিত। সে-বার একমাত্র আমার কাগজই ছাপিয়েছিল এডওয়ার্ড কেনেডি এবং রবিশঙ্করের কোলাকুলির ছবি। অমলাশঙ্করের ভাই বিশু নন্দী আমার ফরমাশমতো সেই ছবি তুলেছিল

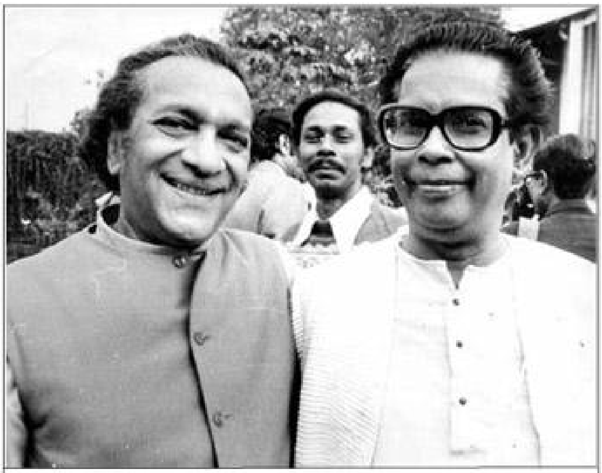

রবিশঙ্কর আগেভাগেই আমাকে টিকিট দিয়েছিলেন তাঁর বাজনা শোনার জন্য

এবং সকলের বাহবা কুড়িয়েছিল।

উদয়শঙ্করের কথা মনে পড়ছে। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়নি। কিন্তু তাঁর একটি নাচের অনুষ্ঠান আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ১৯৪০ সালে শিলচর শহরে সেই অনুষ্ঠান হয়েছিল। আমি ও বাবা গিয়েছিলাম। তারপরেই আমি স্থির করি, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর শিলচর বা কলকাতা নয়, শান্তিনিকেতনে পড়তে যাব, গেলাম। উদয়শঙ্করের সঙ্গে পরেও দেখা হয়েছে কলকাতা এবং শান্তিনিকেতনে। কথা হয়নি, কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করে এসেছি বরাবর। বিদেশে ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন রবীন্দ্রনাথ আর উদয়শঙ্করই।

এই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে লেখা হল না। তার কারণ, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি তাঁর হাতে গড়া ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, তাঁর মৃত্যুর পরে। তবে তখন শান্তিনিকেতনের আকাশ সবচেয়ে রঙিন ছিল। রবি অস্ত যাওয়ার পরই আকাশে রঙের ঝরনা নামে। শান্তিনিকেতনেও নেমেছিল।

লেখা হল না আর একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙালির সঙ্গ। তিনি জাদুকর পি সি সরকার। তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল। কলকাতায় তাঁর বাড়িতেও গিয়েছি। তাঁর জাদু দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর ছেলে শ্রীমান প্রদীপ আমার স্নেহাস্পদ। সে আমার বাড়িতেও এসেছে। জাদুকর হিসেবে সেও খুব নাম করেছে। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে লেখা আর হল না।

বিখ্যাত দুই বিদেশি গায়ক— প্যাট বুন ও ন্যাট কিং কোলের সঙ্গে আমেরিকার সান্টা মনিকায়। প্যাট বুন আমাকে একটি রেকর্ড উপহার দিয়েছিলেন। আজও আছে। ন্যাট কিং কোল সে-বার গলায় ক্যান্সার নিয়ে মারা যান।

ইচ্ছে ছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে লিখি। দেখিনি, লেখাও হয়নি। হয়নি মাইকেল ও ভারত চন্দ্র সম্পর্কে লেখা। আমার মতে তিন শ্রেষ্ঠ বাঙালি— তিনজনই মূলত বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু পদবিতে তা লিখতে হয়— তাঁদের সম্পর্কে লেখার সৌভাগ্য হল না। আগেই বলেছি একজন রবীন্দ্রনাথ অন্য দু'জন রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাছাড়া আরও তিনজন বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বাদ পড়েছেন। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ও শরদিন্দু। তারাশঙ্করের সঙ্গে আলাপ ছিল, কিন্তু লেখার বেলায় বাদ পড়ে গেলেন। বিভূতিভূষণকে আমি দেখিইনি, আর শরদিন্দুবাবু আমার পাশের বাড়ি, তাঁর আত্মীয়ের বাড়ি এসেছেন, কিন্তু আমি জানতাম না বলে দেখা করতে পারিনি। বুদ্ধদেব বসু ও মনোজ বসুর সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল, কিন্তু তাঁদের নিয়ে লেখা হল না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, সমুদ্রগুপ্ত, কালিদাস, আতাতুর্ক, সুলতান মামুদ, সান ইয়াৎ সেন, হিরোহিতো, রুজভেল্ট— কত নাম বাদ পড়েছে। লেখা হল না আমার দুই বিশেষ বন্ধু অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী ও গায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী সম্পর্কেও। উত্তমকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। তাই তিনি বাদ পড়েছেন। অথচ তাঁর ভাই তরুণকুমার ও ভাইয়ের বৌ সুব্রতা চট্টোপাধ্যায় আমার অন্তরঙ্গ ছিল। সুপ্রিয়া চৌধুরীকেও চিনতাম। শান্তিনিকেতনে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা থাকতেন। আর একজন বাদ পড়েছে, সে মৃদুলা গুপ্তা— সিনেমাজগতে অনুভা গুপ্তা নামে পরিচিত, শান্তিনিকেতনে স্কুলে ছাত্রী ছিল। পরে স্টুডিওতে দেখা হলে শান্তিনিকেতনেরই গল্প করতেন। বিয়ে করেছিল রবি ঘোষকে। আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধুজন, তিনিও বাদের তালিকায় এবং বাদ

প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে

পড়েছেন অতি-পরিচিত অনুপকুমার। লেখা হল না তৈমুর লং, পানিনি, ফা হিয়েন, চেঙ্গিস খাঁ, খলিফা ওমর, খলিফা ওসমান, নাসের, সুকর্ণ, হর্ষবর্ধন ও চাণক্য সম্পর্কে। দেখা হয়নি কথাও হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের গানের চার কর্ণধার নিয়ে লিখি-লিখি করেও লেখা হল না শেষ পর্যন্ত। দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অনাদিকুমার দস্তিদার, শৈলজারঞ্জন মজুমদার এবং শান্তিদেব ঘোষ বাদ পড়ে গিয়েছেন। বাদ গিয়েছেন কান্তিচন্দ্র ঘোষ, জাহাঙ্গির ভকিল, একদা মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দ্রকুমার গুজরাল, কর্ণ সিংহ প্রভৃতি বহু নেতা। আরও দুঃখের কথা— বাদ দিতে হয়েছে আমার বাবার ঠাকুরদা বিশ্বনাথ চৌধুরিকে। অত্যন্ত কালারফুল লোক ছিলেন শুনেছি। বাদ যাওয়ার তালিকা অতি দীর্ঘ। অথচ আজকের আমি এঁদের সকলেরই স্নেহে ও প্রশ্রয়ে পুষ্ট। তাঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। *(শেষ)*

(ছবি লেখকের সৌজন্যে)

সুচিত্রা মিত্রর সঙ্গে আলাপচারিতা

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

উনিশ

৫ ডিসেম্বর রবিবার ১৯৭১

বাবা খুব অস্থির হয়ে পড়েছেন। চোখে দেখেন না বলে কানে শোনেন বেশি, অনুভূতি আরও বেশি। গতকাল থেকে বারবার বলছেন, 'তোমরা কি পাগল? এয়ার রেইড সাইরেনকে এভাবে উপেক্ষা করছ? একতলায় সিঁড়ির নীচে না গিয়ে ছাদে ছুটছ?'

সুতরাং আজ সকালেই শরীফকে বললাম, 'শোনো, আজ রোববার ছুটির দিন। একতলার সিঁড়ির নীচে সবার শোয়ার ব্যবস্থাটা আজই করে ফেলি। এখন তো যুদ্ধ কেবল শুরু, পরে সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে। আমরা তো দরকার হলে দুদ্দাড় সিঁড়ি নামতে পারব, বাবাকে তো নামানো যাবে না।'

অতএব, শরীফ ও জামীকে ছাদের মায়া ছেড়ে ঘণ্টাদুয়েকের জন্য নীচে কাজ করতে হল। রুমী-জামীর সিঙ্গল খাটদুটো নীচে নামিয়ে পাশাপাশি পাতা হল, সিঁড়ির নীচে। বেশ চওড়া বিছানা হল, ওপাশে দেওয়ালের দিকে বাবা, তারপর শরীফ, এ পাশে আমি থাকব— এইরকম ঠিক হল। বসার ঘরের ডিভানটা টেনে এনে খাটের মাথার কাছে কোনাকুনি পাতা হল— ওটায় জামী।

খাবার টেবিলটা আগে মাঝখানে ছিল, এখন ওটাকে সরিয়ে ঘরের অন্য পাশের দেওয়াল ঘেঁষে বসানো হল। আগের সেই তক্তপোশটা সরিয়ে দিয়ে এখানে পাতা হল বাবার ইজিচেয়ারটা।

এগুলো করতে প্রায় দুপুর। গতকালই দু'দিনের মতো বাজার করে বুড়া মিয়া সব রেঁধে রেখেছে। গত তিন-চার মাস থেকে এরকমই করা হয়। ফ্রিজে প্রচুর রান্না করা খাবার থাকে। কারণ প্রায়-প্রায়ই 'অনাহূত' (কিন্তু অতি-বাঞ্ছিত) অতিথি এসে পড়ে। আমরা জানি, তারা দিনে রাতের যে-কোনও সময় এসে পড়তে পারে। এসে পড়লে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে পেটভরে খাইয়ে দেওয়াটা আমাদের কর্তব্য। তাই ফ্রিজে সব সময় রান্নাকরা খাবার মজুত, মিটসেফে বিস্কুট, রুটি, মাখন, পনির।

সিঁড়ির নীচের কাজ শেষ হওয়ার আগেই বলে নিলাম এখন আর ছাদে উঠো না। গোসল করে খেয়ে নাও।

ওরা বিনা বাক্যে আমার কথামতো কাজ করল। ওরা আজ আমাকে একটু বেশি মান্য করছে। গতকাল রাত থেকেই আমার মনমেজাজ খুব খারাপ পাড়ার বিহারি পাহারাদারের গাল খেয়ে। গাল সে সবাইকে দিয়েছে। আমার যেন বেশি লেগেছে মনে হচ্ছে। খেতে বসেছি, এমন সময় লুলু এল। এসেই একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। বুড়া মিয়া একটা প্লেট নিয়ে এল। তাকে আজকাল বলতেও হয় না। সে জানে।

খেতে খেতে বললাম, 'লুলু, কাল যে এত খাটলাম কাজে লাগল না। এই খবরের কাগজে শেডে হবে না। কালরাতে পাহারাদার চেঁচিয়েছে বাতির আলো বোঝা যাচ্ছে দেখে।'

লুলু বলে উঠল, 'ও তো বাতির আলো বুঝবেই। নিয়মটা হল শেড না থাকলে যে আলোটা জানালা গলিয়ে মাটিতে পড়বে সেইটা ঢাকতে হবে। কারণ প্লেন থেকে সেইটা বোঝা

বাংলাদেশের সরকারকে ভারতের স্বীকৃতি: পরের দিনের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা

যায়। শেডে পরানোর পর বাইরে আলো না পড়লেই হল। জানালার বাইরে মাটিতে দাঁড়িয়ে পাহারাদার বেটা ঘরের ভেতর বাতির আলো বুঝলে ক্ষতি তো নেই।'

'সেটা ওই পাকিস্তানের খয়ের খাঁ পাহারাদারকে বোঝাবে কে? কাল বোঝাতে গিয়েছিলাম, বহুত গালমন্দ করেছে। সে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার চায়।'

লুলু খানিকক্ষণ নীরবে ভাত খেল, তারপর বলল, 'নিউ মার্কেটে কালো মোটা ড্রয়িংশিট পাওয়া যায়, কিন্তু দাম যে বড্ড বেশি।'

আমি শক্ত মুখে বললাম, 'হোক বেশি। ওই কুত্তাদের গাল শুনতে পারব না। খেয়ে উঠে চল নিউ মার্কেটে যাই।'

জামী এতক্ষণে মুখ খুলল, 'অলক্লিয়ার সাইরেন দেয়নি কিন্তু এখনও।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'না দিক, আমি এর মধ্যেই বেরব।'

খুব মোটা কুচকুচে কালো ড্রয়িংশিট কিনে আনলাম একগাদা। পুরো একেকটা শিট গোল করে সুইসুতো দিয়ে দুই প্রান্ত সেলাই করে লম্বা চোং বানিয়ে বালবের গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। বাতি এবার জানালার বাইরে থেকে বোঝা তো দূরের কথা, ঘরের মেঝেতেই পড়ে কি না সন্দেহ। কাচের জানালাতেও বড় বড় শিট ছোট বোমাকাঁটা ঠুকে এঁটে দিলাম।

এত মোটা শিট, আঠাতে শানাবে না।

সন্ধ্যার পর জানালা বন্ধ করে বাতি জ্বালালাম। বালবের ঠিক নীচে মেঝেতে চোঙের মাপে গোলাকার একটা আলোর চাকতি; কিন্তু কালো শিট যেন সব আলো শুষে নিয়েছে। এর চেয়ে মোমবাতি জ্বাললে যে বেশি আলো হয়! শরীফ, জামী একে একে বাইরে গিয়ে দেখে এসে রিপোর্ট দিল— একদম আঁধার। এবার পাহারাদারকে আমাদেরই গাল দেওয়া উচিত।

৬ ডিসেম্বর সোমবার ১৯৭১

সকালে বুড়া মিয়া আর রেণুকে দিয়ে রেশন আনিয়ে দশটায় যেই মার বাসায় যাবার জন্য পা বাড়িয়েছি, অমনি বিপদ সঙ্কেত সাইরেন। শরীফ, জামী পড়িমরি ছাদে ছুটল। বাবা অস্থির হয়ে কী সব বলছেন, কান না দিয়ে আমিও আস্তে আস্তে ছাদের দিকে পা বাড়ালাম। রেণুকে ডেকে বলে গেলাম, 'অ্যাই রেণু। দাদার কাছে বসে থাক।'

একতলায় আসার পরও বাবার অস্থিরতা কমেনি। দোতলায় নিজের বিছানা, নিজের ইজিচেয়ার, পাশেই সংলগ্ন বাথরুম— সব জায়গা মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, অনেক সময় একাই দেওয়াল ধরে ধরে বাথরুমে যেতে পারেন। আমরা যদিও যেতে দিই না, সব সময়ই কেউ না কেউ ওঁকে ধরি, তবু উনি যে একা পারেন, সেটাই ওর মস্ত মনস্তাত্ত্বিক জোর। একতলার বাথরুমটা খাবার ঘর পেরিয়ে ভেতরের বারান্দা পেরিয়ে গেস্টরুমের পাশে। প্রতিবারই ওকে হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে যাত্রাপথ ও বাথরুমের অবস্থান বোঝাতে হয়, তবু জায়গাটা ওঁর চেনা হচ্ছে না। এ কারণেই মনে মনে বেশ অস্থির হয়ে রয়েছেন। কিন্তু কী করা? আমাদেরও নিজের ঘর, নিজের বাথরুম ছেড়ে নীচে খুব একটা স্বস্তি লাগছে না। তবে সবকিছু একতলার এই খাবার ঘর ও সিঁড়ির নীচে হওয়াতে একটা সুবিধে হয়েছে, স-ব হাতের কাছে। বেশ কমপ্যাক্ট ভাব। আবার অসুবিধেও আছে। সবরকম আলোচনা করার যে সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা ছিল খাবার টেবিল, সেখানে বসে এখন বাবার কান বাঁচিয়ে কথা বলা যায় না। ফিসফিস করলে সন্দেহ করেন। ওকে আবার সব কথা বলাও যায় না। হাই ব্লাড প্রেসার!

তাই নীচে আসার পর থেকে দেখছি খাওয়া শেষ হতে না হতে বাপবেটা বসার ঘরের দূরতম কোনায় চলে যায়। আমি সব সময় হাতের কাজ ফেলে ওদের সঙ্গে গিয়ে বসতে পারি না। তাই কাজের ফাঁকে ফাঁকেই কান খাড়া করে ওদের আলাপ-আলোচনায় অংশ নেওয়ার চেষ্টা করি।

সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার জন্যও আমরা বসার ঘরে চলে যাই। বাবাকে বলি, মেহমান এসেছে। খুব অল্প ভলিউমে বেতারের কথা শুনি। বাবা অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনে ভাববেন, মেহমানরা কথা বলছে। তখন আমরাও কিছু কথাবার্তা বলতে পারি।

আজ দুপুরে আকাশবাণীর খবরে জানলাম

সন্ধ্যায় স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার জন্যও আমরা বসার ঘরে চলে যাই। বাবাকে বলি, মেহমান এসেছে। খুব অল্প ভলিউমে বেতারের কথা শুনি।
আজ দুপুরে আকাশবাণীর খবরে জানলাম ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

শরীফ দুপুরে অফিস থেকে ফিরেই গত কয়েকদিনের একগাদা খবর কাগজ নিয়ে খাবার টেবিলে বিছিয়ে বসল। আমি বাবার গোসল, খাওয়া তদারকির ফাঁকে ফাঁকে দেখছি, বাপবেটা গভীর মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন কাগজ উল্টেপাল্টে কী কী যেন দেখছে, তারপর কী সব যেন এক টুকরো কাগজে লিখছে, আবার খবর কাগজ দেখছে, আবার লিখছে।

বাবার খাওয়া শেষ হলে ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খাবার টেবিলের কাছে এলাম, 'এবার তোমাদের কাগজপত্র গোটাও। খাবার লাগাব, দুটো বাজে। কী করছ এগুলো?'

কাগজপত্র গোটাতে গোটাতে শরীফ গলার স্বর নিচু করল, 'খাবার পর সব বলব।'

কোনওমতে নাকেমুখে গুঁজে খেয়ে উঠেই ওরা দু'জন বসার ঘরের দূরতম কোণে গিয়ে আবার ওই কাগজপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

আজকাল রেণু, তার মা বারোটা-একটার মধ্যেই আগাম ভাত-তরকারি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। আমি টেবিল সাফ করতে করতে ওদের কথাবার্তার দিকে কান খাড়া রাখলাম।

জামীর উত্তেজিত গলা একটু চড়ে গেল, পরিষ্কার শুনতে পেলাম, 'তাতো বুঝলাম, কিন্তু আর্মস আসবে কোত্থেকে?'

আমি কাজ ফেলে ওদিকে চলে গেলাম। শরীফ জামীকে বলছে, 'আর্মস ঠিক সময়ে এসে যাবে।'

আমি ওদের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। 'কিসের আর্মস? কী জন্য? আমাকে একটু বলো না।'

'তোমাকে তো বলতেই হবে। জামী আর আমি হিসেব করছিলাম আর ক'দিন আন্দাজ লাগতে পারে ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর এসে পৌঁছতে। তখন কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখনকার জন্য তৈরি হতে হবে এখন থেকেই।'

আমার সারা শরীরে শিহরণ বয়ে গেল, 'রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ?'

শরীফ জ্বলজ্বলে চোখে বলতে লাগল, 'মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কটা দল বিভিন্ন দিক দিয়ে ঢাকার পানে এগোচ্ছে। কদিনের মধ্যেই তারা ঢাকায় ঢুকবে। তখন আমরা যারা শহরের মধ্যে আছি, আমাদেরকে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াং ছেলেরা ওদের সঙ্গে যোগ দেবে স্ট্রিট ফাইটে, আমরা জোগান দেব খাবারের, ওষুধের, চিকিৎসার। তুমি এখন থেকে চাল, ডাল, আলু, বিস্কুট এসব কিনে রাখতে শুরু করো। একসঙ্গে বেশি কিনবে না, দফায় দফায়, একটু একটু করে— যাতে লোকে সন্দেহ না করে। ওই সঙ্গে টিংচার আয়োডিন, বেঞ্জিন, তুলো, ব্যান্ডেজের কাপড়।'

আমি হাসলাম, 'এসব জিনিস এমনিতেই কম কেনা হয়নি। গেস্টরুমে টাল লেগে আছে। সোয়েটার, মাফলার, মোজা, ওষুধপত্রও তো আর কেউ নিতে এল না। সব পড়ে রয়েছে।'

'পড়ে থাকবে না, পড়ে থাকবে না। ঢাকায় কতদিন যুদ্ধ চলবে, কে বলতে পারে? তোমার সোয়েটার, মোজা, মাফলার, ওষুধপত্র সব কাজে লেগে যাবে, দেখো।'

হঠাৎ আকাশ থেকে প্লেনের ভীষণ ক্কড় ক্কড় শব্দে বাড়িঘর যেন ঝনঝন করে উঠল। এত নিচু দিয়ে প্লেন যাচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে শরীফও কথা বন্ধ করে আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে হাঁটা দিল। যেন সব আলাপ-আলোচনা শেষ হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জামীও। আমি কোমরে দুহাত চেপে ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইলাম।

শরীফ জ্বলজ্বলে চোখে বলতে লাগল, 'মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কটা দল বিভিন্ন দিক দিয়ে ঢাকার পানে এগোচ্ছে। কদিনের মধ্যেই তারা ঢাকায় ঢুকবে। তখন আমরা যারা শহরের মধ্যে আছি, আমাদেরকে ওদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। ইয়াং ছেলেরা ওদের সঙ্গে যোগ দেবে স্ট্রিট ফাইটে, আমরা জোগান দেব খাবারের, ওষুধের, চিকিৎসার।

৭ ডিসেম্বর মঙ্গলবার ১৯৭১

বাংলাদেশকে ভারত স্বীকৃতি দিয়েছে।

নয়াদিল্লি, ছয়ই ডিসেম্বর। এপিপি/ রয়টার। ভারত আজ বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাকের খবরটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। বাংলাদেশ। স্বাধীন বাংলাদেশ। একটি স্বাধীন জাতি। চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। রুমী এখন কোথায়? তাকে পাক আর্মি বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, এটা সমর্থিত খবর। কিন্তু তাকে মেরে ফেলেছে কি না এটার কোনও সমর্থিত খবর তো আজও পাইনি। পাগলাপীর বলেন রুমী বেঁচে আছে। পাগলাপীরের কাছে যারাই যায়— মোশফেকা মাহমুদ, মাহমুদা হক, ঝিনু মাহমুদ, রাঙামা, নুহেল-দীনু-খনু-লীনু, শিমুল, জেবুন্নেসা, জাহাঙ্গীর, নাজমা মজিদ সবাইকেই পাগলা বাবা ওই একই কথা বলেন, 'আছে, আছে, তোর স্বামী বেঁচে আছে। তোর ছেলে মরেনি। তোর ভাই শিগগিরই ফিরে আসবে।'

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিল মামুন মাহমুদ, শাহ আবদুল মজিদ, শামসুল হক, আলতাফ মাহমুদ, রুমী, জাহাঙ্গীর, বদি, জুয়েল, আজাদ, বাশার, বাকের— ওরা আজ কোথায়? সবাই বলে পাগলা বাবা খুব শক্তিশালী পীর, নিশ্চয় তার কথা সত্য হবে। ওরা যদি সত্যি সত্যি বেঁচে থাকে তাহলে যে যেখানে আছে, সেখানে কি গতকাল রেডিওর খবর শুনতে পেয়েছে? আজকের কাগজ দেখতে পেয়েছে? ওরা কি জেনেছে পৃথিবীর অন্তত একটি দেশ স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে? যাদেরকে গাদ্দার বলে, কাফের বলে, পাকিস্তানিরা পিঁপড়ের মতো পিষে মারছে, তাদেরকেই একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে পৃথিবীর অন্তত একটি দেশ? এটা কি ওরা জানতে পেরেছে? আর যদি ওরা সবাই শহিদ হয়ে থাকে, তাহলে কি ওদের আত্মা জানতে পেরেছে এই খবর? জেনে কি শান্তি পেয়েছে ওদের আত্মা?

কাগজের ওপর মাথা নুইয়ে আমি কি বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম? জামী এসে আমাকে ধরে তুলল। তুলে আমার চোখের পানি মুছিয়ে দিল, 'জানো মা, আর দেরি নেই। খুব শিগগিরই ঢাকায় মুক্তিবাহিনী ঢুকবে। তবে যুদ্ধটা বড় সহজ হবে না। ঢাকায় পাক আর্মির ঘাঁটি তো কম শক্ত নয়। জানো মা আমি আর আলী না, আজিমপুর কলোনির ওখানে ডিউটি পাব। আব্বুকে বলেছি, আমাকে আর আলীকে যেন দুটো চাইনিজ স্টেন দেয়। ভাইয়ারা আগস্টে ঢাকায় অ্যাকশান করে বাসায় যে স্টেনগুলো এনেছিল, তোমার মনে আছে মা? কী সুন্দর ঝকঝকে অথচ ছোট্ট দেখতে অস্ত্রগুলো। ওর মধ্যে চাইনিজ স্টেনটাই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল। ভাইয়াও কিন্তু একটা চাইনিজ স্টেনের জন্য পাগল ছিল। ওদের দলের মধ্যে কেবল আলম ভাইয়ের একটা চাইনিজ স্টেন ছিল, আর কারও ছিল না। ভাইয়া না, সুযোগ পেলেই আলম ভাইয়ের স্টেনটা নাড়াচাড়া করত।'

জামীর উদ্দেশ্য সফল হল। আমার চোখ থেকে পানি পড়া বন্ধ হল। বললাম, 'মায়ের বাসায় যেতে হবে। ওঁদের বাজার নেই। বুড়া মিয়া আজ বাড়ি যাবে, তাই বেশি করে বাজার করিয়েছি।'

'চল দিয়ে আসি।'

রান্নাঘরে গিয়ে বুড়া মিয়াকে বললাম, 'তুমি রান্না শেষ করতে করতে আমি এসে যাব। মায়ের বাজারটা দিয়ে আসি।'

ধানমন্ডি ছনম্বর রোডে মার বাসায় বাজার দিয়ে দু'চারটে কথাবার্তা বলে বাড়ি ফিরে আসতে না আসতে এক পশলা আকাশযুদ্ধ হয়ে গেল। এরকম আকাশযুদ্ধ শুরু হলেই রাস্তাতে

লোকজন, গাড়িঘোড়া সব দাঁড়িয়ে যায়। এয়ার রেইড সাইরেন আর অল ক্লিয়ার সাইরেনের তফাতটাও লোকে ভুলে গিয়েছে মনে হয়। সবাই উর্ধ্বমুখে চেয়ে দেখে।

আজ একটা ব্যতিক্রম দেখলাম। আর্মির লোক রাস্তায় দাঁড়ানো উর্ধ্বমুখ লোকজনকে গালাগালি করছে। মনে পড়ল আজকের দৈনিক পাকিস্তানে 'বিমান হামলাকালে বাইরে থাকা নিজেদের জন্যই বিপজ্জনক'— এই শিরোনামে একটা খবর দেখেছি বটে। আহা, বাঙালিদের জন্য ওদের কী মায়া। ভারতীয় বিমানের বোমায় বাঙালি মরলে ওদের যে কত কষ্ট হবে, তাই রাস্তার লোক পিটিয়ে ওদের নিরাপত্তার সুরক্ষা করছে।

বাসায় এসে বুড়া মিয়াকে ছুটি দিলাম। বারবার করে বললাম, 'ঠিক দু'দিন পরে চলে এসো কিন্তু বুড়া মিয়া। দেখছই তো অবস্থা, এদিকে অন্ধ শ্বশুর, ও-বাড়িতে মা একলা।'

বুড়া মিয়া তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আল্লা ভরসা।'

৮ ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭১

আজ আবার রেডিওতে বলল, সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ এবং ব্ল্যাক আউট— পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত। ছিলই তো বাপু সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারফিউ, আবার নতুন করে এত ঘোষণা দেওয়ার কী আছে? সন্ধ্যাও আজকাল পাঁচটাতেই হয়। এদের দেখছি মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের মতো হয়েছে।

আজ রেণু নিজে থেকেই এখানে রাতে থেকে যাওয়ার কথা বলল। বুড়া মিয়া নেই, রেণুকে থাকবার কথাটা বলব বলব ভাবছিলাম। ছোট মেয়ে থাকতে পারবে কি না, তাও ভাবছিলাম, এখন ওর দিক থেকেই আগ্রহ দেখে স্বস্তি পেলাম। রেণুর বয়স আট-নয় বছর হলে কী হবে, কাজে ও পনেরো ষোলোদের হারিয়ে দিতে পারে। আমি খুব খুশি মনে আমাদের খাটের পায়ের দিকে আমার বিশ্রাম করার সেই চৌকিটা আবার এনে পাতলাম। রেণুর শোওয়ার জন্য। উঃ। বাঁচা গেল। রেণু থাকা মানেই বাবার জন্য কোনও দুশ্চিন্তা রইল না। আমি যখন-তখন দৌড়ে ছাদে যেতে পারব।

আজ সকাল সাড়ে আটটাতেই একবার আকাশযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

৯ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আমাদের চেনাজানা প্রায় সবাই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে রাখছে। আর ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট ব্যাঙ্কে জমা রেখে তার বদলে নগদ টাকা 'ধার' নিচ্ছে। সবাই বলছে, কখন কী হয়, শেষে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারি কি না। ব্যাটাদের দিন তো ঘনিয়ে এল। হয়তো বা যাবার আগে ব্যাঙ্কের সব টাকাও জ্বালিয়ে দিতে পারে, প্লেনে করে ওদিকে নিয়েও যেতে পারে। তার চেয়ে যতটা পারা যায় নগদ টাকা কাছে থাকুক।

আমাদের চেনাজানা প্রায় সবাই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে রাখছে। আর ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট ব্যাঙ্কে জমা রেখে তার বদলে নগদ টাকা 'ধার' নিচ্ছে। ব্যাটাদের দিন তো ঘনিয়ে এল। হয়তো বা যাবার আগে ব্যাঙ্কের সব টাকাও জ্বালিয়ে দিতে পারে, প্লেনে করে ওদিকে নিয়েও যেতে পারে। তার চেয়ে যতটা পারা যায় নগদ টাকা কাছে থাকুক।

কিন্তু এত নগদ টাকা ঘরে রাখাও তো খুব সহজ নয়। যে-কোনও সময় পাক আর্মি বাসায় ঢুকে সার্চ করে নিয়ে যেতে পারে। বাড়ির চাকরেও নিয়ে পালাতে পারে। তাই অনেকেই টাকা বয়ামে বা কৌটোয় ভরে মাটিতে পুঁতে রাখছে।

শরীফও তার সবগুলো ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে টাকা 'ধার' নিয়েছে। তাছাড়াও চার দফায় পাঁচ হাজার করে মোট বিশ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়েছে। দশ হাজার অফিসের সেফে রেখেছে, দশ হাজার বাড়িতে এনেছে। আমি টাকাগুলো ছোট ছোট বান্ডিলে চালের বস্তার ভেতরে, জুতোর বাকসের তলায়— এরকম সব জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি। অন্যদের মতো মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে পোঁতার হাঙ্গামা আর করতে ইচ্ছে হয় না।

তাছাড়া এসব টাকা তো কয়েকদিন পরে কাজেই লেগে যাবে, রাস্তাযুদ্ধ শুরু হলে।

দুপুরে ভাত খেতে খেতে শরীফ বলল, 'আজ বাঁকারা ধানমন্ডির বাড়ি থেকে উয়ারী চলে যাচ্ছে।'

'কেন?'

'উয়ারীতে মিসেসের এক বোন থাকেন, সেখানে থাকবে। ধানমন্ডির বাড়ির পুরো পিছনটা তো ই পি আর-এর এলাকা। ওখানে একটা এন্টি এয়ার ক্র্যাফট গান বসানো আছে।'

'তার জন্য?'

'ওটার জন্যই বাঁকাদের বাড়িটা আমাদের দরকার হবে। তাই ওকে বলেছিলাম অন্য কোথাও সরে যেতে।'

জামীর দু'চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে। সে রুদ্ধশ্বাসে ফিসফিস করে বলল, 'আব্বু আমাকে আর আলীকে বাঁকা চাচার বাড়িতে—'

শরীফ হেসে ধমক দিল 'চোঁ— প! ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করছ। তোমরা আজিমপুর কলোনির তিনতলার ছাদে পজিশন নেবে। যোদ্ধারা কখনও অর্ডার অমান্য করে না।'

আমার সারা শরীর শিরশির করছে। কারফিউ মোড়া এই অবরুদ্ধ শহরে ব্ল্যাকআউটের কালো কাগজ মোড়া এই কবরের মতো ঘরে বাস করতে করতে, স্বাধীন বাংলা বেতার আর চরমপত্র শুনে শুনে কোনওমতে মনোবল খাড়া রাখি। যতই দিন যাচ্ছে মনে হচ্ছে আর পারছি না। এর মধ্যে এ ধরনের যুদ্ধের প্রস্তুতির কথাবার্তা নিঃসন্দেহে সারা শরীরে জীবনীশক্তি প্রবাহিত করে দিচ্ছে।

১০ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৭১

বুড়া মিয়ার আজ ফেরার কথা কিন্তু এখনও ফেরেনি। ড্রাইভারকে দিয়ে বাজার করিয়ে রেণুর মাকে কুটতে বসিয়ে দুই হালি ডিম আর এক শিশি গ্লিসারিন নিয়ে মার বাসায় গিয়েছি। সেখান থেকে জুবলীর বাসা হয়ে তার খোঁজখবর নিয়ে বাসায় ফেরার পথে লক্ষ করলাম বহু লোক রিকশায়, বেবিতে বোঁচকা-বুঁচকি, স্যুটকেস নিয়ে চলেছে। অনেকে ঘাড়ে-মাথায়-হাতে পুঁটলি নিয়ে হেঁটেও যাচ্ছে। কী ব্যাপার! আরেকবার লোকজন ঢাকা ছাড়ছে নাকি?

বাসায় ঢুকতেই দেখি ঘর ভর্তি করে মেহমানরা বসে আছেন— ফকির, আমীর হোসেন, বাবলু, চাম্মু, হোসেন সাহেব, ডাঃ এ কে খান। সবার মুখে একই আলোচনা— গতকাল ও পরশু রাতে তেজগাঁও শিল্প এলাকা ও এতিমখানায় যে বোমা পড়েছে তা নাকি ইচ্ছাকৃত সেমসাইড।

আমি বললাম, 'রাস্তায় দেখলাম লোকজন সব ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।'

এ কে খান বললেন, 'ঢাকায় জোর গুজব, মুক্তিযোদ্ধারা নাকি ঢাকার সিভিলিয়ানদের

শহর ছেড়ে চলে যেতে বলছে— এখানে নাকি খুব ফাইট হবে?'

আমীর হোসেন বললেন, 'কই, আমি তো শুনিনি...'

হোসেন সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'স্বাধীন বাংলা বেতার কিছু বলেছে এ বিষয়ে?'

'সেরকম ঘোষণার মতো করে বলেনি। তবে কথিকায়, চরমপত্রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে।'

'ঢাকার অবস্থাও খুব ভালো নয়। কাল থেকে তো সব স্কুল-কলেজ বন্ধ দিয়ে দিয়েছে।'

-'তাই নাকি?'

'কেন, আজকের কাগজে দেখেননি? সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা।'

-'অবস্থা তাহলে সত্যি কুফা?'

আলোচনা চলতেই থাকে। আমি চা বানিয়ে নাশতা ধরি মেহমানদের সামনে। প্রায় দুটো বাজে। কারও ওঠার নাম নেই।

রেণুর মা অস্থির হয়ে উঠেছে বাড়ি ফেরার জন্য। ওর বাড়ি সেই কামরাঙ্গীর চরে। হেঁটে যেতে যেতেই বেলা ফুরিয়ে আসবে।

বসার ঘরে তর্কমুখর মেহমানদের রেখে আমি রান্নাঘরে গেলাম রেণুর মাকে আগাম ভাত বেড়ে দিতে।

১১ ডিসেম্বর শনিবার ১৯৭১

বুড়া মিয়া আজও ফেরেনি। রেণু একরাত থেকেই আবার বাড়ি চলে গিয়েছে, ফলে কাজের চাপ পড়ে গিয়েছে বড্ড বেশি। শরীফ-জামী আগে ঘরের কাজে বেশ সাহায্য করত, চার তারিখ থেকে ওরা দু'জন একদম বদলে গিয়েছে। খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া প্রায় সবসময়ই ছাদে। অফিসে যাওয়ার সময়ও অনিয়মিত হয়ে গিয়েছে চার তারিখের পর থেকে।

বুড়া মিয়া সব সময় কথা ঠিক রেখেছে। এবার আর পারল না দেখছি। যা পরিস্থিতি দেশের, তারই বা কী হয়েছে কে জানে!

আমি রোজই কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, আটা, চিনি, সুজি, বিস্কুট— অল্পে অল্পে বিভিন্ন দোকান থেকে কিনে কিনে গেস্টরুমটায় টাল করছি।

আজ হঠাৎ বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে কারফিউ! না জেনে নিশ্চিন্তে বাজার করে পৌনে চারটেয় বাসায় ফেরার পথে দেখি লোকজন, রিকশা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে!

কী যে উল্টোপাল্টা সব কারবার আরম্ভ হয়েছে। কখন কারফিউ দিচ্ছে আর কখন তুলছে কোনও মাথামুন্ডু নেই। আর মাথা ঠিক থাকে কী করে? দেশের সবখানে যা অবস্থা! আজকের দৈনিক পূর্বদেশে একটা খবর পড়লাম: লাকসাম, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, হালুয়াঘাট, রংপুর, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া ও খুলনায় প্রচণ্ড লড়াই।

যশোহর রোডে সীমান্ত পেরোতে চাওয়া মানুষের দীর্ঘ লাইন

এটা হল একটা হেডিং। এর চেয়ে ডবল মোটা হেডিং দিয়ে এর নীচেই আবার লেখা: স্থলে-জলে অন্তরীক্ষে হানাদার বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি।

পড়ে খানিকক্ষণ একা একা হাসলাম। এই হানাদার বাহিনী, কোন হানাদার বাহিনী, বুঝতে আর বাকি নেই। তাইতে ওদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

১২ ডিসেম্বর রবিবার ১৯৭১

আজ সারাদিন কারফিউ ওঠেনি। আজও কিছু কেনাকাটা করতে বেরবো ভাবছিলাম, তা আর হল না। এয়ার রেইড সাইরেন অগ্রাহ্য করে রাস্তায় বেরনো যায়, কিন্তু কারফিউ থাকলে সবাই নাচার।

যেন খুব একটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছে, এমন একটা ভাব করে শরীফ-জামীর দিকে চেয়ে বললাম, 'এই সুযোগে গেস্টরুমটা গুছিয়ে ফেলি।' ওরা রেডিও বগলে সিঁড়ির দিকে মুখ করেছিল, আমার কথায় আবার ঘুরে দাঁড়াল। ওদের নিয়ে আমি গেস্টরুমের তালা খুলে ঢুকলাম। এটা অবশ্য এখন স্টোররুম— কেউ বেড়াতে এসে হঠাৎ যাতে এ ঘরে এত জিনিসপত্র দেখে না ফেলে, তার জন্য তালা। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি সব জিনিসই এখনও ছোট ছোট চটের থলে, কাগজের ঠোঙা, পলিথিনের ব্যাগে রয়েছে। তুলো, ব্যান্ডেজ, ডেটল, এস্পিরিন আরও অন্যান্য ওষুধ সব ছোট ছোট বাদামি প্যাকেটে। শরীফ সারা ঘরের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'এসব গুছিয়ে রাখা ঠিক নয়। এভাবেই ক্যামাফ্লেজড হয়ে থাকা ভালো, হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে যেন টের না পায়!' বলেই অ্যাবাউট টার্ন করতে উদ্যত হল। আমি খুব মিষ্টি করে তীক্ষ্ণ গলায় বললাম, 'ঠিক

আমি বললাম, 'রাস্তায় দেখলাম লোকজন সব ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে।' এ কে খান বললেন, 'ঢাকায় জোর গুজব, মুক্তিযোদ্ধারা নাকি ঢাকার সিভিলিয়ানদের শহর ছেড়ে চলে যেতে বলছে— এখানে নাকি খুব ফাইট হবে?'

আছে, কিন্তু এমার্জেন্সির সময় চট করে যাতে ঠিক জিনিসটি তুলে নিতে পারি, তার জন্য একটু সিজিল করে রাখা উচিত নয় কি? ধরো গুরুতর জখম একটা মুক্তিযোদ্ধাকে ব্যান্ডেজ করতে হবে, তখন যদি এই একশোটা প্যাকেটের মধ্যে তুলো খুঁজতে পনেরো মিনিট লেগে যায়...'

জামী একলাফে আমার পাশে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'প্রমিস করছি মা, সন্ধ্যাবেলা স-ব প্যাকেট সিজিল করে দেব। এখন তুমিও চলো ছাদে, কেন কারফিউ ওঠায়নি আজ, সেটা ছাদে না গেলে টের পাওয়া যাবে না।'

আমি ভেংচে উঠলাম, 'তুমিও চলো ছাদে! দাদাকে একা ফেলে—'

জামী বেশ সাহসী আর একটু কুটকচালে হয়ে উঠেছে আজকাল। আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জড়িয়ে ধরে টেনে খাবার ঘরের দিকে নিতে নিতে গলা চড়িয়ে বলল, 'দাদা, খানিকক্ষণ একা বসে থাকুন। মাকে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি— আলমারি খোলাতে হবে। আব্বু বাথরুমে গিয়েছে।' (আব্বু পাশেই দাঁড়িয়ে।)

বাবা চুপ করে খাটের পাশের ইজিচেয়ারে পড়ে রইলেন। তিনিও এ কয়দিনে বাড়ির সবার হালচাল বুঝে গিয়েছেন। সেদিন ছেলে ও নাতিকে এয়ার রেইড প্রিকশানের কথা বোঝাতে গিয়ে নিজেই যেন অন্যরকম বুঝে গিয়েছেন। আর কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেন না।

আমি ওদের দু'জনের সঙ্গে ছাদে গেলাম বটে, কিন্তু খানিক পরেই নীচে নেমে এলাম। বাবাকে সত্যি সত্যি তো বেশিক্ষণ একা ফেলে রাখা যায় না।

তবু বাবাকে দেখা ও রান্নার কাজের ফাঁকে ফাঁকে আজ বহুবার ছাদে গেলাম।

এয়ারপোর্টের দিকে দেখা যাচ্ছে তিনটে প্লেন বারবার করে নীচে নামার চেষ্টা করছে, আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে। আমাদের ছাদের ঘরের উত্তরের জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যায়। জাতিসঙ্ঘের কর্মচারীদের ঢাকা থেকে

পুববাংলার আকাশে যুদ্ধবিমান

অপসারণের জন্য ওই চেষ্টা। কিন্তু ভারতীয় বিমান বোমা ফেলে রানওয়েটা বেশ ভালো জখম করে রেখেছে। সকাল থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত প্রাণান্ত চেষ্টা করে প্লেনগুলো নামল, খানিক পরে উঠেও গেল। ওর উড়ে চলে যাওয়ার পরপরই ফটাফট দুটো বোমা রানওয়েতে মেরে দিয়ে গেল ভারতীয় প্লেনগুলো।

আরও ভালো করে দেখার জন্য সিঁড়িঘরের ছাদের টঙে জামী একবার উঠেছিল। ওখানে উঠলে এলিফ্যান্ট রোডের বুকটাও দেখা যায়। জামী নেমে এসে বলল, 'আচ্ছা মা, সারাদিন কারফিউ অথচ অ্যাতো মাইক্রোবাস যাচ্ছে কেন রাস্তা দিয়ে? ওগুলো তো মিলিটারি গাড়ি নয়।'

আগামী সংখ্যায় শেষ

অনলাইনে কিনতে ► www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ছোটদের বই
ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দুই মলাটের মধ্যে পাঁচ পৃথিবীর পাঁচটি গল্প।
যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৭৫

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

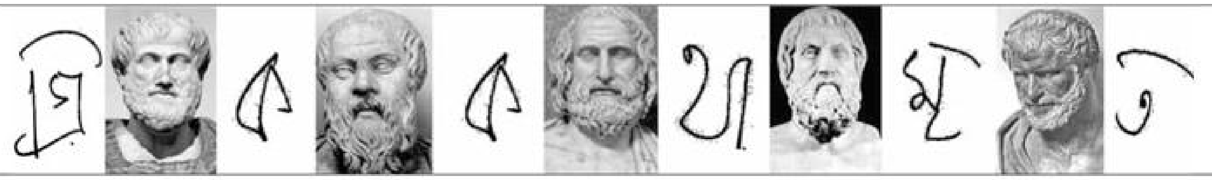

গ্রিক কথামৃত

সংকলক ও অনুবাদক

কালীকৃষ্ণ গুহ

পর্ব ৩

আধুনিক সভ্যতার বা ঐতিহাসিক পাশ্চাত্য সভ্যতার শুরু বলা যায় গ্রিসে। ভারত, চিন ও এশিয়ার প্রাচীনতর সভ্যতাগুলির পরিপূর্ণ চেহারা লিপিবদ্ধ নয় বলে সেইসব সভ্যতাকে পৌরাণিক বা প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা বলাই হয়তো সংগত। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, যা আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি, তা গড়ে উঠেছিল বলা যায় ৭০০ খ্রিঃ পূঃ সময়ে— এক অন্ধের কাব্যপাঠে। মহাকবি অন্ধ হোমার এক-একটা জনপদে পৌঁছে সারাদিন দাঁড়িয়ে তাঁর কাব্য আবৃত্তি করতেন— গ্রিকদের জয়ের কাহিনি— ইলিয়াড ও ওডেসি। অজস্র দ্বীপে বিভক্ত একটা অঞ্চল বা একটা ছোট ভূ-ভাগ গ্রিসদেশ হিসেবে পরিচিত হয় পরে। জ্ঞানচর্চায় শ্রেষ্ঠ দ্বীপরাজ্য বা নগররাজ্যটি ছিল আথেন্স। যেমন যুদ্ধচর্চার শ্রেষ্ঠ স্থান ছিল স্পার্টা। এই আথেন্সে জন্মেছিলেন একের পর এক মহাজ্ঞানী লেখক, ভাবুক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনায়ক। বিভিন্ন সময় তাঁরা যে সকল উক্তি করেছিলেন সেইসব কথা বা কথামৃত আজও মনে হয় অব্যর্থ। বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করে এই জ্ঞানীদের উক্তিগুলির সংকলন ও অনুবাদ করেছিলাম একসময়। উক্তিগুলি এতই শক্তিশালী ও মহৎ যে অনুবাদের অনুবাদেও তা মহৎ থেকে গিয়েছে, এই আমাদের বিনীত ধারণা। মনে রাখা যায় যে, প্রাচীন গ্রিক মনীষীদের জ্ঞানেরই ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল ইউরোপের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ, প্রায় দেড় হাজার বছর পর।

স্বা ধী ন তা

ক্রীতদাস হবার বিপদ এড়ানোর জন্য লড়াই করাটা একটা মহৎ কাজ।

জেনোফোন

তুমি কি ভাবো এমন একটা লোক সুখী যখন সে একজন ক্রীতদাস যার ইচ্ছে মতো কিছু করার স্বাধীনতা নেই?

সক্রেটিস

যে নিজের দায়িত্ব নিতে পারে না, সে স্বাধীন নয়।

পিথাগোরাস

বা চা ল তা

যারা সারাক্ষণ বকে, তাদের জীবন শেষ হয় দুঃখে।

ইউরিপিডিস

যে সারাক্ষণ কথা বলে আনন্দ পায়, সে এই কথা ভেবে নিজেকেই বোকা বানায় যে চারপাশের লোকজনের কাছে সে বিরক্তিকরা বা অনাকাঙ্ক্ষিত নয়।

সোফোক্লিস

প্রকৃতি আমাদের একটা জিভ আর দুটি কান দিয়েছে, যাতে আমরা যতটুকু বলব, তার দ্বিগুণ কথা শুনতে পারি।

জেনো অব এলিয়া

সবসময়ই কিছু বলতে যাওয়ার আগে বলার কথাটা নিজের মনে ওজন করে নেবে, যেহেতু অনেকের ক্ষেত্রে জিভ চিন্তাকে ছাড়িয়ে যায়। দুরকম ক্ষেত্রে কথা বলবে— যখন বলার বিষয়টা তুমি ভালোভাবে জান আর যখন কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। এই দুটি ক্ষেত্রে নীরবতা বজায় রাখার থেকে কথা-বলা ভালো। অন্য সমস্ত সময় কথা না-বলে নীরব থাকা ভালো।

আইসোক্রেটিস

বুঝে-ওঠার আগে কথা বোলো না বা কাজ কোরো না।

পিথাগোরাস

সে-ই প্রাজ্ঞ, যে অনেক চিন্তা অল্প কথায় সীমাবদ্ধ রাখতে পারে।

অ্যারিস্টোকোনিস

বোকামি-করা এড়াতে চাইলে কোনও কাজ করার আগে এই কথাটা ভাববে: অপদার্থ লোকই শুধু চিন্তা না-করে কথা বলে যাঁর কাজ করে।

পিথাগোরাস

গৌ র ব

গৌরব লাভের নিকটতম রাস্তা হল তুমি যা হতে চাও, যা হবার কথা ভাব, তার জন্য চেষ্টা করা।

সক্রেটিস

অনুপস্থিত অ্যাকিলিসও অ্যাকিলিস।
হোমার

অতিরিক্ত গৌরবের মধ্যে ধ্বংসের ব্যবস্থা নিহিত থাকে; অত্যুচ্চ চূড়া জিউসের বজ্র হননে এসে ধ্বংস করে দেয়।
অ্যাসকিলাস

প্রবাদ আছে যে শ্রম-ই খ্যাতির পশ্চাৎভূমি।
ইউরিপিডাস

তুমি অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর ঘোষক না-হয়ে বিজয়ী হতে চাইবে নাকি?
থেমিসটোক্লিস

আমি দেখতে পাই যে খুব ঘটা করে আমার মরণোত্তর অনুষ্ঠান হচ্ছে।
আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট

আমি যদি কোনও ভালো কাজ করে থাকি, তাহলে সেটাই হবে আমার স্মৃতিস্তম্ভ; না-হলে শুধু শ্রমিক আর অপদার্থ লোকদের তৈরি করা মূর্তিগুলিই পড়ে থাকবে।
স্পার্টার রাজা অ্যাজিসিলাউস

লোভ ও অসদুপায়ে অর্জিত লাভ

যে যথেষ্ট পেয়েও ভাবে খুব কম পেয়েছে, তার কাছে কোনো পাওয়াই যথেষ্ট নয়।
এপিকিউরাস

সম্পদের তৃষ্ণার সাম্য সম্পদের সাম্য থেকেও বেশি জরুরি।
অ্যারিস্টটল

প্রাকৃতিক বাসনা মেটানোর ক্ষেত্রে কম লোকই অন্যায় করে, অন্যায় শুধু তারাই করে, যারা অতিরিক্ত চায়।
অ্যারিস্টটল

বিলাসিতা এবং ঘৃণার ফল একই দাঁড়ায়।
পিথাগোরাস

অসৎ লাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই ক্ষতির সূত্রপাত।
মিনানডার

সৎভাবে সম্পদ অর্জনের চেষ্টা করবে। অসৎভাবে অর্জিত সম্পদ বহু লোককে ধ্বংস করেছে।
ইউরিপিডাস

সততার পথের দারিদ্র অসৎপথে অর্জিত সম্পদ থেকে বেশি কাম্য।
আইসোক্রেটিস

অসৎ শ্রমের ফলে অর্জিত সম্পদ লজ্জার স্তূপ।
ডিমোক্রিটিস

সহজে অর্জিত সম্পদ আর সম্মান সহজেই হারিয়ে যায়।
পিথাগোরাস

অশুভ লাভ গুণাবলি ধ্বংস করে।
ডিমোক্রেটিস

ধনসম্পদ সেই লোককে রক্ষা করে না যে আতঙ্কিত হয়ে ন্যায়বিচারের বেদিটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়েছে।
অ্যাসকাইলাস

ধনী লোকের বাড়িতে গেলে ধনী লোকটির মুখখানি ছাড়া থুতু ফেলার জন্য কোনও জায়গা থাকে না।
ডাইনোজিনিস অব সিনোজ

শুভ আর অশুভ

বাইরের ব্যাপার আমার হাতে নেই, আমার আয়ত্তে আছে আমার নৈতিকতার দ্বারা সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা। কোথায় গিয়ে শুভ আর অশুভ খুঁজব? নিজের মধ্যেই তা খুঁজতে হবে।
এপিকটেটাস

একটা জিনিসই শুভ, তা হল জ্ঞান। অজ্ঞতাই অশুভ।
সক্রেটিস

অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে কাউকে অশুভর জন্য দায়ী করা যায় না।
সোফোক্লিস

আগামী সংখ্যায় আরও

মানবমুখের স্কেচ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

চিঠিপত্রে কমলকুমার

পর্ব : ২

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে লেখা

এখন কথা এই যে আমার গল্প তোমার কাগজে যাইবে কি না— কেননা লেখা আমি দুর্বোধ্য করি না— এত সরল যে তাহা দুর্বোধ্য হইয়া যায়।

১

স্নেহের সন্দীপন,

গত রবিবারে (১২/৪) ইহা সত্য যে আমি খুবই আশা করি যে তুমি আসিবে। সেইদিনকে ভালভাবে কথা হইতে পারে নাই অর্থাৎ আমার সুনীলকে[১] লিখিত পত্র বিষয়েতে জবাবদিহি করার চেষ্টা। আমি তোমাকে একথা ঠাকুর জানেন ছোট করিবার অথবা তোমাকে লইয়া মজা করিবার চেষ্টা করি নাই। তবে মুস্কিল ইহা যে যখনই আমি কথা বলি তখনই পাঁচজনে বলিয়া থাকে আমি মস্করা করিতেছি। সেদিন ভবানী চৌধুরী[২] আমাকে দোষারোপ করিলেন। আদতে আমি তোমার ব্যাপারে ভালই লিখিতে চাহিয়াছিলাম, জানি না সুনীলও হয়ত আমারে উল্টা বুঝিল, কেননা, সে ইহা জানি যে খুবই একটা unenglish নহে— তবু পত্র-প্রাপ্তি স্বীকার করে নাই। এখন আমার ধারণা আমার চিঠিতে খুব গোলের কারণ হইয়াছে। কেমন জান— কিছুদিন আগে কোন পত্রিকায় এক ভদ্রলোক সম্পর্কে প্রশংসা সূচক কিছু সুস্পষ্ট অভিধানে ব্যক্ত করিতে গিয়া কোন এক লেখক ভদ্রলোককে দ'য়ে মজাইয়াছে, যথা— 'ইহার প্রদর্শিত পথে আজ আমাদের দেশে শত শত শিশুমেধযজ্ঞ চলিতেছে' (এই লেখার সংবাদ আমাকে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত দেয়) বলিতে হইবে আমার কপাল মন্দ।

তোমার মিনিবুকের জন্য আমি আমার একটি রচনা বাছিয়াছি— যাহার গল্পটা একটি কথা! play of words নহে— বলিতে পারা যায় চিন্তা। যে চিন্তার মধ্যে যে এক ব্যক্তি যাইতে চাহিয়াছিল। ইহার মধ্যে হুইসমাস-ই (Huysmass) ফেরতাই হয়ত আছে। মানে study— তবে গরীবদের জন্য লেখা নয়, উচ্চবর্ণের গরীবদের জন্য লিখিত। এখন কথা এই যে আমার গল্প তোমার কাগজে যাইবে কি না— কেননা লেখা আমি দুর্বোধ্য করি না— এত সরল যে তাহা দুর্বোধ্য হইয়া যায়। তবে আমি বৈদিক অন্তত ব্রাহ্মণ্য সরলতা ভালবাসি। (এই কথায় একমাত্র সাঙ্কোপাঞ্জার উত্তরই জবাব— তাহার গল্প বলার সূত্রে সে ডন কুইকজট্‌কে বলে— আমি আর অন্য কোনরূপে বলিতে জানি না, মহাশয় আমারে নূতন ধাঁচে বলিতে অনুরোধ করিবেন না [নূতন অভ্যাস করিতে বলিবেন না] আমি লেখাটি পরখ করিয়া দেখিতেছি— মনে লয় যে তোমার কাগজের মধ্যে আঁটিবে। সেদিন ইন্দ্রর দোকানেতে[৩] তোমার নব প্রকাশিত হইবে শক্তি চাটুজ্জের কবিতার সহিত প্রকাশ কর্ম্মকারের ছবির বইটি[৪] দেখিলাম। একটি অনুরোধ O.C.[৫]'র কৃত কভারে দিও না। বরং প্রকাশের[৬] ছবি

দিলে ভাল হয়।

১লা বৈশাখ কি আসিবে?

অরূপ[৭] ও বিমান[৮] আসিবেই।

ইতি—

কমলকুমার মজুমদার

টীকা:

১ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

২ রিপোর্টার স্টেটসম্যান

৩ ইন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সুবর্ণরেখা'

৪ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মিনিবুক

৬ চিত্রশিল্পী প্রকাশ কর্মকার

৫ ও. সি. গাঙ্গুলী। অর্দ্ধেন্দুশেখর গাঙ্গুলী। চিত্রশিল্পী ও ফোটোগ্রাফার

৭ অরূপরতন বসু, গল্পকার

৮ বিমান সিংহ। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রকাশন আধিকারিক

রামপ্রসাদ সেন

ইহা আমি বিশ্বাস করি যে আমরা পৃথিবীর মহৎ সৌন্দর্য্য— সর্ব্ব আর্টের— বুঝিবার জন্য লিখি। অন্য উদ্দেশ্য নাই। আবার মনে হয় রামপ্রসাদের "ভাব কি ভেবে পরাণ গেল" এই লাইন।

২

স্নেহের সন্দীপন,

তুমি যেদিন আসিয়াছিলে, অনেক বেলাতেই আসিয়াছিলে ফলে তোমার কোন যত্ন-আত্তি করা হইয়া উঠে নাই, ইহার জন্য যর্থাথই লজ্জায় আছি। এই কথা তোমাকে আগেই লিখিব ভাবি, কিন্তু কতক কাজে এবং বিশেষত সুব্রতর[১] অমন বিপদে বড়ই চিন্তিত থাকাতে ঘটিয়া উঠে নাই। বিশেষত লেখার প্রয়োজন ছিল ইতিপূর্ব্বেই, যেহেতু তোমার সেই 'প্রতিবাদ পত্রে'[২] সই না করাতে নিশ্চিত তোমার মনে লাগে, আমি একটি ঠিক আমার বিষয়েতে বলিয়া থাকি, যাহাতে আমার বিশ্বাস, যে কোন রাজনীতিতেই আমি বিশ্বাস করি না, (নিশ্চয়ই রাজনীতি লইয়া গল্প শুনি বা করি) ইহা পাজী বলিয়া আমার গ্রাম্য ধারণা। এখন তোমার চিঠি পাইয়া বুঝিলাম তুমি আমার ক্ষেত্রে কিছু মনে কর নাই। স্বস্তি লাভ হয়।

গত ১৮ জুন হঠাৎ গৌর[৩]। আমি অবাক হইবার সময় পাই নাই। গৌর আমার সুখ-দুঃখের কথা জানে, অনেকদিনের প্রণয়। বেচারী সেও এমন এক সময় আসিল যে আমার দারিদ্র পুনরায় দু'হাট; ভগবৎ কৃপায় আমি কিছু নির্লজ্জ, তাই রক্ষা। এই সূত্রে তাহারে আমি এক চিঠি দিয়াছি। যে তাহার যথাযথ সম্মান-জন্য একমাত্র বিনীত করজোড় ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না। তোমার বেলাতে ঠিক তাই বলিলে, দুষমনী করা হইবে না। দারিদ্র্য যখন আমার কিস্তর কারণ হয় তখন দোরোখা লজ্জা, কারণ দারিদ্র্য আমাকে সংযমই করে। গৌর সেদিন তাহার চমৎকার সূত্র বলিয়াছে, বাঙালী লেখকদের মধ্যে সে অভিনব যথাযথ কিছু ভাবে, তুমি তাহার সহিত কথা কহিলে খুব জোর পাইবে যেমন আমি পাইয়াছি।

আমি যখনই কাহাকেও পত্র লিখি তখনই ইহা উজলাইয়া উঠে যে আমি সর্ব্বাংশেই আত্মপ্রসাদ বা আর একটু পরিষ্কার ভাল বাঙলায় হাম্বড়া বা বারে-আমি লাভের জন্য লিখিয়া থাকি না, আমি মনকে শান্ত করি। অনেক আপ্তবাক্য ভাবিতে বলি। তবে আমার ভাগ্য ভাল, কেহই উহা পড়ে না অথবা মনে রাখে না। তুমি ও আমাতে অনেক আলোচনা সেদিন হয়, তাহার কিছুই আমার স্মরণে নাই; ভালই! তাহার কারণ হয়ত সবই একমেটে, বুঝায় লেখা সম্পর্কে আমরা বা আমি অন্তত কোন দায়িত্ব পালন করি না। ভোট-দাতা বা নাগরিক বিষয় আমরা ভাবি কিন্তু মানুষটা জীবনটা লইয়া ক্বচিৎ ভাবি না। তোমারে যদি সমালোচনা করা যায়, ভাবের ভাবি হিসাবে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করিবে না, নূতন flash আসে— সকালে মনে থাকে না...ইহা ঠিক নয়, তৎক্ষণাৎ আমরা সেই flashটা কজা করি না, রাজনৈতিক আলোচনায় তাহা ভাসিয়া যায়, তখন এবং ঐ মানসিকতাকে নিশ্চয়ই বাজে না বলিলে শান্তি পাই না। আর এক কথা, ফ্লাশ যদি ভগবৎ দত্ত হয় তবে আবার আসিবেই, তুমি লিখিয়াছ একেবারে 'খালি'[৪]— অবশ্য যুক্তির দিক দিয়া খালি বলিলেই ভরা ছিল। আবার ভরা যাইতে পারে। এখানে যদি ছেলে মানুষের মত প্রশ্ন করা যায় কবে তাহা পূর্ণ ছিল। নিশ্চয়ই মনে করিবে না। তোমার এই একটি উক্তিতে, autobiographical! আমি হয়ত এক সুদীর্ঘ বিনুনি লিখিতে পারিতাম যাহাতে পাসকাল হইতে বালজাক, ইনি void (খালি) ও enumi (শূন্যতা)র পার্থক্য দেখান, বৌদ্ধরা কি বলেন এইরূপ অনেক পাঠলব্ধ কথা। কোথাও আমার নিজের অনুভব উপলব্ধি নাই, সামান্য একটা ঠিকানা পড়ার ক্ষমতাকে কুলি কামারীরা বলিবে, অহো ইনি কি শিক্ষিত। আমরা নিজেকে অবিশ্বাস করিতে বড় ইতস্তত খুব মায়া করি। আবার নিজেকে স্তোক্ (!) দিবার কারণে ভাবি, যখন নিজে কিছু ভাবিতে পারি নাই, মহাজনরাই তখন আমার সব। অবশ্য একদিন ঠাকুর করিবেন যে সত্য দেখিব। আমরা পরপর synonyms লিখি, এই ছাড়া আর আগাইতে পারি না। আবার ভাবি মা দিদি মাসি বোন খুড়ী অনেক সম্পর্ক একই ব্যক্তি, কিন্তু ঐ শব্দগুলি সমার্থবাচক নহে, অথচ একই মানুষকে বুঝায়। ইহা আমি বিশ্বাস করি যে আমরা পৃথিবীর মহৎ সৌন্দর্য্য— সর্ব্ব আর্টের— বুঝিবার জন্য লিখি। অন্য উদ্দেশ্য নাই। আবার মনে হয় রামপ্রসাদের "ভাব কি ভেবে পরাণ গেল" এই লাইন। তোমার স্ত্রী অসুস্থ। এবং বাবার এমন অবস্থা শুনিয়া বড়ই কষ্ট হয়। এখানে আমার কিছু বলিবার নাই! সুব্রতকে চিঠি লিখিয়াছি উত্তর দিতে মানা করিয়াছি। বেচারী বড় কারে পড়িয়াছে। তুমি আমার কথা সকল পড়িয়া এই বিশ্বাস যে কিছু অন্যায় ভাবিবে না। ঠাকুর করুন তোমার দ্বারা মহৎ লেখা হউক। তুমি ভাল থাক।

ইতি— কমলকুমার মজুমদার

টীকা:
১ সুব্রত চক্রবর্তী। ওই সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন
২'নকশালবাড়িসহ দলমতনির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক কর্মীর উপর পুলিশী অত্যাচারের আমরা নিন্দা করি'— শীর্ষক বিবৃতি যা মিনিবুক-২ 'লাল রজনীগন্ধা'য় প্রকাশিত হয়।
৩ গৌরকিশোর ঘোষ
৪ ''কাফে 'খালি' হয়ে গেলে আমার মাথাও খালি হয়ে যায়।''— একক প্রদর্শনী: সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

৩

স্নেহের সন্দীপন,

বহুকাল পর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, ইতিপূর্বে তোমাকে আমি চিঠি লিখি— পাইয়া থাকিবে। তাহাতে আমার বক্তব্য আছে। ইতিমধ্যে তোমার প্রেরিত 'মিনিবুক' এর নরখাদক[১] ও সোরাব রুস্তাম[২] পাইয়াছি। সোরাব রুস্তাম আগেই তুমি দিয়াছিলে— আমি পাঠ করিয়াছি। আমার সুখকর বলিয়া বোধ হয়— তবে শক্তি যে সিদ্ধ, এ আমার ধারণা পুরাতন, ইহাতে নূতন চমকের কিছু পাই— কিছু তাহা নয়। শক্তি ইচ্ছা করিলে রহস্যভেদ করিতে পারে কিন্তু স্থির হইয়া বসিবার সময় তাহার নাই— সে বড় তড়িঘড়ি করে— ভগবান তাহাকে যা ক্ষমতা দিয়াছেন— তাহাতে তাহার সচেতন হওয়া কর্ত্তব্য ছিল বা আছে। পদ্যে (পদ্য শব্দটা দেখি ইদানীং খুবই মানিয়া লইয়াছে। আমার বলা বৃথা হয় নাই। এইবার সে কবিত্বে যাইবে।) অথচ একমাত্র ভেদ করাই যে তাহার গতি ইহা সে বুঝে না— সঙ্গীত মুখরটাই সব ইহা সে ধ্রুব মনে করে। (কোথাও কোথাও চিরপরিচিত image কে পরিচ্ছন্ন করিয়াছে— অবশ্য ইহাও যথার্থ— তবে আরও আছে)

Oh Sun flower weary of time— যে কোন কথা বদলাইলে প্রাণ আসে না বা রোজ দাউ আর্টসিক! যেমন জর্জ হার্বার্ট লিখিয়াছিলেন।

A Rose— Cure। যেমন আধ্যাত্মিক।

A rose, beside his beauty is a cure জর্জ হার্বার্ট তাহারই ফেরতাই। তবু আধ্যাত্মিক।

'নরখাদক' আমার খুব ভাল লাগিয়াছে— আবার পড়িব তখন বলিব— এখন শুধু মাকাবার মনে হইতেছে। গদ্যটি ভারী জবাবী।

তোমার লেখা কেমন চলিতেছে। আমি এক রিহার্সল ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করি না। দারিদ্র্য আমায় এমন চাপিয়া ধরিয়াছে যে কি বলি। চর্ম্ম লোল হইতে আছে।

এবার ইচ্ছা ছিল, 'কলিকাতার পরিব্রাজক'টি পাত্রস্থ করিব, কিন্তু ঘটিল না।

ঠাকুর করুন ভাল থাক।

ইতি—

কমলকুমার মজুমদার

টীকা:
১ উৎপলকুমার বসুর পদ্য রচনা
২ শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও প্রকাশ কর্মকার কৃত কবিতা ও ড্রয়িং

৪

স্নেহের সন্দীপন,

তোমার চিঠি অনেকদিন পাইয়াছি, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশত উত্তর দেওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। আর ইদানীং কলিকাতার তথা পূর্ববঙ্গের অবস্থা আমাকে একাধারে বিচলিত ও বিমর্ষ করিয়াছে; নিশ্চয় তোমাকেও স্তম্ভিত করিয়া থাকিবে। যদিও তুমি বা আমি কেহই বাঙাল নহি; এখন শহরের বাঙালত্ব জাগ্রত হইয়াছে, সকলেই বিশেষত পূর্ববঙ্গজরা এ হেন হতভাগ্য সময় লইয়া কিছু রোজগার করিতেছে: আর্থিক ও জনপ্রিয়তা! কাহারও মনে দুঃখের লেশমাত্র নাই, পদ্মার ওইদিকে ভারী মজা হইতেছে, এই সুযোগ! প্রতিটি দৈনিকে মুরগার মাংস খাওয়ার গল্প; মনুষ্যত্ব যে কবে ছেনতাই হইয়াছে তাহা ভগবান জানেন। একবার ভাব, লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইতে আছে— শিশুরা হত্যা, রমণীরা ধর্ষিতা, নিরীহ মূঢ় তাবিজ পরা হাত মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে। কত, 'বাঁচান' 'বাঁচান' বলিয়া ক্রন্দন রোল সেখানকার আকাশ বাতাসকে মথিত করিতেছে— কততে 'আল্লারে!' বলিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। ইহা ধর্মযুদ্ধ।

সেই ধর্মযুদ্ধ লইয়া আমরা কি করিতেছি?

কলিকাতায় ক্রন্দনের স্থান নাই— ক্রন্দন প্রবণতা খবরের কাগজ শুষিয়া লইয়াছে— পূর্ববঙ্গে কি যে হইতেছে তাহা যাহারা ৪২ রায়েট মন্বন্তর দেখিয়াছে তাহারা কিছু আঁচ করিতেছে; কি ভয়াবহ কি বুক-আঁচড়ান ব্যাপার।

আমি হতচকিত হইয়া আছি লেখা একেবারে বন্ধ। মনে হয় আমার রক্ত শুকাইতেছে— আমি রেডিও শুনিতে পারি না— বরাবর মনে হয় 'হায় বেচারা' মধ্যে মধ্যে রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়— 'বাজান' 'বাজান' শুনি। আমার একমাত্র রোদনে ছাড়া আর কিসেই বা অধিকার থাকিতে পারে।

বঙ্কিমবাবুর ছাঁদে বলিতে ইচ্ছা হয়, ধন্য মুজিবর[1] তোমাকে ধূলা ছোঁওয়া কুর্ণিশ জানাইতেছি, তুমি আমাদিগকে তলে দিয়াছ— তোমার লোকেদের মরিতে বল আমরা দারুণভাবে পদ্য ছড়া ইত্যাদি লিখিব— (আজিকার এক 'ছড়ায়' আছে— পাকিস্তান ভাঙিতেছে তাই এই হরির নুট আ. বা. দেখ—৩১.৩) ইস্কুলে ছুটি পাইব রেডিওতে গলা কাঁপাইব কাগজে হাতে-কাটা খবর প্রস্তুত করিতে আমরা কি পর্য্যন্ত দড় তাহা বুঝাইব, আমরা সেনসেসন তুলিব— মুজিবর, তোমার লোকদের দাঁত ছ্যাংরাইয়া মরিতে বল— আমরা বগলে ইঁট লইয়া ফিরিতেছি— শহীদ পাঁজা করিব (জনান্তিকে, বেশ হইয়াছে! শালা মোছলমানরা মরিতেছে!) আমরা আধুনিক স্বাধীন বাঙালী— আমরা রবিঠাকুরের ব্রাহ্মসঙ্গীত গাহিব— ইহাতে মৃতদেহের কোন গুণা হইবে না! বেহেস্তে যাইবে। আল্লার কিরে মুজিব যুদ্ধ থামাইয়ো না!

যাহারা আমার মত বয়সী যাহারা জীবনে কোন রাজনীতি অথবা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নহে তাহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতেছে— কলিকাতায় ক্রন্দনের স্থান নাই— ক্রন্দন প্রবণতা খবরের কাগজ শুষিয়া লইয়াছে— পূর্ববঙ্গে কি যে হইতেছে তাহা যাহারা ৪২ রায়েট মন্বন্তর দেখিয়াছে তাহারা কিছু আঁচ করিতেছে; কি ভয়াবহ কি বুক-আঁচড়ান ব্যাপার। আমরা এদিকে পয়সা রোজগারের সুযোগ দেখিতেছি— "পূর্ববঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ পড়ুন," "অমুক থিয়েটার দেখুন" কি নিষ্ঠুর পরিহাস! "আমি কি দারুণ পদ্য লিখিয়াছি!" রামপ্রসাদের ঢঙে কেহ লিখিয়াছিলেন, একবার ওলট পালট করে দে মা লুটে পুটে খাই— ঐ সূত্র এখানে কাজ আশ্চর্য্যভাবে করিতেছে।

কি ভাগ্যে হিঁদু শালারা আজ পাকিস্তানের মানে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী নহে, ভগবানের কি অপার করুণা যে দ্যাশের লোকদের উহারা তাড়াইয়াছে— তাহা না হইলে, মুজিবর কবে রসাতলে যাইত। হিঁদুরা মানে উচ্চবর্ণের যাহারা ঋণ করিয়া রাজা রাজবল্লভ হইত। ইয়াহিয়া খাঁকে জান কবুল রাখিত। চাকরী পাইত। আমার কথায় নিশ্চয় তুমি সায় দিবে। এবং আমাদের সরকার তাহা ভালভাবে জানে, নানাবিধ গোলমাল থামাইতে ধামা ভরিয়া চাকুরী আনিতেছে— তাহারা জানিয়া লইয়াছে বিড়ি খরচা পাইলেই বাঙালী পুঙ্গব সব বিদ্রোহ ছাড়িয়া দিবে— তাহার পর যে বেটারা রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া খাইত তাহারা তেমনই চলিবে। সরকারের মতন বিদ্রোহকে এরূপ শ্রেণীগত ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করা কোন ধূর্ত্তরাও জানে নাই। অবশ্য নেপোলিয়ান Subversive youngman-দের তকমা দেওয়ার প্রবর্তন করেন। দেখ, ঐ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ লইয়া কি ছিনিমিনি! ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, কোন সাহেব epic লিখিবে বলিয়াই আফগান যুদ্ধ ঘটে।

এই চশমখোর যুদ্ধ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তুমি কিছু মারাত্মক যুদ্ধ লিখিতেছ না (ঠাকুরকে ধন্যবাদ!), বুক-ফাটা ব্যাপার লইয়া ছেলেখেলা করার জন্যই বঙ্গদেশের আজ এই দশা! নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে, তাহা আমরা ছাড়াইয়া গিয়াছি, যে কোন উপায়ে পয়সা! বাঃ! যমুনালাল বাজাজ আর গান্ধী মিলিয়া স্বদেশী আন্দোলনে কোটি টাকার তুলা বেচিয়া লাভ করে।

মনে কর পূর্ববঙ্গের কোথাও পশু পাখী নাই, গুলির আওয়াজে অন্যত্র পালাইয়াছে, কোথাও অন্ধ, বৃদ্ধ পথ খুঁজিতেছে— কোথাও খাদ্য নাই— জল নাই (বার্মার রিফিউজীদের দেখিয়াছিলাম) বালিকারা আপন জন্মকে ধিক্কার দিতেছে, কেননা তাহারাও জানিল তাহারা রমণী। সৈন্যরা যে কি তুমি বোধহয় জান না, রণাধ্যক্ষ মন্টি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রশংসা যদিও করেন— নৈতিক বলের— অনিরুদ্ধ[2] বলিল, ইতালীতে ভারতীয়রা মেমসাহেব দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যায়। রায়েট ১৬০ নং হ্যারিসন রোডে— ইস! মেদিনীপুরে ইংরাজদের কথা মনে কর। একটা মেয়েকে লইয়া কি ছেঁড়াছেঁড়ি। গুলিতে শিশুকে রাস্তায় সত্যি মরিয়া লুটাইতে দেখিয়াছ! তাহা হইলে আমার কথা বুঝিবে।

ভাল, এখন নিজের চরিত্র প্রতিফলিত দেখিয়া বড় ক্ষোভে আছি— শুধু নিয়ত ঠাকুরকে ডাকি— বলি ঠাকুর পূর্ব্ববঙ্গের নিরীহদের রক্ষা কর উহাদের তুমি ছাড়া কেহ যে নাই। আর আমার দ্বারা কিছু সম্ভব নয়।

আমি হতচকিত হইয়া আছি লেখা একেবারে বন্ধ। মনে হয় আমার রক্ত শুকাইতেছে— আমি রেডিও শুনিতে পারি না— বরাবর মনে হয় 'হায় বেচারা' মধ্যে মধ্যে রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়— 'বাজান' 'বাজান' শুনি। আমার একমাত্র রোদনে ছাড়া আর কিসেই বা অধিকার থাকিতে পারে।

ঠাকুরের কে জানে কি ইচ্ছা।

ইতি

কমলকুমার মজুমদার

টীকা:

১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

২ অনিরুদ্ধ লাহিড়ী। প্রাবন্ধিক

৫

২৬.৮.৭১

স্নেহের সন্দীপন

তুমি যখন আসিয়াছিলে তাহার পর আমি ইন্দ্রের দোকানেতে যাই কিন্তু কথামত তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহার পর তোমার সংবাদ পাইলেও, তোমার সহিত সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করি নাই কারণ আমার শরীর আবার বর্ষায় খুব ছোট খাইয়াছে। নিমাই[1]-এর নিকট তোমার দুর্গতির কথা শুনিলাম, গত

৮ই তারিখের, যখন ঐ বিরাট অংশ যাহারা হত্যা হইল তাহাদের নিমিত্ত মন উচ্চকিত ছিল, এই গুণ এখনও আমার তোমার আছে, ইহাকে মানবতা কহিতে অধোবদন হই, যাহা সদ্য আমাদের বংশমর্যাদা হেহেতু আমার নাম কমলকুমার মজুমদার আমার পিতার নাম প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার আমার ঠাকুরদাদা বরদাকান্ত, এই ভাবে বহু পুরুষ হইতে গঙ্গা স্নাত এই দেহ বহু পুণ্যের আশ্রয় এই দেহ— এই দেহ ধরিয়া রামচন্দ্র, এ বড় জবর ঘর! ভাবিয়া দেখ, অবিকল তোমার পূর্ব্বতনের কথো,— ইহা সেই বোধ, পাদরী কথিত মানবতা নহে। মানবতা শব্দটা তাহাদের যে শালারা খবরের কাগজে আদত কথা গায়েব করিবে! ইহারা তাহারা যাহারা ভগবানকে দেখিয়া বলিয়াছে— মহারাজ, উহা ভগবানের ভূত! মহারাজ বিশ্বাস করিতে বাধ্য। ইহারা সাধু হইবে যখন অর্শ উহাদের সারিবার নয় তখন জড়িজাড়া— তখন অলৌকিকতা, তখন একটা কিছু আছে বুদ্ধ (দশ অবতার মধ্যে জয়দেব একটি) বেদে নিন্দা করেন, ব্রাহ্ম-গণে বেদ-এর প্রশংসা সূত্রে জানিতে পারিবে উহারা অমৃতর পুত্র! মানুষ মাত্রেই তাহাই (অহো), এক নিজের হাত-কামড়ানো ছাড়া আর আমরা কিছুই করিতে পারিবার মত লায়েক আমি তুমি নহি! মানুষ কোথায় গিয়াছে নহে কোথায় উঠিয়াছে, কি চমৎকার তাহার স্বরূপ। কিন্তু যে শালারা আজ একদলের হইয়া অন্যকে বধ করিতেছে তাহারা কি প্রত্যেকেই ভোটে দাঁড়াইবে! সমাজতত্ত্ববিদরা অনেক উত্তর তৈরী করিবে— বেকার, এবং নানান ব্যাপার। (আমরা যাহারা রাজনীতিকে একেবারে সহ্য করিতে পারি না তাহাদেরই আকন্ঠ) বৈজ্ঞানিক জগতের একটি অবদান, বড় খুসীর ইহা যে, মানুষের দোষ কিছু নয়, উহা সমাজের! বম্বে ফিল্মেও বাংলার নভেল লেখক, ঐ তত্ত্বের কারবারী— মানুষ অবশ্য একটা ছিল! সেটি আমরা রামায়ণে উল্লেখ দেখি, যাহা খবরের কাগজ আমাদের ভুলাইয়াছে: যদি এমন অন্তর করা যাইত যাহাতে বিবেক দেখা যায়— জানিব সবটা খবরের কাগজ হইয়াছে, যেটুকু বোধ তাহা কানাডা কখনও নরওয়ের পাইন-বনের সুবাস— তাই lyricism! একবার স্বামী অভেদানন্দ-র আশ্রমের মানে মঠের এক কাগজে— (বিশ্ববাণী সম্ভবত), প্রথম দিককার, পড়িয়াছিলাম— গুজরাট হইতে নাটুকে দল আসে, তাহাতে এক চরিত্র এক গীত গায়— যে দুনিয়া সব খবরের কাগজ হইয়াছে। জীবন যাত্রা কত সহজ হইয়াছে তাহা আর্ট সাহিত্যে চর্চায়ে বুঝা যায়! প্রমাণ সাইজের (রেডিমেড কাপড় বিক্রেতার বচন) নায়ক, তরুণী নায়িকা— পশ্চাতে অভাব অভিযোগ, মনে হইবে ইতু পূজার ব্রতকথা শুনিতে আছ— এখানেও সমাজ (!) আছে, যে সমাজ খবরের কাগজ পড়ে, রেডিও শোনে, ভোট দিবে, সখীর নাচের মত কিছু যৌনতত্ত্ব; মানুষের দুঃখ যে তাহার হাত হইতে ভালবাসা তাহার মূর্খামীর দোষে অথবা যেমন প্রাচীনে যে কোন দেবতার ঈর্ষায়, তাহা মৃগয়া হইয়া গিয়াছে,

তাহার এ লেখাতে হদিশ কোথাও নাই। হ্যামলেটের ক্রোধ এই যথার্থ যে তাহার প্রেম সম্পর্কে যে উষ্ণতা যে শ্রদ্ধা তাহা হাজিয়াছে, মানুষের প্রেম যখন যায় তাহার রহিল কি, আমাকে এই সত্য দিয়াছিল ইহা যে পাখীর ওষ্ঠধৃত শুষ্ক ডাল যখন চ্যুত হয় যখন তাহা আমার গায়ে পড়ে, তখন যে রোমাঞ্চ আমাকে ছাড়াইয়া আর এক আমাতে, এবং যখন উহা মাটিতে পড়ে তখন তাহার উপর আমার জুতা পড়ে (বুট), যে শব্দ হয়, তাহাতে একটা সভ্যতার তড়কা লাগিল। দশদিক কালো হইল, কোন বৈষ্ণব কবিতা তাহাকে রুখিতে পারিয়াছিল না, আমি একি অদ্ভুত সার মাত্র, আভাস মাত্র, abstract মাত্র। আমি একটি ভালবাসাকে পদদলিত করিলাম, ক্ষণেকের জন্য, ঐ পক্ষী বিভ্রান্ত, যে তাজ্জবত্ব! সেইটি ভালবাসা ভুলিল, নীড়-নির্মাণ কিভাবে তাহার নিকট অসংখ্য অংশ হইয়া আছে, কিভাবে সে এক অভিনব ধামা সৃষ্টি করে বৃত্ত কল্পনা উহার উদরের মোলায়মত্ব! আশ্চর্য্য এক ডিমের মধ্যে সেই ভাবনার অধিষ্ঠান রহে। ঐ বক্স-অফিস ছাতু করা প্রেম, তাহাকেই বেচারী দর্শক মানিবে, সে জানিল প্রেমে তাহার অধিকার নাই, দর্শক হইবার তাহার ক্ষমতা আছে। সে প্রেম দেখিবে! প্রেম একটা সাঁওতাল পরগণার সিনারী— সে স্বনামে বদনামে বেনামে বকলমে পিতা হইবে। সে ও তদীয় স্ত্রী ঐ প্রেম দেখিবে, এবং কাটলেট খাইবে এক রেস্তরাঁয় যেখানে পেঁয়াজ চাহিলে আর দেয়। ইহার পর স্ত্রীর কোন আত্মীয়, ধর তাহার মা'র বাড়ী যাইবার হলপ, এবং সে তাহার দরুণ চাবি দিয়াছিল স্বামীকে। স্বামী শিষ দিতে কালে হাঁফ ছাড়িল, পানের দোকানে আয়নায় মুখ দেখিবে, সেখানে অল্প বয়সী ছোকরা ইহার উপর ভ্রূকুঞ্চিত করিল মাত্র। এইসব কথাই আমি লিখিয়াছি যে গল্প তোমাকে বলি তাহাতেই।

আমি একটি প্রবন্ধ[১] লিখিয়াছি— মৌলিক নহে, ইহা প্রুস্ত বিষয়ে— এখন তাঁহার ১০০ বছর পূর্ণ হইল, যাহা

ঐ বক্স-অফিস ছাতু করা প্রেম, তাহাকেই বেচারী দর্শক মানিবে, সে জানিল প্রেমে তাহার অধিকার নাই, দর্শক হইবার তাহার ক্ষমতা আছে। সে প্রেম দেখিবে! প্রেম একটা সাঁওতাল পরগণার সিনারী— সে স্বনামে বদনামে বেনামে বকলমে পিতা হইবে।

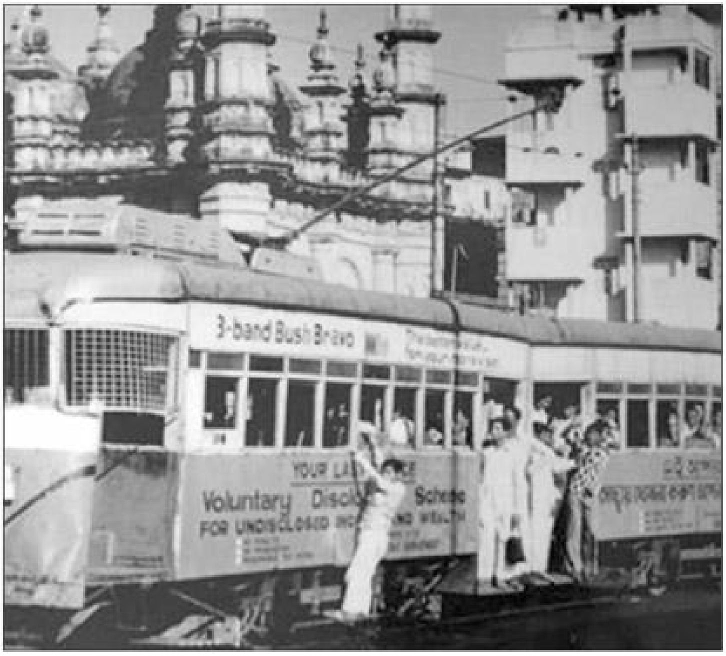

তোমাকেও বলি দেশের জন্য (দেশের ম্যাপের জন্য) কিছু করিও না, কারণ আমাদের উচ্চবংশীয়দের সব গিয়াছে— নিজের জন্য কিছু লিখ; তোমার মধ্যে ভগবানের খেলা আছে, আনন্দ কর! লিখিও।

পড়া ছিল; তাহা এবং নূতন কিছু ঐতে সংযোজিত হয়, সবটাই একরূপ তর্জমা বলা যায়; আমাদের পাঠকদের জানি, প্রুস্ত নামেই নাল ঝরিবে। অথচ কেহই আদতে যে কি ধরণের লেখক প্রুস্ত তাহা জানেই না, বাঙলা লেখক কাহারই বা কি জানে। একদিন শক্তিকে দোকানেতে ধরিয়াছি, কহিলাম, বল, বাঙলার পদ্য বল। মোটামুটি নাম বল, এবং একের পর এক চর্য্যা হইতে বৈষ্ণব পদাবলী, রামপ্রসাদ, ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, বলদেব[৩]— তবে শক্তি বেচারী স্বীকার করিল (ইদানীংকার ক্রিয়াপদ রাখিল) যে সে জানে না; তবে শক্তি বেশ বদলাইয়াছে তাহা নয়, পূর্ব্বকার আড়াতে ফিরিয়াছে যখন ছোঁড়ার অনেক দাড়ি ছিল শ্যামবাজারের কফি হাউসে বসিত সে আজ ১৫/১৬ বছর আগের কথা (তখন শক্তির বয়সই ১৫ তবে দাড়ি কি করিয়া হয়!) জানিনা বাপু! তুমি এবার কি রূপ লিখিলে— তোমাদের দেশে এবার ফলন কেমন; চাষাড়ে প্রশ্ন! আজ আমরা বহু হত্যাকাণ্ড ভুলিয়াছি— টেবিল ট্রাংকুইলাইজার পড়িয়া থাকে। ঠাকুর করুন তোমার সুখ সমৃদ্ধি হউক।

ইতি—

কমলকুমার মজুমদার

টীকা:

১ নিমাই চট্টোপাধ্যায়। সাংবাদিক ও লেখক

২ প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল 'মার্সেল প্রুস্ত বিষয়ে কিছু'। লেখাটি 'পদক্ষেপ' পত্রিকার শারদ ১৩৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল

৩ বলদেব পালিত। কবি

৬

১২.৩.৭২

স্নেহের সন্দীপন,

তোমার ৯/৩-এর চিঠি পাইয়া আমি খুব মানসিক শান্তি লাভ করিলাম, যে এইহেতু তুমি প্রায়ই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইবার সুযোগ পাও; আমি শত চেষ্টা করিয়া গত কয়েক বছর হইল পারি নাই, বাসনা ছিল কোন বিরাট শাল বৃক্ষকে স্পর্শ করি, সে গাছ এত পবিত্র যে তাহার গাত্রে উই লাগে নাই, নদীবৃক্ষ, পাহাড় এসকল আমার নিকট সত্য! ঠিক তেমন নহে, যে রূপে তত্ত্বদর্শীরা দেখিয়া থাকেন, এখানে বন্ধু, যেমন কুলদা ব্রহ্মচারী-র (এক সন্ন্যাসী) মা তুলসীকে আপন মনবেদনা জানাইতেন, যেমন মহাপ্রভু বৃক্ষলতাগুল্মের নিকট করজোড়ে বিদায় ভিক্ষা করেছিলেন, যেমন রামচন্দ্র অশোকতরুর নিকট সীতা সংবাদ চাহিয়াছিলেন, যেমন রামকৃষ্ণ ঘাসে পদক্ষেপ করিতে পারিতেন না (এইটিতে কিছু তত্ত্ব আছে); আমি দেখিয়াছি ইহা বোধিত হইয়াছে, কুড়ুলের শব্দে গাছের গাত্র চমকিত হয়। অর্থাৎ এমন এক সরলতা যেখানে দাঁড়াইয়া নির্ভাবনায় মাধব নাম করা যায়— জয় জয় আনন্দ! উহা আমার নিকট বিভূঁই ঔষধ! আবার হাসিতে পারিব! এখানে দারিদ্র্যে অবশ্য যতটা না দারিদ্র্য তাহার বেশী আলোচনাতে মস্তিষ্ক বিকৃত হইতেছে, অনবরত বিষয় চিন্তা। রামায়ণ পড়ার মত বিশ্বাস পর্য্যন্ত খোয়া গিয়াছে, আমি ছবিতে মনোসংযোগ করি, গানে কখনও, সবই ক্ষণিক! লোকমান্য হইবার বাসনা আমার নাই— কারণ এখন ছোটলোকের জগৎ— তাহাদের নিকট কেউ হওয়ার কোন মানেই হয় না; হায় সেদিন 'দর্শকে'[১] পড়িলাম সাবেক মধ্যবিত্ত ক্ষীয়মান হইতেছে এবং সরকার উৎসাহিত ছোটলোক শ্রেণী উপরে আসিতেছে, ফলে সকল সুকুমার বৃত্তিই অর্থহীন। তোমাকেও বলি দেশের জন্য (দেশের ম্যাপের জন্য) কিছু করিও না, কারণ আমাদের উচ্চবংশীয়দের সব গিয়াছে— নিজের জন্য কিছু লিখ; তোমার মধ্যে ভগবানের খেলা আছে, আনন্দ কর! লিখিও। আমি একটা সুব্রতর চিঠির উত্তর দিয়াছি— কিন্তু উত্তর নাই!

ইতিপূর্বে পত্র কি পাও নাই? ঠাকুর তোমাকে আনন্দে রাখুন। ইতি—

কমলকুমার মজুমদার

টীকা:

১ দেবকুমার বসু সম্পাদিত পত্রিকা

আগামী সংখ্যায় আরও চিঠি

উৎস: 'কমলকুমার মজুমদারের চিঠি'। সংকলন ও সম্পাদনা: প্রশান্ত মাজী, গৌতম মণ্ডল
সৌজন্য: আদম

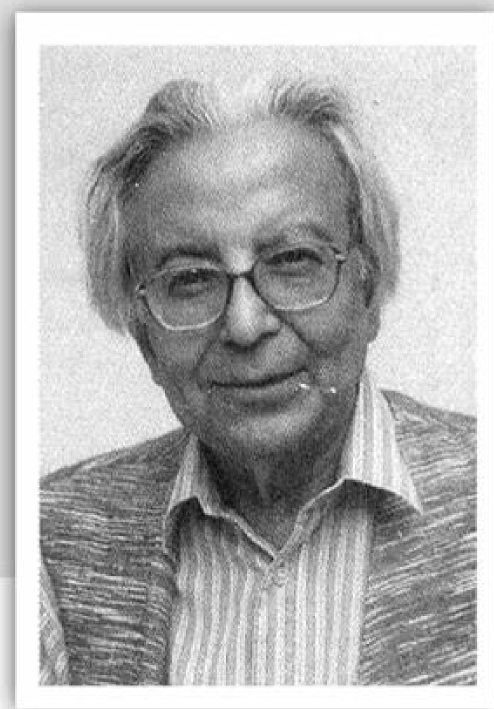

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে লেখা চিঠি

পর্ব : ২

বুদ্ধদেব বসু। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
আলোক সরকার। শঙ্খ ঘোষ

আমাদের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের তরঙ্গাহত তরণীটির কথা ভুলে যেয়ো না।

বুদ্ধদেব বসুর চিঠি

৪/১০/৬০

কল্যাণীয়েষু

অলোকরঞ্জন,

প্রথমে সায়ান্স ক্লাশের[১] কথা লিখি। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল গুহর[২] আনুকূল্যে ইংরেজি অংশের ভার ইংরেজি বিভাগে বদল করা সম্ভব হ'লো, হয়তো ছুটির পর থেকেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত হবে। কিন্তু বাংলা অংশ বিষয়ে কিছু স্থির হয়নি। আমি একবার গণেশবাবুকে[৩] জিগেস করেছিলুম তিনি আংশিকভাবে বাংলার ভার নিতে রাজি কিনা। উত্তরে তিনি বললেন কোনো আংশিক ব্যবস্থায় তাঁর মত নেই; নিতে হ'লে পুরো সায়ান্স এবং পুরো প্রেপারেটরি তিনি চাইবেন, এবং এও বললেন যে 'বাংলা' নামে যা চলে তা বাংলা বিভাগেরই অধিকারভুক্ত হওয়া উচিত— যদিও তিনি সে-কথাটা তুলতে ইচ্ছুক নন, আপাতত উপযোগী হলেও তাঁর নেই। তুমি অনুমান করতে পারছো যে এর পরে আমি আর কোনও উচ্চবাচ্য করিনি, কিন্তু তুমি যদি প্রেপারেটরির সঙ্গেও সম্বন্ধ ছিন্ন করতে রাজি থাকো, চাইলে না-হয় ছুটির পরে আমিই কথাটা তুলবো। আমি শুধু চেয়েছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অংশের সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র ও বহুনিন্দিত বিভাগের[৪] সংযোগ থাক, কিন্তু তা যদি কিছুতেই ঘটিয়ে না-তোলা যায় তাহ'লে অগত্যা অনিবার্যকে মেনে নেবো। কোনটা উচিত হবে, তোমাকে ভেবে দেখতে বলি।

প্রশ্নপত্র কলেজ খুললে দিলে চলবে; তবে এখন মনে হয় না যে এ নিয়ে তোমার চিন্তাকুল হবার কারণ আছে।

রুমিদের[৫] ক্লাশে আরও কিছু পড়াতে চাও? বেশ, তুমি ফিরে এলে এ-বিষয়ে কথা বলা যাবে। কোন অংশ পড়াবে, আর সেজন্য তুমি কতদূর প্রস্তুত, তার ওপরে অনেকটা নির্ভর করে। আমি যে-রোমান্টিসিজম-এর পেপারটা পড়াচ্ছি, তার ইংরেজি অংশটুকু ভার নিতে পারবে? তাহ'লে আমার অনুপস্থিতিকালে ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্য বজায় রাখা যায়। আমার মনে হয় এইটেই তোমার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল হবে। তুমি কী বলো?

আমেরিকায়[৬] আমাকে প্রধানত ভারতীয় ও বাংলা সাহিত্য পড়াতে হবে। পাশ্চাত্য ধারার সঙ্গে তুলনা ওদের অভিপ্রেত। পাঠসূচির একটা খসড়া ওদের পাঠিয়েছি, যাবার আগে তোমার পরামর্শ নিশ্চয়ই চাই। আমাদের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের তরঙ্গাহত তরণীটির[৭] কথা ভুলে যেয়ো না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রভাবে বিভাগের সম্প্রসারণ যদি সম্ভব হয়, তাহ'লে নানা দিকেই আমাদের পথ সুগম হবে।...[৮]

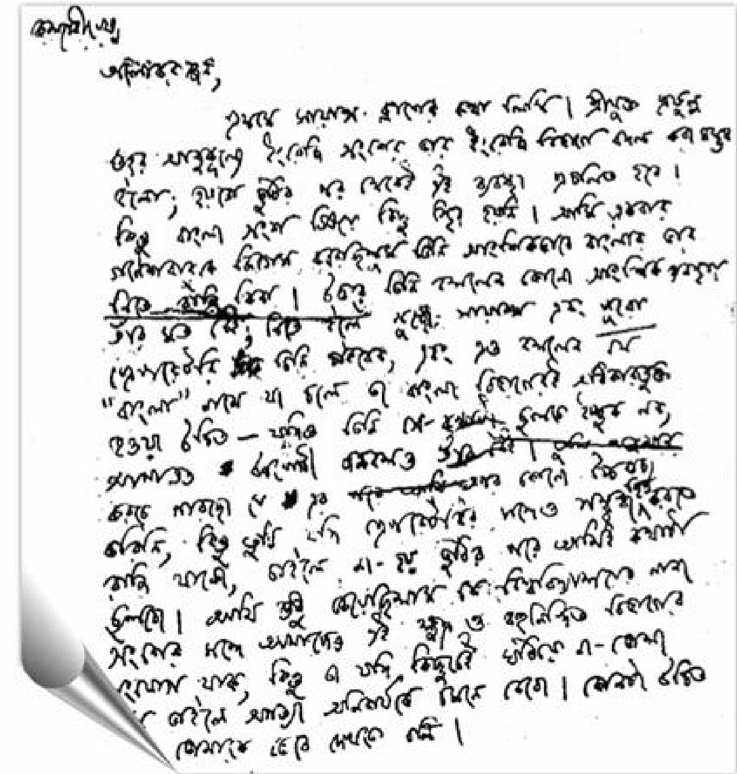

বুদ্ধদেব বসুর চিঠির অংশবিশেষ

টীকা:

১. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগ।

২. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান ছিলেন।

৩. গণেশ ঘোষ (?)

৪. তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ।

৫. দময়ন্তী বসু সিং। বু.ব.-র কনিষ্ঠা কন্যা।

৬. মার্কিন যুক্তরাজ্যের নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে সেখানে পড়াতে গিয়েছিলেন বু.ব.।

৭. নানা কারণে তু.সা. বিভাগ তখন টালমাটাল হয়ে পড়েছিল।

৮. চিঠির শেষাংশ পাওয়া যায়নি।

ভাল মানুষ অনেক। কিন্তু তারা বড় বেশি ভাল। মন্দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সবাই আত্মরক্ষা করছেন।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

১

সুচরিতেষু,

আপনার ২৫ ফেব্রুয়ারির চিঠি গতকাল বিকেলে পেয়েছি। আজ চিঠি লিখছি। সুভাষ[১] বা দিলীপের[২] সঙ্গে আমার তো কোনও পরিচয় নেই। নিজে থেকে শ্রীমানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কেমন অস্বস্তি লাগে। দেখি, চিঠি পেয়ে ওঁরাই কোনো যোগাযোগের চেষ্টা করেন কিনা।

মা[৩] আপনার কাছে যাচ্ছেন জেনে সুখী হলাম। আমি যাদবপুরের বাসায় আর কোনো যোগাযোগ করিনি। তিনি নিশ্চয় তখন দিল্লীতে। ভাইয়েরা তো ওখানেই আছেন। ওঁদের নাম এবং ঠিকানা আমাকে জানাবেন। দরকার হতে পারে। আমার খুব ভাল লাগতো যদি আপনি আমার কয়েকটি ছোট কবিতা নিজে অনুবাদ করতেন। সেইক্ষেত্রে অন্য কাউকে না পেলে আমিই একটি ছোট এক ফর্মার বই ছেপে বের করতাম, মহাশয় শঙ্কর দাশগুপ্তর[৪] সাহায্য নিয়ে (অর্থাৎ তিনি productionটি দেখে দিতেন)। আমি চাকরী ছেড়ে দিচ্ছি। খুব সম্ভব এই মাসই (মার্চ ১৯৮০) আমার চাকুরীজীবনের শেষ মাস। সঞ্চয় আমার কিছুই নেই, gratuity যা পাবো তাও খুবই সামান্য। ভবিষ্যতের কথা এখন কিছুই ভাবি নি এবং বোধহয় ভেবে কোনও লাভ নেই। অতীতে যৌবনকালে একটানা পাঁচ বছর বেকার জীবন কাটিয়েছি, দেখা যাক, ভবিষ্যতের পাঁচ বছর (যদি ততদিন বেঁচে থাকি) কেমন যায়।

এইসঙ্গে আপনাকে আমি কয়েকটি স্বনির্বাচিত ছোট কবিতা পাঠাচ্ছি। আপনি নিজে অবসর সময়ে আমাকে ১/২/৩টি অনুবাদ যদি পাঠিয়ে দেন; অর্থাৎ এইভাবে যদি কাজ শুরু করেন; আমি হয়তো কখনও একটি ছোট্ট বই বের করতে পারবো। অবশ্য যদি টাকার ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু চেষ্টা করব।

মাকে প্রণাম জানাই, আপনাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

পুঃ কবিতা তো পাঠালেন না? এখনই কয়েকটি কবিতা পেলে বৈশাখ মাসে কাজে লাগাই।

শ্রীমান সুরজিৎ[৫] একদিন এসেছিলেন। আমার একটি ৪/৫ ফর্মার বই ছাপতে চান। প্রস্তাবটা আন্তরিক বুঝতে পারলে তাকে তাড়াতাড়িই একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দেবো। production যতদূর মনে হয় ভালই হবে। আপনার ছটি বইও তো ওঁরা ছেপেছেন।

আপনি কি প্রেমেনদার[৬] ওপর (অথবা তাঁকে নিবেদিত) একটি ছোট্ট কবিতা আমাকে লিখে পাঠাবেন। অবশ্যই যদি মন চায়। একটু তাড়াতাড়ি পেলে খুবই কাজে লাগবে।

৪ মার্চ, ১৯৮০: সন্ধ্যা

বীরেনদা

টীকা:

১. 'হীনযান' পত্রিকার সম্পাদক সুভাষ ঘোষাল।

২. 'হীনযান' পত্রিকার অন্যতম সদস্য ও পরবর্তী সময়ে সম্পাদক দিলীপকুমার চক্রবর্তী।

৩. নীহারিকা দাশগুপ্ত।

৪. প্রাবন্ধিক ও ছোটগল্পকার।

৫. 'প্রমা' প্রকাশনীর কর্ণধার।

৬. কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮)।

৭. অলোকরঞ্জন কবিতাগুলি অনুবাদ করেছিলেন। Wailing at Night শিরোনামে এই অনুবাদগুলি অগ্রন্থিত হয়ে আছে।

৮. চিঠিটি ছিঁড়ে যাওয়ায় কবিতাটির শেষাংশ পাওয়া সম্ভব হয়নি।

২

(৫ বৈশাখ, ১৩৮৭/রাত্রি)

...লেখা কেমন যেন কমে আসছে। অনেক সময়েই মনে হয় কিছুই লেখার নেই। ভয়ঙ্কর অন্ধকারগুলি ঘুরে ফিরে ভয় দেখায়। ভয় কাটিয়ে তাদের উল্টো ধমক দেবো, ...ভয়ানক পুরানো হয়ে যাচ্ছে। আলো, বাতাস, মানুষের বড় অভাব। ভাল মানুষ অনেক, তাদের সংখ্যাই বেশি (নষ্ট, পচা মানুষদের চেয়ে)। কিন্তু তারা বড় বেশি ভাল। মন্দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে সবাই আত্মরক্ষা করছেন। আমি ভালও নই, মন্দও নই— কোথাও কোনো মাটি খুঁজে পাই না।

যাক, আজ এই পর্যন্ত। সারাদিন লোডশেডিং-এর পর এখন একটু পাখার হাওয়া পাচ্ছি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

আপনারা ভাল আছেন, চিঠি পেলে খুব ভাল লাগবে।[১]

১৮/৪/১৯৮০ বীরেনদা

টীকা:

১. চিঠিটির প্রথমাংশের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই এর গুরুত্বপূর্ণ শেষাংশটাই এখানে মুদ্রিত হল।

আলোক সরকারের চিঠি

কলকাতা। মহালয়া। ২০ আশ্বিন ১৩৯৮

ভাই অলোক

অনেকদিন আগেই এই চিঠি লেখার কথা ছিল, কিন্তু কিছুতেই ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারছিলুম না। সেদিন পথে দৈবক্রমে বিজয়বাবুর[১] সঙ্গে দেখা হওয়ায় ঠিকানা পেয়ে গেলুম। এখন আমার সমস্যা ঠিক কী-ভাবে সেই সন্ধ্যার আনন্দের কথা আপনাকে জানাই। সেদিন যে ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছিলুম তাতে আমি অভিভূত বললে সবটা বলা হয় না। আমি যে সেই সম্মানের যোগ্য নই তা আমি জানি, কিন্তু কে ভাবতে চাইছে সে-কথা, সেই সন্ধ্যার আনন্দ-কল্লোল এখনও মনে-মনে লালন করছি। বয়স অনেক হলো, এবং যেমন হয়ে থাকে, জীবন এখন অবিমিশ্র সমতল ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে যেমন কোনো উত্থানের স্বপ্ন নেই, সেইরকম পতনের দুঃস্বপ্ন। এখন কেবল সকলের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। সবচেয়ে বড় অভিশাপ নিজের পণ্ডশ্রমগুলির দিকে ফিরে চাওয়া।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আলোক সরকার

যাক এ-সব কথা, কবিতা তো এখনও লেখা হচ্ছে। কত ভালো কবিতা লেখা হচ্ছে, তা পাঠের আনন্দ তবু তো এখনও আছে। আপনার কবিতা, প্রথমদিনের মতো এখনও আমার আশ্রয়, অবশ্য এ-কথা লেখার কোনও প্রয়োজন ছিল না, আপনি তা জানেন। কত তরুণ কবি এখন যে কত ভালো কবিতা লিখছে— এইসব অভিজ্ঞতা আমাকে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে উৎসাহ দেয়। আপনি কবে কলকাতায় ফিরছেন? আপনার সঙ্গে দেখা হলে কত যে আনন্দ পাব। ভালোবাসা।

আলোক

টীকা:

১. বিজয় দেব।

শঙ্খ ঘোষের চিঠি

১

শ্রী

A1/6 ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস
68/1 বাগমারি রোড
কলকাতা 700 054

অলোক,

আমাদের আহ্লাদ জানানো[১] টেলিগ্রাম কি পৌঁছেছিল তোমার হাতে? প্রশ্নের একটা কারণ হচ্ছে ডাকঘরের ব্যবহার। বয়ানটি পরীক্ষা করে ডাকঘরের কর্মী বলেন, ঠিকানা অসম্পূর্ণ থাকলে টেলিগ্রাম যাবে কী করে? 'অসম্পূর্ণ কোথায়?' জিজ্ঞেস করি। তিনি জানান,

বয়স অনেক হলো, এবং যেমন হয়ে থাকে, জীবন এখন অবিমিশ্র সমতল ভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানে যেমন কোনো উত্থানের স্বপ্ন নেই, সেইরকম পতনের দুঃস্বপ্ন।

অলোকরঞ্জনের হির্শবার্গের বাড়ি

শঙ্খ ঘোষের চিঠির অংশবিশেষ

বুঝতে পারছি, অ-কৃত সপ্তসিন্ধুর প্রচ্ছন্ন কোনো চাপ অবচেতন থেকে জেগে উঠেছিল নিশ্চয়। তার সঙ্গে, শক্তির এই আকস্মিক মৃত্যুর ধাক্কাটা হয়তো মনকে কেবলই পুরনো দিনে টান দিচ্ছে।

জার্মানিতে হির্শবার্গ[২] আছে ছটা, এই দেখুন। ব'লে একটা ঢাউস বই আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'দেখুন।' দেখি। সত্যিই সেখানে ছবার নামটা লেখা আছে, পাশে এক-একটা আঞ্চলিক নাম। অনুমানে ভর করে বলি, আমি তো একটা ২ লিখেছি পাশে—ওটাতেই আপনার কাজ চলবে। মাথা দুলিয়ে তিনি জানান, 'না, চলবে না, দুঘণ্টার মধ্যেই এটা আমার কাছে ফেরৎ আসবে।' বিরক্ত হয়ে বলি, আসুক, আপনি পাঠিয়ে দিন তবু।

ফিরে আসবার আগে টেলপৃষ্ঠাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে, এ তো দেখছি 1956 সালে ছাপা, এই নিয়েই আপনারা কাজ করেন? কর্মীটি বললেন নতুন কিনতে গেলে অনেক দাম।

গরিব দেশে এই কথাগুলি হতে আধঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি। কোনো-একটা সম্ভাব্য পিকনিকের আলোচনায় সহকর্মীরা সবাই ব্যস্ত ছিলেন। সব মিলিয়ে এ-সমস্যাটা তাই রয়েই গেল যে 1956 সালের পর হির্শবার্গে কেউ টেলিগ্রাম করেছে কিনা!

বাজের কথার পর আসল কথাটা হল: বুঝতেই পারছ আমাদের আনন্দের অবধি নেই। তোমার পক্ষে এ-ব্যাপারটা কিছু নয়, কিন্তু আমাদের অনেকের পক্ষে এ একরকম লজ্জামুক্তি। অন্তত, অ্যাকাডেমির গৌরব বাড়ল। আমার মনে পড়ছে 'যৌবনবাউল' বেরোবার পর-পরই 'কৃত্তিবাস'[৩] পত্রিকায় সুনীলের[৪] সম্পাদকীয় মন্তব্য: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'যৌবনবাউল' গ্রন্থটিকে সম্মানিত করলে আমাদের মতে সেটাই হত গত বৎসরের শ্রেষ্ঠ নির্বাচন।

সে হল 1961 সালের কথা!

টুডবার্টকে আমাদের ভালোবাসা জানিয়ো। আসছ কবে? চোখ কেমন?

তোমার বৌদির[৫] একটা অপারেশন হয়েছে সম্প্রতি, তাই শয্যাবন্দী। গার্হস্থ্য হালচাল তাই সুবিধের নয়।

শঙ্খদা

টীকা:

১. সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেন অলোকরঞ্জন—আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরেই এই চিঠিটি লেখা।

২. অলোকরঞ্জন জার্মানির হির্শবার্গে থাকেন।

৩.-৪. 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সম্পাদক তখন ছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

৫. শঙ্খ ঘোষ-এর স্ত্রী প্রতিমা ঘোষ।

২

শ্রী

31 মার্চ 1995

অলোক,

হঠাৎ কাল অনেকক্ষণ স্বপ্নে তোমার সঙ্গে কথা হল। তোমার নিরবধি ব্যস্ততায় কোথাও যেন চলে যাচ্ছ, আর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছ আমার টুকরো একটা গদ্যলেখার ওপর, পাঁচসাত লাইনের গদ্য। ধিক্কার দিয়ে বলছ, শেষ পর্যন্ত এইরকম একটা শব্দ লিখলেন এখানে, এ তো এলিয়ে পড়েছে। (স্বপ্ন ভাঙবার অনেকটা পরেও শব্দটা মনে রেখেছিলাম, এখন সেটা মিলিয়ে গিয়েছে আবার।) লেখায় যেন তোমারও কোনো অংশ আছে, যেন দুজনের মিলিত কোনো ভূমিকা। বুঝতে পারছি, অ-কৃত সপ্তসিন্ধুর প্রচ্ছন্ন কোনো চাপ অবচেতন থেকে জেগে উঠেছিল নিশ্চয়। তার সঙ্গে, শক্তির এই আকস্মিক মৃত্যুর ধাক্কাটা হয়তো মনকে কেবলই পুরনো দিনে টান দিচ্ছে।

শক্তির খবর[১] এতদিনে হয়তো সবিস্তারেই পেয়ে গেছ। তিন মাসের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে গিয়েছিল শান্তিনিকেতনের বাংলা বিভাগে, আনন্দবাজার থেকে অবসর নেবার পর। খুশিতে ভরপুর হয়ে গোটা তিনেক ক্লাস নিয়েছিল ছড়ার ছন্দ নিয়ে, কবিতা পড়বার পদ্ধতি নিয়ে। তারপর একদিন ভোরবেলায়, পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসে, মেয়েকে ট্রেনে তুলে দেবে বলে তাকে চা খাইয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়। এই আকস্মিকতায় সমস্ত দেশ এখনও হতচকিত আর আবেগবিহ্বল হয়ে আছে।

এ-ঘটনার ঠিক দুসপ্তাহ আগে বাঙ্গালোরে[২] তিনদিন একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা দুজন, সঙ্গে অবশ্য

মীনাক্ষীও[3] ছিল। যেসব আহ্বানে প্রায় কখনোই আমি যাই না, কী আশ্চর্য যে সেইরকম একটা কবিতাপড়ার আমন্ত্রণে চলে গিয়েছিলাম এবার, গিয়ে দেখি সেখানে শক্তি। খুবই ভালো কাটল কটা দিন আর ওকে দেখাল একেবারে তাজা, নবায়মান, তৃপ্তিতে ভরপুর। শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে আসবে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে, এসে একটা কবিতাপত্রিকার পরিকল্পনা করবে, এইসব ভাবছিল। তারপর এই কাণ্ড।

যে ঘরে বসে লিখছি তার জানলার ধার ঘেঁষে একটা নিমগাছ। কদিন ধরে গাছটা ভরে গিয়েছে ফুলে, অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে কাল কিছুক্ষণ। হয়তো সেইজন্যেই আরো, গন্ধে একেবারে ভরাট হয়ে আছে ঘর।

শান্তিনিকেতনের কথায় পুরোনো একটা গল্প মনে পড়ল, এবারকার পৌষমেলায়। তখনই লিখব ভেবেছিলাম— কিন্তু আমার জড়তা থেকে মুক্তি দেবে কে আমাকে!

নিমাই চট্টোপাধ্যায়[4] আর অশোক মুখোপাধ্যায় (সমার্থশব্দকোষ-খ্যাত)[5] মেলা থেকে বেরিয়ে ডাকঘরের দিকে হেঁটে আসছেন, এমন সময়ে দুটি যুবা ক্যামেরা হাতে আক্রমণ করে তাঁদের। নিমাইদাকে বলে, 'একটু ছবি তুলতে দেবেন?' নিমাইদা বলেন, 'আমার ছবি? আমি কে? আমার ছবি কেন তুলবেন?' ছেলেরা বলে, 'জানি আপনি কে। দেবেন না একটু?' অনেকরকম কাকুতির পর নিমাইদা অশোকের কাঁধে হাত রেখে বেশ একটা ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়ান, ছবি ওঠে, আর ধন্যবাদ জানিয়ে সেই সুতৃপ্ত ছেলেদুটি বলে যায়, 'আপনি যে অলোকরঞ্জন, তা বুঝতে পারছি না ভেবেছেন?'

অশোক সাক্ষী না থাকলে ভাবতাম এটা নিমাইদার আরও-একটা বানিয়ে বলা গল্প। যেমন, ওঁকে যে এর কদিন আগেই বোলপুরে কে একজন সিদ্ধার্থশংকর রায় বলে সাব্যস্ত করেছিল আর ফোনকলের জন্য কিছুতেই টাকা নিতে চায়নি, এ-ঘটনার কোনো সাক্ষী নেই।

এবারকার পৌষমেলা তো ছিল শতবর্ষের মেলা[6], অনেকরকম বাড়তি আয়োজন ছিল সেইজন্য। সে-রকম আয়োজনের এক প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছিল তোমার স্কুলবয়সের লেখা, পাঠভবনের।[7] ভেবো না যেন এসব আমার প্রত্যক্ষে দেখা। ওই ভিড়ে যে আমিও গিয়েছি তা নয়, সবই আমার 'কর্ণেলি' জানা। বুঝতেই পারছ, কৌশলে নিজেকে একটু রাজা বলে নিলাম।

এখানে আমরা আছি নানারকমের হট্টগোলে, যেমন থাকি চিরকাল। জানুয়ারির মাঝামাঝি তোমার বৌদির[8] একটা বড়োরকমের অপারেশন হলো আবার, বন্দী থাকতে হল দেড়মাস। এই কিছুদিন হলো আবার বেরোতে শুরু করেছে, ভালোই আছে। গরমের ছুটিতে টিয়া[9] আসছে মে মাসের মাঝামাঝি, এসে অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই ওকে থাকতে হবে বাংলাদেশে, কাজের সুবাদে। মিঠি[10] তার মেয়ে সামলাতে সামলাতে হিমশিম। আর আমি পরম নিষ্ক্রিয় চরম ব্যস্ততায় দিব্যি একটা নিরর্থক মানুষ হয়ে বেঁচেবর্তে আছি।

তোমরা এবার কবে আসছ? গত নভেম্বরেই তোমার একটা আসবার সম্ভাবনা কোথাও যেন শুনেছিলাম, অনেককে বলেওছিলাম সেইমতো। হয়তো কোনও ভিত্তি ছিল না তার।

মাসিমা[11] এখন কোথায়? তোমার কাছে না দিল্লিতে?

তোমরা দুজনে আমাদের ভালোবাসা জেনো। ভালো থেকো। সাবধানে থেকো।

শঙ্খদা

শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন

যে ঘরে বসে লিখছি তার জানলার ধার ঘেঁষে একটা নিমগাছ। কদিন ধরে গাছটা ভরে গিয়েছে ফুলে, অঝোরে বৃষ্টি হয়েছে কাল কিছুক্ষণ। হয়তো সেইজন্যেই আরো, গন্ধে একেবারে ভরাট হয়ে আছে ঘর।

টীকা:

১. কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণ, ২৩ মার্চ ১৯৯৫।

২. এক জাতীয়-কবিসভায় কবিতা পড়বার আমন্ত্রণে বাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষ। সেখানে এই দুজন ছাড়াও ছিলেন আইয়াপ্পা পানিকর।

৩. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়।

৪. শান্তিনিকেতনে টেট্ গ্যালারীর কিউরেটর ছিলেন।

৫. বানান বিশেষজ্ঞ ও ভাষাবিদ।

৬. শান্তিনিকেতনে পৌষমেলার শতবর্ষ। প্রথম পৌষমেলার অনুষ্ঠান: ১৮৯৪ সালের ২১ ডিসেম্বর।

৭. অলোকরঞ্জন শান্তিনিকেতনে পাঠভবনে ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পড়বার সময়কালে (১৯৪৫-৪৯) অসংখ্য রচনা শান্তিনিকেতনের আশ্রম পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

৮. শঙ্খ ঘোষের স্ত্রী প্রতিমা ঘোষ।

৯. সেমন্তী ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা।

১০. শ্রাবন্তী ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

১১. অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর মা নীহারিকা দাশগুপ্ত।

আগামী সংখ্যায় আরও চিঠি

সৌজন্য: 'অহর্নিশ', বিশেষ সম্মাননা সংখ্যা, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৮০।

ভ্রমণ কথা

তিন নৌকায় তেইশজন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

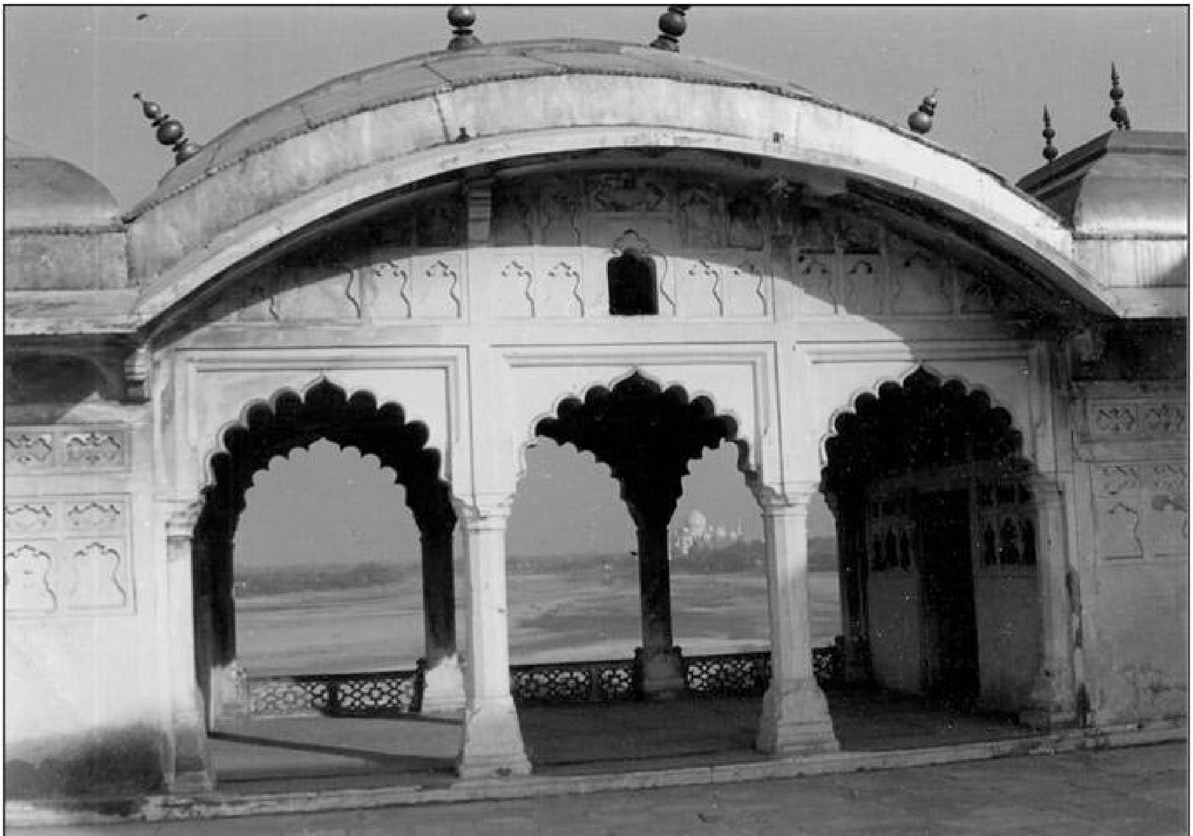

আগ্রা দুর্গ থেকে তাজমহল, শোনা যায় বন্দী শাজাহান এখানে বসেই তাজমহলের দিকে চেয়ে থাকতেন

২০০০ সালের জানুয়ারির শেষ বিকেলের নরম আলোয় জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক শুধু রহস্যময় নয়, ভারি মায়াময়ও হয়ে উঠেছে।

পরদিন সকালে হঠাৎই জঙ্গলে বাঘের আধ-খাওয়া শিকার দেখে মাহুত ঠোঁটে আঙুল চেপে আমাদের সতর্ক করে দেয়, শুকনো ডালপাতায় ঢাকা একটি সম্বরের শুধু মাথাটাই দেখা যাচ্ছিল। এমন যত্ন করে ঢাকা যে মনে হয় এ নিশ্চয়ই মানুষের কাজ। মাহুতরাও বাঘের এহেন নৈপুণ্যে খুব অবাক হয়ে গেছে। বলল, বাঘকে এমন নিখুঁতভাবে আধ-খাওয়া শিকার ঢেকে রাখতে তারাও আগে দেখেনি।

খুবই দুঃখের বিষয়, জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে তোলা দুটো রোলই সেই অরণ্যে হারিয়ে এসেছি।

আমি ছিলাম জঙ্গলের ভেতর ধিকালার পুরনো ফরেস্ট গেস্টহাউসের ফোর-বি নম্বর ঘরে। হয়তো সেই ঘরেই ফিল্ম দুটো ফেলে এসেছি। প্রায় দুসপ্তাহ পরে কলকাতা থেকে টেলিফোনে ধিকালায় সেকথা জানিয়ে যখন নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে ওই ছবি আর পাওয়া যাবে না তখনই সেই জঙ্গলজগতের কয়েকটা ছবি আমার মনের মধ্যে ছাপা হয়ে গেল। হারানো মাত্রই তাহলে দুঃখের নয়!

যে রাতটি নৈনিতাল জেলার জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে ছিলাম, তার আগের দু-রাত কেটেছিল হরিদ্বারে, গঙ্গার কোলে— ট্যুরিস্ট বাংলোয়। একদিন পৌরাণিক যুগের গঙ্গার স্রোতে সনাতন ভারতবর্ষ দেখা, আরেকদিন আদিম যুগের অরণ্যে পৃথিবীর অকৃত্রিম স্পর্শ পাওয়া— বেড়াতে এসে এরকম মৌলিক ও গভীর অনুভূতি খুব সুলভ নয়। হরিদ্বার থেকে রামনগর হয়ে জিম করবেট ২২৫ কিলোমিটার। শুধু জিম করবেট যাবার সোজা পথ এটা নয়। তার চেয়ে ট্রেনে রামনগর চলে আসা অনেক সহজ। আমাদের এই ঘুরপথে রামনগর যাবার কারণ আমাদের সফরসূচিতে এক যাত্রায় হরিদ্বার ও জিম করবেট বাঁধা হয়েছে। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, জিম করবেট ঘুরে আমরা ক্রমশ যাব লখনউ, বেনারস, সারনাথ, চুনার, এলাহাবাদ, চিত্রকূট, মাহোবা, ঝাঁসি,

ওরছা, দেওগড়, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি। দিল্লি থেকে ট্যুরিস্ট কোচে পনেরো দিন ধরে অবিরাম ঘুরে বেড়ানো। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলা, শহর, বাজার আর পথিপার্শ্বের গ্রাম দেখতে দেখতে যাওয়া। তাছাড়া এক যাত্রায় এতগুলো, এতরকম বেড়াবার জায়গা— মনকে সব সময় চাঙা করে রাখে। কখনও চমকে দেয়, কখনও রাঙিয়ে যায়।

সফরসূচির মতো সফরকারীরাও কিছু কম বিচিত্র নয়। এক আশ্চর্য যাত্রার আশ্চর্যতর যাত্রীদল! অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন ফিলিপা স্যাক্সটন, জগদ্বিখ্যাত 'লোনলি প্ল্যানেট ইন্ডিয়া'র ভারতবিশেষজ্ঞ লেখিকা, দুমিনিটেই আবিষ্কার করা গেল আমরা দুজন দুজনের পূর্বপরিচিত। কোথায় আলাপ হয়েছিল? ফিলিপা বললেন, সিকিমে। 'স্যাফ্রন রোড' নামে চমৎকার একটি 'ভ্রমণ' পত্রিকারও তিনি সম্পাদক-প্রকাশক, এপর্যন্ত দুটি সংখ্যা বেরিয়েছে।

ব্রিটিশ ভ্রমণসাংবাদিক স্টেফেন ম্যাক্লারেন্স দ্বিতীয় দিনেই আমাদের কাছে অতি ঘনিষ্ঠ 'স্তেফান' হয়ে উঠলেন। এর আগেই ছবার ভারত ঘুরে গেছেন, তার মধ্যে একবার পাঁচ মাস ধরে চলেছিল তাঁর দীর্ঘ ভারত সফর। হাসিখুশি অথচ চিন্তাশীল স্তেফান লন্ডনের 'টাইমস' কাগজের নিয়মিত ভ্রমণলেখক।

রাশিয়ার সেগেঁই স্টোরকান মাদুরাইয়ে কোনার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল পড়েছেন। ফলে আমাদের দলের তামিল ভ্রমণলেখিকা শ্যামলা স্বামীনাথন মাতৃভাষায় তুবড়ি ছুটিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সে তুলনায় কিছুটা স্বল্পবাক আমেরিকার জোনাথান সিসকিন। ভ্রমণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখক, সম্পাদক ও বেতার সাংবাদিক। বর্তমানে বিখ্যাত 'ফোডোরস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রুজ গাইড'-এর লেখক ও 'ট্র্যাভেল এজেন্ট' ও 'আউটবাউন্ড ট্র্যাভেলার' পত্রিকার লেখক-সম্পাদক। এ পর্যন্ত ১২০টি দেশ বেড়িয়েছেন।

ইতালি থেকে এসেছেন দোনাতা পিৎসি আর বারবারা আলোইসিয়ো। দোনাতা ইতিহাসের পণ্ডিত, সাংঘাতিক ফটোগ্রাফার, ইতালির সব বড় কাগজেই তাঁর ছবি ছাপা হয়, কাজাখস্তান বিষয়ক একটা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ে তাঁর কাজাখস্তানের অসামান্য আলোকচিত্র সংকলিত হয়েছে। ভারতে আসবার আগে আরও দুটি বইয়ের ছবি তোলার কাজ শেষ করে এসেছেন। আলজেরিয়া, টিউনিসিয়া ও লিবিয়ায় রোমান প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন আরেকটার বিষয় পূর্ব আফ্রিকার বিশ-তিরিশের দশকের ইতালীয় স্থাপত্য।

দোনাতার বন্ধু বারবারা বিশ্বজোড়া ফটো এজেন্সি ইমেজ ব্যাঙ্কিং-এর রোম অফিসের কর্ত্রী। ভ্রমণচিত্র সম্পাদনা ও পরিবেশনায় সিদ্ধহস্ত।

জার্মানির ফ্রাঙ্ক জর্গ রিখটের, ফিনল্যান্ডের রোনি বর্নানেন, স্পেনের ইসোডোরো মেরিনো মারদোমিঙ্গো, থাইল্যান্ডের চোলাদা তেয়াওসুওয়ান, শ্রীলঙ্কার ধর্মসিরি গামাজে, মায়ানমারের উকিয় জেয়া— নানা দেশ, নানা ভাষার ভ্রমণরসিক এক নৌকোয়। বেনারসে ভোরের গঙ্গায় কথাটা প্রায় আক্ষরিক ফলে গেল। কাশীর আকাশে, গঙ্গাবক্ষে সূর্যোদয় দেখতে বারোজন বিদেশি আর ছজন ভারতীয় ভ্রমণলেখক দুই নৌকোয় ভেসে পড়েছিলাম। ভারতীয় ছজন ছয় রাজ্যের। ছয় ভাষার। গুজরাটের ভোলাভাই প্যাটেল, পাঞ্জাবের মহীন্দর সিং, মহারাষ্ট্রের উষা ধুরন্ধর, তামিলনাডুর শ্যামলা স্বামীনাথন, কর্নাটকের

দেওগড়ের প্রাচীন মূর্তি

কয়েক বছর আগে এই রাস্তায়, খুব কাছে-পিঠেই কোথাও এক তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, যে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিল যে সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ফেল করে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে ও অগত্যা পেটের দায়ে সাধু হয়ে যায়।

ইতালির দোনাভা পিংজির সঙ্গে লেখক

কে এস ভগবান আর পশ্চিমবাংলার এই কলমচি। কাশীতে তিন নৌকোয় এই আঠেরোজন ভ্রমণসাংবাদিক ছাড়াও ছিলেন কাশীর দুজন গাইড আর উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের তিনজন ব্যবস্থাপক। তিন নৌকোয় তেইশজন। বেনারসে তিন নৌকোয়, জিম করবেট অরণ্যে চার হাতিতে, উত্তরপ্রদেশের পথে-পথে এক বাসে নানা ভাষার ভ্রমণলেখকদের একসূত্রে বেঁধে ফেলার কৃতিত্ব কম নয়। ভারতীয় পর্যটন মন্ত্রকের সহায়তায় উত্তরপ্রদেশ পর্যটন বিভাগ এই আন্তর্জাতিক ভ্রমণলেখকদের সম্মেলনের আয়োজন করে ভারতীয় পর্যটনের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ অভিনব ও দূরপ্রসারী উদ্যোগের পথপ্রদর্শক হলেন।

৮ জানুয়ারি বিকেল সাড়ে চারটেয় কলকাতায় যখন তিরিশ সেকেন্ডে অফিসের তিনতলা সিঁড়ি ভেঙে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে দৌড়োচ্ছি তখন কে ভেবেছিল আর মাত্র চারঘণ্টা দূরে আমার এমন ভ্রমণভাগ্য এমন বন্ধুভাগ্য নিয়ে অপেক্ষা করছে সামনের পনেরোটি দিন। দিল্লিতে বিমানবন্দরের বাইরেই মুষ্টিবদ্ধ হাতে ধরা উচ্চশির প্ল্যাকার্ডে সুশ্রী হস্তাক্ষরে লেখা আমার নামটি দেখে নিজের সৌভাগ্য নিয়ে আর কোনও সংশয় রইল না। মুখভরা আপ্যায়নের হাসি আর মাথাভরা অকালের টাক নিয়ে যে ভদ্রলোক হাতখানি তাঁর বাড়িয়ে দিলেন, আগামী পনেরোদিন ধরে তিনিই হবেন আমাদের সিকেসিং, আপাতত উত্তরপ্রদেশ পর্যটন উন্নয়ন করপোরেশনের ম্যানেজার সি কে সিং। প্ল্যাকার্ডবাহী তাঁরই সহকারী, সব কাজে সদা হাজির, আহ্‌মদ।

মনে সন্দেহ ছিল এতবড় পর্যটনযজ্ঞ সম্ভব হবে তো! দ্বিধাও ছিল, অফিসের দৈনন্দিন ফাঁদ কেটে শেষপর্যন্ত আসতে পারব তো! প্রায় একমাস ধরে টেনেরিফ, মাদ্রিদ, জুরিখ, মিউনিখ ঘুরে জুন মাসে ঠিক যেদিন কলকাতায় ফিরেছি সেইদিনই এই নিমন্ত্রণ পেয়ে ধরেই নিয়েছিলাম এবারের এই উত্তরপ্রদেশ আমার অধরাই থেকে যাবে। সেই দ্বিধা কাটল কলকাতায় বিকেল সাড়ে চারটেয়, সন্দেহ ভাঙল দিল্লিতে রাত সাড়ে আটটায়। অতএব মন চলো গঙ্গা যমুনা! চলো মন দেওগড় মাহোবা! চলো রামায়ণ মহাভারত ইতিহাস পুরাণ নিসর্গ নিমন্ত্রণের দেশ উত্তরপ্রদেশ।

আমাকে ও আমার মালবাহী হস্তিশাবকটিকে (২০০০ সালের জানুয়ারির প্রথমার্ধে দিল্লি সহ সমগ্র উত্তরপ্রদেশে যখন কোল্ড ওয়েভে মানুষের মৃত্যুসংবাদও পড়তে হচ্ছে তখন শীতবস্ত্রের সংখ্যা সহজেই অনুমেয়, হস্তিশাবক ছাড়া বইবে কে!) গাড়িতে তুলে নিয়ে আসা হল পশ্চিম দিল্লির বসন্তবিহারে জে পি গ্রুপের হোটেল বসন্ত কন্টিনেন্টাল-এ।

পরদিন সকালে এখান থেকেই শুরু হল উত্তরপ্রদেশ সফর। দিল্লি থেকে হরিদ্বার যাবার পথে ভারতের কৃষিসভ্যতার গরিমাটুকু কারোর চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তার ওপর সবুজ বিপ্লবের ফলে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের এইসব অঞ্চলে প্রচুর গমের খেত, আখখেত, আমবাগান। আমি যতবারই আখ কাটার মরসুমে এপথে গেছি, প্রতিবারই রাস্তার দুধারে আখ জ্বাল দেওয়ার গন্ধে বাতাস দেখেছি ম-ম করে। বরাবরের মতো এবারও এ-পথের সেরা খাবার ও ক্ষণবিরতির জায়গা চিতল-এ মহাসুখে মধ্যাহ্নভোজ সম্পন্ন হল।

ভ্রমণস্মৃতি ভ্রমণের এক বড় সম্পদ। তুচ্ছ কোনও পথস্মৃতিও পুনর্ভ্রমণের আনন্দে ঘৃতাহুতি দেয়। হরিদ্বার পৌঁছে সেই সন্ধ্যায়ই হর-কি-পৌড়ির সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে গঙ্গার আরতি দেখতে দেখতে হর-কি-পৌড়ির কত সন্ধ্যার প্রদীপশিখা আমার মনের মধ্যে নেচে ওঠে, মনে পড়ে যায় এক অন্ধ মায়ের আরতি দর্শন, কিশোর পুত্রের মুখে গঙ্গার জলে প্রদীপশিখার বর্ণনা শুনতে শুনতে মায়ের মুখের আনন্দশিখা এমন স্পষ্ট করে আমার মনের তলায় ধরা ছিল আমি তো এতদিন জানতামই না।

ভক্তরা, দর্শকরা ছোট্ট ছোট্ট ঠোঙায় ফুল ও বাতি ভাসিয়ে দিচ্ছেন জলে, খরস্রোতে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে ওইসব অগ্নিতিলক। আগুনের তিলক না বলে আগুনে-পাখি বা

বাঁদিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার ফিলিপা স্যাক্সটন, আহমেদাবাদের ভোলাভাই প্যাটেল, ফিনল্যান্ডের রোনি বর্নানেন

আগুনে-পতঙ্গ বললেই ঠিক হয়, স্রোতের ফাঁদে পা আটকে গিয়ে আকাশে উড়ে যেতে পারছে না। ওপারে দীর্ঘকায় পূজারীদের হাতে ধুনুচিতে মশালতুল্য আগুন। সন্ধ্যার আকাশে যেন এক সমবেত অগ্নিনৃত্য, জলের মধ্যে তার ভাঙা-কাঁপা প্রতিবিম্ব। কেন জানি না বিদ্যাহীন, বুদ্ধিহীন, ঈশ্বরহীন আমার মন এই দৃশ্যে এবার এমন করে ভরে উঠল। এই সেই হরিদ্বার, এই সেই হর-কি-পৌড়ি, এখানে ১৯৮৬ সালে আমি পূর্ণকুম্ভে গঙ্গার বরফজলে শুধু ডুব নয়, সাঁতারও দিয়েছিলাম। সেবছর পুণ্যস্নানে এসে বহু পুণ্যার্থীকে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়। আমি ডুব দিয়ে ওঠার অল্প পরেই সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে, যদিও সে খবর আমরা প্রথম শুনি পরদিন দুপুরে, উত্তরকাশী পৌঁছে।

প্রথম দেখায় হরিদ্বার আমার মোটেই ভালো লাগেনি। তার পরের বারও অপছন্দের রেশ যেন কাটতেই চায় না। এরপর, একটু একটু করে হরিদ্বারকে আমি চিনতে পারলাম। ক্রমে এমন হল যে আমি হয়ে উঠলাম হরিদ্বারের ভক্ত পর্যটক। আজকালকার ধর্মের অর্থে নয়, প্রাচীন ভারতকে এখনও এখানে যেন হঠাৎই দেখতে পাই, সেই আকর্ষণে। আমার শ্বশ্রূমাতামহী শুনেছি স্বামী-সংসারের ওপর রাগ করে হঠাৎই হরিদ্বারে চলে যেতেন, সেখান থেকে কখনও কেদার-বদ্রী, কখনও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। তাঁর মোটা গরম কাপড়ের শায়ায় পকেট ছিল, সেখানে কিছু টাকা ফেলে বেরিয়ে পড়তেন। বছরে কয়েকবার, সারা জীবনে বহুবার এভাবে তাঁর হরিদ্বার যাত্রা ঘটেছে। আমার বিলম্বিত হরিদ্বার মোহের মূলে আমার দিদিশাশুড়ির নাতনিটির অবদানও আমাকে স্বীকার করতে হয়।

'ভ্রমণ' পত্রিকার পাঠক শুনলে নিশ্চয়ই অবিশ্বাস করবেন যে আমি এখন শুধু হরিদ্বারের জন্যই হরিদ্বার যেতে পারি। আগেকার মতো কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী কি চাম্বা-ধনৌলটি যাবার পথে বাধ্যতামূলক বুড়ি ছুঁয়ে যাওয়া নয়।

রাতে হরিদ্বারের হোটেল-রেস্তোরাঁ সমিতির ডিনারে প্রথমে চোখে পড়ে হরিদ্বারের আধুনিক হোটেলের জাঁকজমক। আমি বরাবরই গঙ্গার কোলে সরকারি ট্যুরিস্ট বাংলোয় উঠি বলে হরিদ্বারে এরকম ঝকঝকে হোটেলের খোঁজ রাখি না। সে যাই হোক, নৈশভোজের আসরে মুগ্ধ হয়েছি হরিদ্বারের জেলাশাসকের অতি সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা শুনে। এই পুরাণভূমির অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে তাঁর গঙ্গাজলের মতো স্বচ্ছ ধারণা হরিদ্বার ভ্রমণে বিদেশি ভ্রমণসাংবাদিকদের তো বটেই, দক্ষিণ পশ্চিম ও পূর্ব ভারতীয় ভ্রমণলেখকদেরও সাহায্য করবে। এমন সুন্দরী জেলাশাসকও আমি কখনও দেখিনি।

বাঁদিক থেকে শ্রীলঙ্কার ধর্মসিরি গামাজে, অস্ট্রেলিয়ার ফিলিপা স্যাক্সটন, মায়ানমারের উকিয় জেয়া, তামিলনাড়ুর শ্যামলা স্বামীনাথন

হরিদ্বারে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের উদ্যোগে কয়েক বছর যাবৎ বার্ষিক যোগ উৎসব তো চলছেই, এবার যোগ হচ্ছে আয়ুর্বেদিক উৎসব। যোগ উৎসবের দিন পড়ে, যতদূর মনে পড়ছে, ফেব্রুয়ারির প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে, আয়ুর্বেদিক উৎসব বোধহয় ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে। আমার বিবেচনায় একটা উৎসবের ঠিক পরই আরেকটা উৎসব শুরু হওয়া উচিত, কেউ কেউ তাহলে দুটোতেই সামিল হতে পারবেন। উৎসবের সময় নিয়ে আমার মত জানতে চেয়েছিলেন জেলাশাসক, এ হল গিয়ে তাঁরই প্রশ্নের উত্তর, যদিও হরিদ্বারের পর্যটন সম্ভাবনা নিয়ে তাঁর নিজের বিশ্বাস ও বিশ্লেষণ অতিশয় গভীর।

এবার উত্তরপ্রদেশে ঘুরতে ঘুরতে আরেকজন জেলাশাসকের পর্যটন মগ্নতাও আমাকে বিস্মিত করেছে। চিত্রকূটের উদ্যমী পরিশ্রমী জেলাশাসকের কথা বলছি। চিত্রকূটে আমাদের পৌঁছতে বেশ সন্ধে হয়েছিল, পরদিন সকালে চিত্রকূট দর্শনের মাঝখানেই জেলাশাসকমশাই চিত্রকূটের যাবতীয় দ্রষ্টব্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে তথ্যাদি লিখে আঠেরো কপি জেরক্স করে আঠেরোজন ভ্রমণসাংবাদিকের হাতে তুলে দিলেন। শুধু এযাত্রার উত্তরপ্রদেশেই নয়, বছরের নানা সময়ে নানা রাজ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমার আজকাল খুব মনে হয়, পর্যটনের স্বার্থে, পর্যটন উন্নয়নের প্রয়োজনে, নতুন নতুন পর্যটন কল্পনার রূপায়ণে পর্যটন দপ্তরের হাতে হাত মিলিয়ে রাজ্যের প্রশাসন ও বিশেষ করে জেলা কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আসা দরকার।

ইতালির বারবারা আলোইসিয়ো

গঙ্গাদীক্ষিত হরিদ্বার, হিমালয়ের প্রবেশদ্বার হরিদ্বার, আমার পর্যটকজীবনের অসংখ্য আনন্দস্মৃতিময় হরিদ্বার, খর্ব ক্ষুণ্ণ মনের আঁধার ধুয়ে দেওয়া হরিদ্বার— সেই হরিদ্বারের কথা কি এক মুখে বলে শেষ করা যায়?

কিন্তু হরিদ্বারের ভবিষ্যতের কথা কে বলবে? বিশেষ করে যখন সারা ভারত জুড়ে রাজনীতির ক্রমক্ষীয়মাণ মানবিকতা ও দ্রুত বর্ধমান দুর্বৃত্তায়ন পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। হরিদ্বারের গঙ্গার স্বচ্ছ স্রোত এই দূষণ থেকে কত দিন মুক্ত থাকবে? আমার সমস্ত মন চায়— যেন চিরকাল থাকে!

আরতি দেখে ফেরার পথে সারি সারি খাবারের দোকানের সামনে প্রায়-উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ সাধুদের ভিড়, এর মধ্যে নিছক ভিখিরিও

আমার কাশি শুনে সে বেশ হাত নেড়ে নেড়ে যোগ করল— আদ্রক, এলাইচ, মধু দিয়ে ফোটানো গরম দুধ এক গ্লাস খেলে তোমার এই পিঁপড়ের কাশি এক মিনিটে সেরে যাবে! পিঁপড়ের কাশি! ভাষা শিক্ষার আসল পাঠশালা রাস্তার চলমান জীবন!

হয়তো আছে। দুটি সারিতে দেখলাম সাধুদের খাবার বিলোনো হচ্ছে। এক যুবক আমার কাছে এসে বললেন যে আমি যদি মাত্র একশো টাকা দিই তাহলে তা দিয়ে আমার নামে পঁচিশজন সাধুর ভোজনের ব্যবস্থা করে দেবেন। ছেলেটিকে নিচুস্বরে কথা বলতে দেখে লন্ডনের স্তেফান জানতে চাইলেন— ছেলেটি কী বলছে? মর্মার্থ শুনে স্তেফানের ধন্দ কাটে না। একশো টাকা মানে কত পাউন্ড? দু-পাউন্ডও নয়? তা দিয়ে পঁচিশজনের ডিনার? ডিনার মানে শুধু পুরি-হালুয়া শুনেও তার বিস্ময় কাটেনি।

পরদিন সকালে হরিদ্বারের 'ঋষি এলাকা'য় সবাই যখন আধুনিক ভারতমাতা মন্দির দেখছেন আমি হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে ওপরে একটা বাঁধানো রাস্তায় উঠে পড়ি। কয়েক বছর আগে এই রাস্তায়, খুব কাছে-পিঠেই কোথাও, এক তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, যে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছিল যে সেকেন্ডারি পরীক্ষায় ফেল করে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে ও অগত্যা পেটের দায়ে সাধু হয়ে যায়।

ভারতমাতা মন্দিরে ফিরে সেখান থেকে সদলে চলে যাই শান্তিকুঞ্জে। শান্তিকুঞ্জ এক কথায় একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ। নিষ্ঠাবান ভক্ত কর্মী ঘুরে-ঘুরে আমাদের সব দেখালেন। তারপর মেঝেয় আসন পেতে বসে পংক্তি ভোজন। আহার্য আর আন্তরিকতা —দুইই সরল ও স্নিগ্ধ। আশ্রমের মাতাজি বললেন, এ আপনাদের নিজের বাড়ি। যখন খুশি চলে আসবেন। পথে আপনাদের কোনও কষ্ট হয়নি তো? আপনারা সপরিবারে আসেননি কেন?

ভ্রমণসাংবাদিকরা কেউ কিছু বলবার আগেই উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের আঞ্চলিক অধিকর্তা বিমলেশ কুমার সসংকোচে জানালেন, সরকারি পর্যটন দপ্তর থেকে সবাইকে একজন করেই নেমন্তন্ন করা হয়েছিল।

মাতাজির উত্তর— বেসরকারি আশ্রমে আপনারা সবাই কিন্তু সপরিবারে আসবেন। পরিবেশের শান্তি আর আমন্ত্রণের আন্তরিকতায় অনেকেই আমরা বলাবলি করলাম, এখানে এসে কয়েকটা দিন থাকতেই হবে। প্রমিস? প্রমিস!

তামিলনাড়ুর শ্যামা মহারাষ্ট্রের ধুরন্ধরকে নাকি কর্নাটকের ভগবানকে মৃদুস্বরে বললেন, আমি হয়তো কখনও এখানে এসে অনেকদিন থাকব!

হরিদ্বার ছাড়লাম পরদিন সকাল সাতটায়। গন্তব্য জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক। শ-দেড়েক কিলোমিটার যাবার পর যক্ষপুর নামে একটি জায়গায় ক্ষণেক বিরতি। আমি বাস থেকে নেমে কাছেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। একদল স্থানীয় ছেলে মহা কৌতূহলে কাচবন্ধ কোচের যাত্রীদের দেখবার চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যে একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে আমার প্রায় গা ঘেঁসে এসে বেশ উদ্ভাসিত মুখে জিজ্ঞেস করল, বাসমে আংরেজ ভি রাখা হ্যায়!

ভারতের গ্রাম-গঞ্জের লোকের কাছে এখনও ইউরোপের সব দেশের মানুষই ইংরেজ। যাকে দেখে কথাটা বলল, চেয়ে দেখি সে ইতালির মেয়ে বারবারা আলোইসিয়ো।

ছেলেটির নাম হরেন্দ্র সিং। আমার একটু গরম পানীয় জল দরকার শুনে সে সোৎসাহে বলল, রাস্তা পেরিয়ে খানিক বাঁয়ে গেলেই আমার বাড়ি, আমার সঙ্গে এসো, জল তো মিলবেই, গরম দুধ ভি পিলায়গা। আমার কাশি শুনে সে বেশ হাত নেড়ে নেড়ে যোগ করল— আদ্রক, এলাইচ, মধু দিয়ে ফোটানো গরম দুধ এক গ্লাস খেলে তোমার এই পিঁপড়ের কাশি এক মিনিটে সেরে যাবে!

পিঁপড়ের কাশি! ভাষা শিক্ষার আসল পাঠশালা রাস্তার চলমান জীবন!

একবার ভারতের লোকনৃত্যের সন্ধানে বেরিয়ে আসামের শিলচরের এক গ্রামে জারিনাচ উঠে গেল কেন জিজ্ঞেস করায় এক বৃদ্ধ চাষী আমাকে বলেছিলেন— আর কোনও কারণ নাই, খালি অভাবের বাতাস!

অভাবের বাতাস! ভাষার প্রকাশক্ষমতা আর কাকে বলে!

এরপর জানলার পাশে বসা ফিনল্যান্ডের 'ন্যাশনাল রোড ডিরেকশন' মাসিক পত্রের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সম্পাদক রোনি বর্নানেনকে দেখিয়ে হরেন্দ্র সুনিশ্চিত স্বরে বলল, মাদার টেরেসার দেশের লোক, তাই না?

পথিপার্শ্বের আতিথেয়তার কথায় যক্ষপুরের হরেন্দ্র সিংয়ের গরম দুধের নিমন্ত্রণের মতো হংসরামপুরের চায়ের নিমন্ত্রণের কথাটাও বলতে হয়। যক্ষপুর পেয়েছি রামনগর যাবার পথে, হংসরামপুর পড়ল পরদিন, রামনগর থেকে লখনউ যাবার রাস্তায়। জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কে সফর শেষ করে ধিকালা থেকে রামনগর হয়ে লখনউ যাব, রামনগর থেকে লখনউ ২২০ কিলোমিটার, মাঝখানে বেরিলিতে মধ্যাহ্নভোজ সারার কথা।

তার অনেক আগে অজানা এক গ্রামের ধারে বাস থামাতে হল, কিছু মেরামতি করতে হবে। ততক্ষণ বাসের মধ্যে বসে থাকার চেয়ে গ্রামের মধ্যে ঘুরে আসাই ভালো। বেলা দুটোতেও দেখলাম জলভরা মেঘে আকাশ কালো হয়ে আছে।

পিচরাস্তা ছেড়ে মেটেপথ ধরে সামান্য এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, সামনেই বাড়ির উঠোনে ছোট ছোট ছটি ছেলে ক্রিকেট খেলছে। কনিষ্ঠটির বয়স মনে হল ছয় কি সাত, জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়তো তেরোয় পা দিয়েছে। মাঝের দুজন মনে হয় যমজ। উঠোনের ওপারে একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে বোধহয় ছয়পুত্রের জননী, রান্নায় ব্যস্ত।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছি, ব্যাট মোটে একটাই, ফলে রান নেবার সময় ব্যাটসম্যান বলটা মেরেই ব্যাট ক্রিজে নামিয়ে রেখে দৌড় লাগায়, ওপ্রান্তের ব্যাটসম্যান ক্রিজে পৌঁছে মাটি থেকে ব্যাট তুলে তার খেলা শুরু করে, অথবা দ্বিতীয় রানের সম্ভাবনা থাকলে ব্যাট ফেলে রেখেই আবার দৌড় লাগায়।

হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ব্যাটসম্যান ব্যাটটি নিয়েই আমার কাছে এসে আমাকে তাদের বাড়িতে ঢুকে বসতে বলল, জানাল এক্ষুনি সে আমার জন্য এক গ্লাস জল নিয়ে আসছে। তারপর আমি কী খেতে চাই?

খাবারে আমার অনিচ্ছা দেখে তার অকপট প্রশ্ন— তাহলে কী দিয়ে সে মেহ্‌মানের সেবা করবে?

দূরে বড় রাস্তায় বাসটা দেখিয়ে বললাম, মেরামত শেষ হলেই আমাকে দৌড়তে হবে, অতএব খুব চটপট এককাপ আদা-চা পেলে সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

এদের অনায়াস আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে আমার আদা-চায়ের আবদারটি খুব যথার্থই হয়েছিল, কেননা আমাদের ট্যুরিস্ট কোচে আমার জানলার কাচ পুরো বন্ধ না হওয়ায় বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় আমার গলার দফারফা।

ছেলেটি দূরের বাসের দিকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, কতজন আছে? অর্থাৎ তত কাপ চা বানাবে। ইতিমধ্যে রান্নাঘর থেকে তার মাও বেরিয়ে এসেছে, বিশ-বাইশজনের চা

বানাতে হবে জেনে নিয়ে ভারি নিশ্চিন্ত হয়ে রান্নাঘরে ফিরে গেল। ছেলেটিও আবার ফ্রিজে।

হঠাৎ বাসের হর্ন শুনে আমি উলটো পথে হাঁটতে শুরু করেছি দেখে ছেলেটি দৌড়ে এল, আমার সঙ্গেই বাসের দিকে দ্রুত পায়ে এগোতে এগোতে বলল, সে ড্রাইভারকে আর দশ-পনেরো মিনিট বাস থামিয়ে রাখার অনুরোধ জানাতে যাচ্ছে, ড্রাইভারসাবকেও তো চা খেতে হবে।

গ্রামটির নাম হংসরামপুর। ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এখন ভাবি, ওরকম আতিথেয়তা আজকাল আর ভারতের শহরে দেখা যায় না। অথচ এই হল চিরকালের ভারতবর্ষ।

এযাত্রায় দুসপ্তাহ ধরে উত্তরপ্রদেশের নানা জায়গায় বেড়াতে বেড়াতে ভারতবর্ষের এরকম নানা মুখ আমার দেখা হল।

মারাঠী উষা আর তামিল শ্যামা দিল্লি থেকেই একেবারে সামনের সিটে, পাদানির পাশেই। তাতে কারও কোনও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু গোল বাধল জার্মানির রিখটেরের লম্বা হাঁটু নিয়ে। আমার বাঁদিকে বেচারা কাৎ কুপোকাৎ ত্রিভঙ্গ চারভঙ্গ হয়েও জুৎ করতে পারছেন না দেখে আমি উষা-শ্যামার দ্বারস্থ হই— ওঁদের আসনের সামনে পা ছড়াবার জায়গা অনেকটা বেশি।

এবার রিখটের গেলেন সামনে, ভারি আরামেই বসলেন, তাঁর পাশে উঠে এলেন মাদার টেরেসার দেশের মহিলা। রোনি জার্মানি জানেন, ফলে এই বিদেশ-বিভুঁই দুজনে অনর্গল কথা বলেও সুখী হলেন। এদিকে আমার বাঁ কানে অবিরাম ঝরতে লাগল মারাঠী আর তামিল উচ্চারণে ইংরিজি ভাষার সম্পূর্ণ পৃথক দুটি শব্দলহরী।

দু-তিন দিনের মধ্যেই স্পেনের ছেলে আর থাইল্যান্ডের মেয়ে কিছুটা পিছনের দিকে এক আসনে বাঁধা পড়ল। আমার সামনে শ্রীলঙ্কা, পিছনে ডানদিকে মায়ানমার। শ্রীলঙ্কার ধর্মসিরি গামাজ সিংহলী দৈনিকের রবিবাসরীয় সম্পাদক, চল্লিশ বছর ধরে লিখছেন ভ্রমণকথা, এপর্যন্ত তাঁর বারোটি ভ্রমণকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। মায়ানমারের উকিয় জেয়া দেশের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের প্রধান সম্পাদক।

প্রথম আলাপে মায়ানমার শুনেই 'সুকি কেমন আছেন? ওঁকে কি এখনও দেশের কারও সঙ্গেও কথা বলতে দেওয়া হয় না' বলতে বলতে আমি হৃদয়ের সর্ব ব্যাকুলতা উজাড় করে দিই। ইংরিজি সামান্য দ্রুত বললেই উকিয় জেয়ার বুঝতে অসুবিধা হয়, ফলে আমার তীরগতি প্রশ্ন ধীর স্বভাব, অতি ভদ্র, প্রায় মাটির মানুষ উকিয়র মর্মে ঢোকেনি। আমিও পর মুহূর্তে তাঁর পদপরিচয় পেয়ে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করিনি। ভেবে অবাক হই, মাত্র দুদিনেই জেয়া আমার গভীর বন্ধু হয়ে গেলেন। রোজই, আমি বাসে ওঠা মাত্রই তিনি হাত বাড়িয়ে আমার হাত ব্যাগটি নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিতেন, যাতে আমার সিটে আমি বসবার বেশি জায়গা পাই। আমাদের মধ্যে পাকা কথা হয়ে গেল— সফর শেষে জেয়া আমার সঙ্গে কলকাতায় ফিরবেন, আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবেন ও দুদিন আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। তার ইয়াঙ্গন যাবার প্লেনও দুদিন পরেই।

জেয়া মাঝেমাঝেই জানতে চান আমি কবে যাব তাঁর দেশে? আমার জন্য মায়ানমারের অবারিত দ্বার। মায়ানমার পর্যটন দপ্তরের সুচিত্রিত সুমুদ্রিত তথ্যপুস্তিকা দিয়ে আমাকে বললেন, আসবেন কিন্তু, কম করে এক সপ্তাহ থাকতে হবে।

এমনও কথা হল, ২৪ জানুয়ারি আমরা রাতের ফ্লাইটে কলকাতা পৌঁছব, তার পরদিন ধর্মসিরিও আমাদের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে ডিনারে মিলিত হবেন। তিনি চেন্নাই থেকে দেশের বিমান ধরবার আগে কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটিতে দুদিন থাকবেন।

হায়, যা ভাবি তার বহুগুণ বিপরীত ঘটনাও ঘটে! ২১ জানুয়ারি আগ্রায় পৌঁছে হোটেলে মধ্যাহ্নভোজের সময় জেয়া মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। পুরো দলেরই জোর বরাত, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। পর্যটন বিভাগের কর্মীদের এই তৎপরতায় সকলেই মুগ্ধ। চিকিৎসা হল প্রথমে ওখানকারই হাসপাতালে, পরে দিল্লিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে। আগ্রায় ইউ পি ট্যুরিজম-এর জয়েন্ট ডিরেক্টর ডি কে বর্মণ বহুকাল আগে প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ সামলেছেন, সেই আপৎকালীন অভিজ্ঞতায় তিনি মায়ানমারের জেয়াকে অতি দ্রুত আগ্রা থেকে দিল্লিতে আরোগ্যযাত্রায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। অ্যাম্বুলেন্সে জেয়ার সঙ্গী ছিলেন মধুর স্বভাব তরুণ অফিসার বিমলেশ কুমার। মায়ানমারের দূতাবাস থেকেও শুনলাম সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

জেয়ার ফাঁকা আসনটি আমার বুকে পাষাণ হয়ে চেপে বসে। পরে সেখানে উঠে আসেন শ্রীলঙ্কার ধর্মসিরি। ইতিমধ্যে মিউনিখের রিখটের পেটের অসুখে দলছুট, তাঁর শূন্য আসন দখল করেন শ্যামার আসনসঙ্গী ধুরন্ধর।

এদিকে বারবার সিকেসিং আর আহ্মদের বাহুবলপ্রয়োগে বন্ধ-করা আমার জানলার কাচ বাসের ঝাঁকুনিতে বারবারই সরে যায়। সূচ্যগ্র পরিমাণ ফাঁক হলেই বাইরের ঠান্ডা হাওয়া মুখে সুচ ফোটায়, ফলে আমি মুগ্ধ নয়নে বাইরের

গলা দিয়ে কিছুটা দ্রুত ও তীক্ষ্ম সুরেলা আওয়াজ করতেই দূর-দূর গাছের ডালপালায় শব্দ ও নাড়াচাড়া জাগল, দুয়েকটা হনুমানের লম্ফঝম্পের শব্দ ক্রমশই স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আওয়াজ যতই বাড়তে লাগল, হনুমানের সংখ্যাও ততই বাড়ে। ক্রমশ তারা দূরের গাছপালা থেকে লাফিয়ে আশপাশের সব গাছ ভরে ফেলল! লোকটা তখনও মুখ দিয়ে আওয়াজ করে চলেছে। সেইসঙ্গে ছোলাভাজা ছড়িয়ে দিচ্ছে। খাবার দেখে দলে দলে হনুমান গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটাকে ঘিরে ধরল। রামায়ণ ছাড়া একসঙ্গে এত বানর আর দেখিনি। নরের সঙ্গে বানরের এরকম সদ্ভাব তথা ঘনিষ্ঠতা দেখে আমার বড় আহ্লাদ হল। আমি পাশে বসা ডি এম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি ওই হনুমানদের কাছে যেতে পারি?

বানরপরিবৃত লেখকের স্কেচ এঁকেছেন বারবারা আলোইসিয়ো

নিজের জায়গায় উঠে এলাম। ফিলিপা বললেন, তুমি তো বেশ জন্তুজানোয়ার ভালোবাসো! আমিও তাই। তবে মাঙ্কিম্যান বিশ্বাস করার দরকার কী? তোমার সাহসের অবশ্য তারিফ করতে হবে। তোমার ওই ছবি আমি কিন্তু টাইম ম্যাগাজিনে বিক্রি করব, দুটো তুলেছি, একটা নিশ্চয়ই তোমাকে পাঠাব।

পৃথিবীর পানে তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারি কাচ সরতে শুরু করেছে। দশ-পনেরো মিনিটেই সুচপরিমাণ ফাঁক লাঙলের ফলা হয়ে আমার এই দেহজমিন চষে ফেলতে চায়। দেখে দৌড়ে আসেন সিকেসিং বা তাঁর সাগরেদ। ফল সেই একই। কিছুক্ষণ কাচ পুরোপুরি সাঁটা থাকে, তারপর আবার প্রথমে সুচ হয়ে, পরে ফাল হয়ে ঢুকতে থাকে জানুয়ারির হাড়ভাঙা ঠান্ডা হাওয়া।

আমার দুর্দশা দেখে দয়া করে আমাকে ডেকে নেন শ্যামা। পরে যতবারই বাসে উঠি, দেখি নিজে অল্প জায়গা নিয়ে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে রেখেছেন আমার জন্য। নিঃস্বার্থ দয়া সর্বত্রই সুন্দর, ভ্রমণপথে সুখেরও।

লখনউয়ে বেশ কয়েকবার গেছি, বিখ্যাত যা কিছু সব দেখেছি, একবার সাহিত্যের নিমন্ত্রণে গিয়ে প্রাচীন গলির মধ্যে প্রায় সমান প্রাচীন বড়ে মিঞার দোকান খুঁজে আমি ও আমাদের জ্ঞানপীঠ-পুরস্কৃত প্রবাদপ্রতিম কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই বংশানুক্রমিক রন্ধনশিল্পীর হাতের শামি কবাব খেয়ে তার স্বাদে-গন্ধে মাতোয়ারা হয়েছিলাম।

লখনউয়ে এবারকার নতুনত্ব বলতে বিশ্বের ভ্রমণসাহিত্য নিয়ে একটি সেমিনার। লখনউয়ের গর্ব করার মতো হোটেল তাজমহলে কয়েক ঘণ্টা ধরে পর্যটনের নানা মুনি নানা মত দিলেন, তার অধিকাংশই অকিঞ্চিৎকর। বক্তানির্বাচনও লক্ষ্যহীন, উদ্দেশ্যহীন, অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন—একসঙ্গে এতগুলো ভ্রমণসাংবাদিককে যখন পাওয়া গেছে তখন ভ্রমণ নিয়ে ঠিক কীরকম লিখতে হয় সেবিষয়ে যাহোক কিছু উপদেশ তো না দিলেই নয়! তার ওপর আরেক যন্ত্রণা, ট্র্যাভেল লিটারেচার বলতে কেউ বুঝলেন গাইড বুক, কেউ বোঝালেন ফা-হিয়েন হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকাহিনী, কেউ বা আগাগোড়াই ধরে নিলেন সরকারি পর্যটন দপ্তরের তথ্যপুস্তিকা। এইসব দোষ-দুর্বলতা থেকে শ্রোতাদের উদ্ধার করলেন উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের মহাপরিচালক রবীন্দ্র সিং। পর্যটনের রত্নরাজ্য উত্তরপ্রদেশ নিয়ে তাঁর ভাবনা-ধারণা স্বপ্ন-বিশ্বাস এই রাজ্যের পর্যটন সম্পর্কে আমাকে লুব্ধ করে তুলল। ধীরস্বভাব এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলেও সুখ, শিক্ষা এঁকে সুগভীর স্থিরতা দিয়েছে।

সেমিনারে একটা দশ-বিন্দু ঘোষণাপত্র জারি করা হল, যদিও তার ওজন বা মূল্য বোঝা গেল না। তবে স্কুল-কলেজে ভ্রমণসাহিত্য ও সাংবাদিকতা পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবির প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রইল। 'ভ্রমণ' পত্রিকায় 'সম্পাদকের কথা'য় আমি আগেই এই দাবি পেশ করেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে রেডক্রশকর্মীদের মতো উপদ্রুত রাজ্যে পর্যটকদেরও অবধ্য ও অনাক্রমণীয় বিবেচনা করার দাবিও 'ভ্রমণ' জানিয়ে আসছে। কিন্তু সম্পাদকের কথায় কোথাও কি চিঁড়ে ভেজে? ভ্রমণসাহিত্যের সেমিনারে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কপিল কুমার যেমন অভিযোগ করলেন, ভ্রমণলেখকরা কাঠমান্ডুতে ভারতীয় বিমান হাইজাকের নিন্দা করলেন না কেন? সাংবাদিক পাঠক প্রশাসকরা কী দোষ করলেন যে তাঁদের হাত থেকে এই গুরু দায়িত্ব সামান্য ভ্রমণলেখককেই কেড়ে নিতে হবে! নানা ভাষার ভ্রমণলেখকরা কি কোনও রাষ্ট্রশক্তি, না কি কোনও আন্তর্জাতিক সংঘ যে তাঁরা নিন্দনীয় কাজের নিন্দা করলেই অপরাধীরা লজ্জায় মুখ ঢাকবে?

চিত্রকূটে এর আগে আমি দুবার গেছি। বছর পনেরো আগে আমার সেই মুগ্ধচিত্ত ভ্রমণের কথা খবরের কাগজে কয়েক সপ্তাহ ধরে বিস্তারিত লিখেছি। চিত্রকূট ভ্রমণের অভিঘাত আমার মনে এতটাই বদ্ধমূল যে কয়েক বছর আগেও 'আমার বনবাস' নামে আমার একটি ছোটদের বইয়ে চিত্রকূট তার পাহাড় জঙ্গল মন্দির রামায়ণ স্মৃতি নিয়ে ফুটে উঠেছিল।

চিত্রকূট দর্শন খুব সকালে শুরু করাই নিয়ম। আমরাও সকাল-সকাল বেরিয়ে গুহার মধ্যে গুপ্ত গোদাবরী দর্শন করি। গুহার বাইরে মলিন ও স্বল্পবাস একটি লোক, হয়তো এই গুহার আবাসিক পাহারাদার, দুলে দুলে তুলসীদাসের

রামায়ণ পড়ছে। চিত্রকূটে আমার সবসময়ই মনে হয় আমি যেন রামায়ণের পুথির মধ্যে ঢুকে পড়েছি —মহাকবির শ্লোকে, মানুষের বিশ্বাসে এমনই জীবন্ত এখানকার প্রাচীনতা! চিত্রকূট ঘুরে, চিত্রকূট উৎসব দেখে আবার পথে নামব, অর্থাৎ কোচে চড়ব, যাব মাহোবা, হঠাৎই জেলাশাসক মশাই আমাকে তাঁর অ্যাম্বাসাডারে ঢুকিয়ে দিয়ে আরও কয়েকজনকে গাড়িতে উঠিয়ে বললেন— আমার কালেক্টরেটে একজন কেরানি আছে, তিনি মাঙ্কিম্যান, হনুমানের সঙ্গে কথা বলেন, আপনারা একবার দেখে যাবেন না? আমার ড্রাইভার আপনাদের নিয়ে যাবে, আমি আপনাদের কোচে এক্ষুনি সেখানে পৌঁছে যাব।

ঝাঁক ঝাঁক কাকের মতো কালো কোটধারী উকিলবাবুদের জটলা দেখেই বোঝা যায় কালেক্টরেট বা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি পৌঁছে গেছি। ম্যাজিস্ট্রেটমশাই আগেই এসে গেছেন, মনে হল তাঁর গর্বের মাঙ্কিম্যানকেও তিনি ইতিমধ্যেই ডেকে পাঠিয়েছেন।

ঘোর কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ, শ্মশ্রুগুম্ফময় মুখমণ্ডল, অশ্বলেজতুল্য কেশ বিন্যাস —এই তিন বৈশিষ্ট্যে কেরানিবাবুকে দেখে অস্বাভাবিক বা অলৌকিক গুণান্বিত বলেই বিশ্বাস জন্মায়। গলা দিয়ে কিছুটা দ্রুত ও তীক্ষ্ণ সুরেলা আওয়াজ করতেই দূর-দূর গাছের ডালপালায় শব্দ ও নাড়াচাড়া জাগল, দুয়েকটা হনুমানের লম্ফঝম্পের শব্দ ক্রমশই স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আওয়াজ যতই বাড়তে লাগল, হনুমানের সংখ্যাও ততই বাড়ে। ক্রমশ তারা দূরের গাছপালা থেকে লাফিয়ে আশপাশের সব গাছ ভরে ফেলল! লোকটা তখনও মুখ দিয়ে আওয়াজ করে চলেছে। সেইসঙ্গে ছোলাভাজা ছড়িয়ে দিচ্ছে। খাবার দেখে দলে দলে হনুমান গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটাকে ঘিরে ধরল। রামায়ণ ছাড়া একসঙ্গে এত বানর আর দেখিনি। নরের সঙ্গে বানরের এরকম সদ্ভাব তথা ঘনিষ্ঠতা দেখে আমার বড় আহ্লাদ হল। আমি পাশে বসা ডি এম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি ওই হনুমানদের কাছে যেতে পারি? তিনি এক মুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে থেকে বোধহয় দয়াপরবশ সম্মতি জানালেন। আমি পরমানন্দে তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম। তারাও আমাকে বোধহয় আপনজন হিসেবে কাছে টেনে নিল। আমার কোলে কাঁধে পিঠে সামনে পিছনে যতদূর চোখ যায় সর্বত্র বানরসেনা, আমিও কেরানিবাবুর কাছ থেকে নিয়ে যাকে যতটা পারছি ছোলা দিচ্ছি, বানরদলের কেড়ে খাওয়া অভ্যাস, তারা এক হাতে আমার হাত চেপে ধরে আরেক হাতে আমার মুঠো খুলে ছোলা লুটে নিচ্ছে। কেউ কেউ আমার কাঁধে বাহুতে উরুতে ধাক্কা দিয়ে আমাকে ঠেলে সরিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করছে, এদের গায়ের জোর বেশ ভালোমতোই জানান দিচ্ছে।

মধ্যাহ্নভোজের পর বানরদলকে কেরানিবাবু যে যার বৃক্ষবাসে ফিরে যাবার আদেশ দিলেন, তারাও একে একে নিমন্ত্রণপ্রাঙ্গণ খালি করে ফিরে গেল।

আমিও নিজের জায়গায় উঠে এলাম। শ্যামা তখনও দুহাতে চোখ বুজে আছেন! ফিলিপা বললেন, তুমি তো বেশ জন্তুজানোয়ার ভালোবাসো! আমিও তাই। তবে মাঙ্কিম্যান বিশ্বাস করার দরকার কী? নিয়মিত খাবার নিয়ে চেনা স্বরে ডাকলে মাঙ্কিরা তো আসবেই, হরিদ্বারে বেনারসে যেমন অনেকেই ভোরবেলা পায়রাদের দানা দেয়। তোমার সাহসের অবশ্য তারিফ করতে হবে। তোমার ওই ছবি আমি কিন্তু টাইম ম্যাগাজিনে বিক্রি করব, দুটো তুলেছি, একটা নিশ্চয়ই তোমাকে পাঠাব।

বানরসেনার এই সমবেত লম্ফঝম্প এতটাই আচমকা ও রোমাঞ্চকর হয়েছিল যে সকলেই কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা কৌতূহলে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই একটি ক্ষেত্রে পাতিয়ালার ক্যাপ্টেন ডাক্তার (অবসরপ্রাপ্ত) মহীন্দর সিং‌ও কোনও ভাষণ দেবার সুযোগ পাননি। এই চমৎকার মিশুকে পাঞ্জাবি সাংবাদিকটি যে কোনও মধ্যাহ্ন বা নৈশভোজের আসরে বা আর কোনও অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদলের পক্ষ থেকে কিছু বলতে আহূত হন। আহূত না হলে অনেক সময় অনাহূতও ভাষণ দেন। পরিষ্কার, ভরাট গলা, বলেনও চমৎকার।

ঝাঁসিতে এক সন্ধ্যায়, এক অবিস্মরণীয় বুন্দেলখণ্ডী লোকনৃত্যের আসরে এক অসামান্য প্রতিভাময়ী, মনে হয় যেন স্বভাবশিল্পী তরুণীর নাচ দেখছি, এ এক গ্রামীণ নৃত্যনাট্য বা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নাচগান, মেয়েটি নেপথ্য গানের সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়ে নিপুণ নাচছে, অব্যর্থ তার মুখের ভাব-ভাবান্তর আর চোখের ভাষা বিচ্ছুরণ, সঙ্গে স্বামীর গান 'গোরী, নয়নে না মার' —ফর্সা সুন্দরীর আশ্চর্য দুটি চোখ দেখেই সে বুঝি মরে যাবে, ছেলেটি কাতর হয়ে বলে চলেছে গোরী, নয়নে না মার!

ক্যাপ্টেন সিং অনেক আগে থেকেই মাইক্রোফোন হাতে নিয়েছিলেন, একেকটা গানের আগে উদ্যোক্তাদের কারও কাছ থেকে হিন্দিতে গানটির অর্থ জেনে নিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের জন্য ইংরিজি করে বিবৃত করছিলেন, এই নাচ-গানের অর্থ বলে দিলেন, স্বামী বলছে তোমার সঙ্গে আমার দুবছর হল বিয়ে হয়েছে, তোমার দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে, এবার আমি আরেকটা নতুন কচি বউ ঘরে আনব। শুনে মেয়েটি কেঁদে-কেটে বলছে, আমার কী নেই যে তুমি আবার বিয়ে করতে চাইছ? মুশকিল হল, স্ত্রীর চোখেই সম্মোহনের যাদু, পতির কণ্ঠেই কাতর মিনতি— 'গোরী নয়নে না মার'। মনে হয় এক গানের অর্থের সঙ্গে আরেক গানের অর্থ ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে সিংজির উচ্চগ্রাম ইংরিজি!

এই বুন্দেলখণ্ডী লোকসংস্কৃতির আনন্দটুকু ঝাঁসিতে আমার একটি বড় প্রাপ্তি। এমনিতে ঝাঁসির ইতিহাস আমার পড়তে যত ভালো লাগে, দেখতে তত নয়। ঠিকমতো বলতে গেলে বেনারস-সারনাথ-চুনারের ধর্ম ও ইতিহাসস্পন্দিত ত্রিভুজ ভ্রমণের পর দেওগড়-ওরছা-বড়ুয়াসাগর না দেখা পর্যন্ত ভ্রমণগ্রস্ত মানুষের মন ওঠে না। কুমায়ুন-গাড়োয়ালে যেমন বার বার যাই, এই দুই ভ্রমণবৃত্তেও তেমনই বার বার ঘুরতে হবে। তবে এই ত্রিভুজের কেন্দ্রে তো সেই ঝাঁসিই, ফলে দেওগড় ওরছা বড়ুয়াসাগরগামী পর্যটকের ঝাঁসির ঝাঁকিদর্শন হয়েই যায়।

দেওগড়ে পৌঁছে আমার চোখের পলক পড়ে না। কল্পনা করি যেন কবেকার ভাস্করদের গ্রাম, ভাস্কর্যের রাজ্য। দেওগড়ে ঘুরতে ঘুরতে মনে পড়ল, গুয়াহাটি থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে প্রাচীন মন্দিরপ্রাঙ্গণের ধ্বংসস্তূপ মদনকামদেবের অঢেল স্তূপাকার ভাস্কর্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। এই তো সেদিন, ১৯৯৬-এর আগস্টে দেখে এলাম জম্মু থেকে মানসর-সনাসরের পথে ক্রিমচি গ্রামে, সেখানে দ্বাদশ শতকের জীর্ণ মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে অবাক হতে হয়। খাজুরাহোর কথা তো সারা বিশ্বই জানে। দেওগড়, মদনকামদেব, ক্রিমচির কথা রাজ্যের বাইরের কজনই বা জানেন!

দেওগড় ওরছা বড়ুয়াসাগর ঠিক বুঁড়ি ছুঁয়ে যাবার জায়গা নয়। দেওগড় আমার একটি নতুন ভ্রমণস্বপ্ন হয়ে রইল।

ভ্রমণ, ভ্রমণের স্বপ্ন দেখার সুখ আর ভ্রমণসাহিত্য পাঠের আনন্দ —এই ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন না করলে আমার দিনগুলো যেন ধুলোয়-কাদায় গড়াগড়ি খায়, জীবন থমকে যায় দম ফুরনো ঘড়ির মতো।

ভ্রমণ মনের ঘুম ভাঙায়, নিরানন্দ নিরক্ষরতা থেকে আমাকে নিয়ে যায় আনন্দময় বিশ্বপাঠের বর্ণপরিচয়ে। তার ওপর এবারের এই ভ্রমণের আরও একটা আনন্দ, একযাত্রায় এত বেশি বন্ধুলাভ। এই পথ, এই পথের বন্ধু, এই তো জীবনের মস্ত পাওয়া।

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' মার্চ ২০০০

ছবি: লেখক

আমার ছবি জীবন

শুভাপ্রসন্ন

১৫

গুন্টার গ্রাসের সেবারের কলকাতায় আসা কোনও সরকারি অনুরোধে, অনুদানে নয়। নিজের ইচ্ছায়। এ শহরকে জানতে, ঠিকঠাক বুঝতে। ইতিপূর্বে প্রায় দশ বছর আগে এসেছিলেন খুব অল্প সময়ের জন্য। কলকাতার রাজভবনে অতিথি হিসেবে তাঁকে রাখা হয়েছিল। সেবারের সেই অভিজ্ঞতা তিনি তির্যকভাবে উল্লেখ করেছিলেন তাঁর সে সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফ্লাউন্ডার'-এ। বিতর্ক শুরু তা নিয়ে। সেই থেকেই উনি ঠিক করেন কলকাতা শহরকে নিজের চোখে স্বাধীনভাবে জানবেন, দেখবেন আর দেখা ও উপলব্ধি নিয়ে লিখবেন। এই ভাবনা নিয়েই ছ'মাসের পরিসরে এখানে আসা। ম্যাক্সমুলার তাঁর ইচ্ছেমতো বারুইপুরের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাগান-ঘেরা আবাসে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। উনি সেই মতো সেখানে ছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে কলকাতার সঙ্গে সংযোগ রাখা খুব কঠিন বাস্তব যা স্থানীয় মানুষজনের কাছেও অসহনীয়। সেই বিদেশি যে পৃথিবীর অন্যতম সফল মানুষ, সেই জার্মান যিনি জার্মানির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকার, তাঁর

“আর্টস একর গড়ে তোলার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা আমায় ভয়ংকর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে ঘুরি। যা সংগ্রহ হয় তা দিয়ে ইট কেনা হয়, বালি কেনা হয়। ইমারতের সরঞ্জাম আর মিস্ত্রিদের মজুরি। এসবই ঢুকে যায় খনন করা জমিতে, ভিত শক্ত করতে। কত কিছু ভিতেই লেগে যায়। সমতলে উঠে গেলে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। রবিশঙ্কর কথা দিয়েছিলেন, আর্টস একরের জন্য উনি বাজাবেন। আর টিকিট বিক্রির টাকা আর্টস একরের কাজে লাগবে। সেই মতো দিন স্থির হয়। বন্ধু শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমি পরামর্শ করি। তার পরামর্শ মতো একদিনের পরিবর্তে তিনদিনের উৎসব করা হয়। নামকরণ ওই ঠিক করে। 'উৎসব-রূপ-রস-ধ্বনি'। ঠিক হয়— প্রথম দিন হবে শম্ভু মিত্রকে নিয়ে। তিনি কবিতা পাঠ করবেন। এবং তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর জীবন নিয়ে সুন্দর উপস্থাপনা করব। দ্বিতীয় দিন— সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে চর্চা।”

বারুইপুর-কলকাতা সংযোগ রক্ষার একমাত্র যান শহরতলির দক্ষিণের রেলপথ। আমার মনের ইচ্ছা জানাতে একদিন গিয়েছিলাম বারুইপুরে। বলার আগে উনি আমায় জানালেন, শুভা, দেখো আমার কলকাতা শহরটাকে জানার ইচ্ছে তো এই দূরত্ব অতিক্রম করে একটু অসুবিধা হচ্ছে। তুমি কি শহরে থাকার মতো কোনও জায়গা ব্যবস্থা করে দিতে পার? হোটেল না, কিন্তু আমি ভাড়া দিয়ে থাকতে চাই। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ব্যবস্থা করে দেব। সেদিনই তাঁকে প্রস্তাব দিই আপনাকে আর্টস একর উদ্বোধন করতে হবে। আর একটা ছোট্ট লেখা লিখে দিতে হবে। আরও একটি ইচ্ছে জানাই, সেদিন জার্মানি থেকে সঙ্গে আনা যেসব ড্রয়িং এচিং আমাকে দেখিয়েছিলেন, আমার ইচ্ছা সেগুলো নিয়ে আর্টস একরের নতুন গ্যালারিতে প্রদর্শনীর আয়োজন করার। সেদিন পাকাপোক্ত কথা পাইনি। বাতিলও করেননি আমার প্রস্তাব। আমি ফিরে আসি। চিন্তা করতে থাকি, চেষ্টা করতে থাকি গ্রাসের উপযুক্ত ভাড়াবাড়ি খোঁজার। কাজটা সহজ ছিল না। আমি চিন্তায় পড়ি। কলেজ রোর আমার ছোট্ট বাড়িতে একটা আলাদা কোনও পরিকাঠামো ছিল না, যাতে এই দম্পতি ঠিকঠাক থাকতে পারেন। দৈনন্দিন কাজ করতে পারেন। বিশেষ করে বেশ কয়েক মাসের জন্য। সে তুলনায় শিপ্রাদের নতুন বাড়ি লেকটাউনে অনেক জায়গা। সেই ভাবনা নিয়ে লেকটাউনে যাই। দোতলার পুরো অংশটাই প্রায় খালি পড়ে থাকে। অনেকগুলো ঘর। স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা। আর শিপ্রার বাবা-মা আমাদের আবদারে কখনও অসম্মতি দেন না। উল্টে এই প্রস্তাবে তাঁরাও খুব খুশি হন। আমি ওয়েলেসলি থেকে ওঁদের জন্য বিশেষ কিছু আসবাব ভাড়া নিই। সেইমতো গ্রাস সস্ত্রীক চলে আসেন, সঙ্গে বড় বড় কাঠের পেটিতে নিয়ে আসা জিনিসপত্র, সরঞ্জাম। তারপর নিজের মতো করে গুছিয়ে নেন শোবার ঘর, ছবি আঁকার ঘর, সবকিছু পরিপাটি করে। রান্নার ঘর, খাবার ঘর এমনকী, জামাকাপড় ধোয়া, কাচা, ইস্ত্রি করা সব নিয়ে নিপুণভাবে সাজিয়ে নেন কলকাতায় তাঁর অস্থায়ী আবাস। তিনি সারাদিন কলকাতায় ঘুরে বেড়ান, নানা ধরনের মানুষজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, ম্যাক্সমুলার ভবনে কিছু সময়ের জন্য যান জার্মান পত্র-পত্রিকা পড়ার জন্য। আর সন্ধ্যাবেলায় লেকটাউনে যাওয়ার আগে কলেজ রো-এ এসে রাতের আহার। সেই খাবার-টেবিলে বসে কত আলোচনা— যা আমার কাছে পরম প্রাপ্তি, যা আমার কাছে চিরজীবনের সম্পদ। সে সময়ের ঘটনাপ্রবাহ যা আমাকে মনোবল আর স্বপ্নকে বাস্তব করার সাহস জুগিয়েছিল। একদিকে ভয়ংকর বিরুদ্ধ-বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে চলেছি, অন্যদিকে আমার অতিথি সস্ত্রীক গুন্টার গ্রাস। সারা পৃথিবীর কৌতূহলী সাংবাদিকরা ছুটে আসছেন নানান খবরাখবর সংগ্রহ করতে। তিনি কেন এসেছেন, কীভাবে দিন কাটাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তারই সঙ্গে স্থানীয় সাময়িক পত্র-পত্রিকা ভরিয়ে তুলতে তাঁকে নিয়ে নানা খবর। নানা কৌতূহলের জবাব দিতে ব্যতিব্যস্ত থাকতেন তিনি। আমার তখন সকাল সন্ধ্যা টাকা জোগাড় করা, ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আর্টস একর গড়ে তোলার কী অবর্ণনীয় পরিশ্রম চলছে। তাই সকালে কখনও ওঁকে সঙ্গ দেওয়া হয়ে উঠত না। উনি নিজে-নিজেই কোনও গুণগ্রাহী, অত্যুৎসাহী কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মানুষজনদের নিয়ে যাতায়াত করতেন। সাহায্যকারীর অভাব হত না। এর মধ্যে একদিন সকালে দাউদ হায়দার এসে হাজির। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত কবি। নানা চেষ্টাতেও পাকাপাকিভাবে পৃথিবীর কোনও ভূখণ্ডে থাকার ছাড়পত্র না পাওয়ায় ব্যর্থ হয়ে ঘুরে বেড়ানো সেই কবি, যাঁকে ভারতও কূটনৈতিক কারণে আশ্রয় দিতে পারে না। একান্ত আবেগ, ভালোবাসায় তখন অন্নদাশঙ্কর রায়ের ঠিকানায় থাকে। তৎকালীন মুখ্যসচিব রথীন সেনগুপ্ত থেকে দুঁদে সাংবাদিক, আমলা থেকে পুলিশ, বুদ্ধিজীবী থেকে রাজনীতিক মানুষ সবাই দাউদের হিতাকাঙ্ক্ষী হলেও কোনও ভূখণ্ডে বসবাসের ছাড়পত্র সে সংগ্রহ করতে পারেনি। দাউদের সাহিত্যপ্রতিভা থাকলেও ও একটু বেয়াড়া ধরনের। নিষ্পাপ নয়, নিষ্কলঙ্ক নয়, এমনকী মুক্তকণ্ঠে বলতে পারব না সে বড় মানের মানবদরদি! এ পৃথিবীতে মুক্তচিন্তার, মুক্তভাবনার অধিকার কেউ কাড়তে পারে না। কিন্তু অধিকার হরণ করার চেয়েও অধিকার রক্ষা করা, মর্যাদা দেওয়া বড় কঠিন কাজ। মুক্তমানুষ হতে গেলে আগে সত্যিকারের মানুষ হতে হয়। যে দর্শন মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দেয় সে দর্শন জীবনে প্রয়োগ করা সহজ কাজ নয়। অপরপক্ষে কিছু সুবিধাবাদী, স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজেদের নাস্তিক বলে চিহ্নিত করে সমাজের কাছে নিজেকে ব্যতিক্রমী চিহ্নিত করে। যে

এ পৃথিবীতে মুক্তচিন্তার, মুক্তভাবনার অধিকার কেউ কাড়তে পারে না। কিন্তু অধিকার হরণ করার চেয়েও অধিকার রক্ষা করা, মর্যাদা দেওয়া বড় কঠিন কাজ। যে দর্শন মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দেয় সে দর্শন জীবনে প্রয়োগ করা সহজ কাজ নয়।

নিজেকেও বিশ্বাস করে না তাঁরাই নাস্তিক। এসব কথা হয়তো পুরোপুরি দাউদ হায়দার প্রসঙ্গে নয়, কিন্তু এ সময়ই মনে হল। সেই দাউদ আমার কাছে এসে গুন্টার গ্রাসের সঙ্গে আলাপিত হতে এসেছিল। আমি আমার মতো করে গ্রাসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই। দাউদ আমাকে একটু আড়ালে জোর দিয়ে বলে, সে যে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত কবি আর কেন, যে তা ঠিকঠাক পরিচয় প্রসঙ্গে জানাই। আমি জানিয়েছিলাম, তখনই গ্রাসের কোথায় যেন আবেগে স্থান করে নিয়েছিল সেই বাস্তুচ্যুত কবি। সেই মুহূর্ত থেকে প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত কলকাতায় গ্রাসের ছায়াসঙ্গী হয়ে যান দাউদ হায়দার। এ প্রসঙ্গে আবার পরে আসব। আমি কিছুটা নিশ্চিত হই। সে সময়ের আমার রোজনামচায় সঙ্গ দেওয়ার পরিসর না থাকায় দাউদ ওই দায়িত্ব নেওয়ায় আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম। এরই মধ্যে সেই দুর্ঘটনা ঘটল। গ্রাসের সঙ্গে আমাদের পুরী যাওয়া হল না। ছাত্রছাত্রীরা ফিরে গেল হাওড়া স্টেশন থেকে। গ্রাস ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে জানতে পারলেন, আমায় পুলিশ ধরে রেখেছে। এসবই তাঁর কলকাতা ডায়েরিতে বর্ণিত করেছেন গুন্টার গ্রাস। নানান ঝড়ঝাপটা অতিক্রম করে সেই দিন এল— তখন আমরা মনে মনে আতঙ্কিত। বিভিন্ন শত্রুরা সক্রিয়। নানাভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, কিন্তু ১৯৮৬ সালের ১১ জানুয়ারি নতুন গড়ে ওঠা আর্টস একর আর তার বিশাল গ্যালারিতে আমরা যথার্থভাবে গ্রাসের ছবি সাজিয়েছিলাম। অন্নদাশঙ্কর রায় সে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন। অসংখ্য নানা বর্ণের মানুষ

১৯৮৭। আর্টস একর-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত (বাঁদিক থেকে) এইচ পি বড়ুয়া, গুন্টার গ্রাস, শিবনারায়ণ রায়, ভবেশ সান্যাল, চিন্তামণি কর, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ

সে ছিল এক ঐতিহাসিক সন্ধ্যা। উন্মুক্ত আকাশের তলায়, কলকাতার কাঁচা শীতে পিছনে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেন সাজানো প্রেক্ষাপট। আর মঞ্চবাদ্য ছিল বিমানের নামা-ওঠার গর্জন। এ যেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য উৎসবের মঞ্চসজ্জাকে হার মানিয়ে দেয়।

জড়ো হয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। শিল্পীদের কটেজ তৈরি হয়েছিল। গাছপালা দিয়ে খুব সুন্দর সাজানো হয়েছিল আর্টস একর। সূচনায় বেদ গান আর মঞ্চে সন্তোষকুমার ঘোষ, মৃণাল সেন, গৌরকিশোর ঘোষ, অম্লান দত্ত, গ্রাস দম্পতি, মন্ত্রী অশোক মিত্র আর আই সি এস অশোক মিত্র ছাড়াও ছিলেন ভবেশ সান্যাল, চিন্তামণি কর প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। স্বপ্নের একটা বড় অংশ বাস্তবায়িত হয়েছিল সেদিন। পরদিন সন্ধ্যায় গ্রাসের ইচ্ছায় আর্টস একরের খোলা জমিতে আয়োজন করেছিলাম কবিসম্মেলনের। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নীরেন চক্রবর্তী কে ছিলেন না? প্রায় ৩৫ জন অতিখ্যাত কবি। তার মধ্যমণি ছিলেন কবি গুন্টার গ্রাস আর তাঁর স্ত্রী উটে গ্রাস। আমার মনে হয়— সে ছিল এক ঐতিহাসিক সন্ধ্যা। উন্মুক্ত আকাশের তলায়, কলকাতার কাঁচা শীতে পিছনে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর যেন সাজানো প্রেক্ষাপট। আর মঞ্চবাদ্য ছিল বিমানের নামা-ওঠার গর্জন। এ যেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য উৎসবের মঞ্চসজ্জাকে হার মানিয়ে দেয়। গ্রাস তাৎক্ষণিক কবিতা লিখেছিলেন— এই পরিপ্রেক্ষিতের ছবি এঁকে জার্মানি তর্জমায় সে কবিতা পাঠ করেছিলেন। এগুলোই জীবনস্মৃতিতে উচ্চারণ করা মনে হয়। আমার ছবিজীবনের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠা আর্টস একর প্রতিষ্ঠিত হল। বহু মানুষ উৎসাহ দিলেন, উৎসাহিত হলেন। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে, প্রচারে একটা স্বপ্ন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অঙ্কুরিত হল। হয়তো ভবিষ্যৎ-বৃক্ষের একটা ইঙ্গিত মিলল। গুন্টার গ্রাসের মতো বিশ্ব নাগরিক শিল্পী কীর্তিমান সাহিত্যিক আর কলকাতা তথা বাংলার শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যকার, কবি সকলের সম্মেলনে কলকাতার অদূরে এক অখ্যাত পল্লির সীমানায় একটা ঠিকানা রচিত হল— আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু এত সহজে তা ঘটেনি। সমস্ত ফসলের যেমন ফলবান হওয়ার আনন্দ-বর্ণনা থাকে, তেমনই থাকে বেদনার, যাতনার, দুঃখের— যা ভুলেও ভোলা যায় না! আমার সঙ্গী আমার ছাত্ররা, যাদের শুধু ছাত্র বলা যায় না— খুব কাছের প্রশ্রয়ের, যারা ২৪ ঘণ্টার সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। শুধু কলা শিক্ষার সম্পর্ক নয় তাদের জীবন, যৌবন, বেঁচে থাকার রসদ, দৈনন্দিন আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুরই যেন

দায়দায়িত্বের কান্ডারি হয়ে উঠেছিলাম আমি। তাদের অভিভাবকরাও ভবিষ্যৎ-ভাবনা সঁপে দিয়েছিলেন আমার কাছে। তাতে একদিকে যেমন সময়ের চেয়ে, বয়সের চেয়ে বয়স্ক হয়ে উঠেছিলাম, অন্যদিকে কিছুটা বিশ্বাসের অহংকার আমায় অন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু কোনও মানুষই কৃতজ্ঞ হতে চায় না। কৃতজ্ঞতা আশা করাটাও পরিণত বুদ্ধির পরিচয় নয়। আবার মন তো এমনি এমনি সন্ন্যাসী হয় না! হয়তো হয়, কিন্তু আমি সে ধাতের মানুষ হতে পারিনি। আবেগ, অনুভূতিকে নিয়ে বাস্তব-অবাস্তব ঘুলিয়ে ফেলে স্বপ্নের তোড়ে মানুষকে অবিশ্বাসী ভাবতে পারি না। একেবারে গোড়ায় যাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিলাম তাদের মধ্যেই নানান লক্ষণ দেখা দিল। যারা সঙ্গে থেকেছে, নানাভাবে লাভবান হয়েছে তারাই ভাবতে শুরু করেছে— শুভাদা আর তারা আলাদা কেন? এমনকী যে ছাত্র অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় বিধবা মাকে সঙ্গে নিয়ে পারিবারিক প্রতিকারের আশায়, বিশেষ করে অর্থ উপার্জনের উপায় খুঁজতে, বন্ধক দেওয়া বাড়ি উদ্ধারের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন নিয়ে আমার কাছে আসে, সেও এমন ভাবতে শুরু করে। যে অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত সহোদরেরাও তাদের সাহায্যের হাত বাড়ায়নি, আমি আমার ব্যক্তিগত সঞ্চয় থেকে টাকা তুলে তাদের সাহায্য করি। তার চাকরির জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার সে উদ্যোগ, অনুনয়ে তার বড় প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার সুযোগ হয়। এরকম সকলের জন্যই কোনও না কোনওভাবে আমি আমার সাধ্যমতো তাদের ব্যক্তিগত জীবনের দায়ভার নিয়ে ফেলেছিলাম। আমার নিজের তেমন কিছু পুঁজি গড়ে তুলতে পারিনি। একটা সামাজিক পরিচিতি অনেক অল্প বয়েস থেকে গড়ে উঠেছিল। নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বহু ক্ষমতাবান মানুষের কাছে পৌঁছে যেতাম। সাধারণত আমার কোনও অনুরোধ তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতেন না। পরিচিত-অপরিচিত কারও যে-কোনও কাজেই আমি সহায়তার ভূমিকা নিয়ে নিতাম। কিন্তু মানুষ প্রতি মুহূর্তে আকাঙ্ক্ষার পারদ বাড়িয়ে দেয়, তারই সঙ্গে কৃতজ্ঞতা বা কোনও স্বীকৃতি দিতে চায় না। এই কাছের মানুষরাই ভিতরে ভিতরে আমার স্বপ্নকে ভেঙে ফেলার চেষ্টায় মেতে উঠেছিল। অসহযোগিতা শুরু করেছিল। আমি প্রায় একা হয়ে পড়েছিলাম। অন্য পক্ষে তরুণতর ছাত্রছাত্রীরা আমার কাছের হয়ে উঠেছিল। এটাও তাদের কাছে ঈর্ষার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। আমি সমাধানের মন্ত্র হিসেবে প্রায়ই একসঙ্গে বসার চেষ্টা করেছি। সামনাসামনি হয়তো কোনও রোগের লক্ষণ পাওয়া যেত না। ছোটখাটো উপসর্গ যা গুরুত্বহীন তা মিটে যেত, কিন্তু মনের যে মারণরোগ তার উপসর্গগুলো জানা থাকলেও প্রতিকারের কোনও মহৌষধ এ সমাজে অন্তত মেলে না। ৩৯ বছর বয়সে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া সেই অগ্নিপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দও খুঁজে পাননি সে মহৌষধ। জীবনের বেশির ভাগ সময় সেই মারণবীজ তাকে তাড়িত করেছিল অহরহ। তাঁর সেই প্রাণশক্তি, ঈশ্বরের অসীম কৃপা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তা সহ্য করতে হয়েছিল— আমরা তো কোন ছার!

নানাভাবে তারা গোপনে অপপ্রচার শুরু করে দিল। আমারই চেনানো পথ ধরে পৌঁছে যেত বিভিন্ন মহলে, মহল্লায়। অনেকটাই ইন্ধন পেয়ে গিয়েছিল শিল্পীকুলের কাছ থেকে। কারণ, আমার অগ্রজ অনেকেই আমার এই সক্রিয় ভূমিকাকে মেনে নিতে পারেননি— যে সক্রিয়তায় আমি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। আমি কেন জনপ্রিয় হয়ে উঠছি এটাই ছিল তাদের ঈর্ষার একান্ত উৎস। তাই এই গোষ্ঠীকে মদত দেওয়ার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। আর দাদাদের মদতে সর্বত্র তারা বাধা সৃষ্টির কাজে নেমেছিল। আমি দুঃখ পেয়েছি, আঘাত পেয়েছি। কতদিন ঠিকঠাক ঘুমোতে পারিনি। তবে পাশে শিপ্রা ছিল আর ছিল কিছু ছাত্রছাত্রী যারা আমার লক্ষ্যের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটল— সেইদিন একটা বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে। আর্টস একর গড়ে তোলার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা আমায় ভয়ংকর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। প্রতিদিন দ্বারে দ্বারে ঘুরি। যা সংগ্রহ হয় তা দিয়ে ইট কেনা হয়, বালি কেনা হয়। ইমারতের সরঞ্জাম আর মিস্ত্রিদের মজুরি। এসবই ঢুকে যায় খনন করা জমিতে, ভিত শক্ত করতে। কত কিছু ভিতেই লেগে যায়। সমতলে উঠে গেলে তা দৃষ্টিগোচর হয় না। রবিশঙ্কর কথা দিয়েছিলেন, আর্টস একরের জন্য উনি বাজাবেন। আর টিকিট বিক্রির টাকা আর্টস একরের কাজে লাগবে। সেই মতো দিন স্থির হয়। বন্ধু শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমি পরামর্শ করি। তার পরামর্শ মতো একদিনের পরিবর্তে তিনদিনের উৎসব করা হয়। নামকরণ ওই ঠিক করে। 'উৎসব-রূপ-রস-ধ্বনি'। ঠিক হয়— প্রথম দিন হবে শম্ভু মিত্রকে নিয়ে। তিনি কবিতা পাঠ করবেন। এবং তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর জীবন নিয়ে সুন্দর উপস্থাপনা করব। দ্বিতীয় দিন— সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে চর্চা। বিভিন্ন কাছের মানুষ আলোচনা করবেন আর ছবি দেখানো হবে তাঁর। তৃতীয় দিন রবিশঙ্কর বাজাবেন তাঁর অনবদ্য সুর। সেই মতো ঝাঁপিয়ে পড়ি। সত্যজিৎ রায়কে রাজি করাতে চলে যাই বিশপ লেফ্রয় রোডে। উনি সবে অসুস্থ শরীর থেকে সুস্থতায় ফিরেছেন। কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু তখনও খুব মজবুত হয়ে ওঠেননি। আমি ওঁকে প্রস্তাব দিই। উনি জানতেন, আমাদের সব ঘটনা। মনে আছে, আর্টস একরের যে পরিচয়পত্র তৈরি করেছিলাম, তাতে উৎসাহ দিয়ে ছোট্ট ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, আর নিজের হাতে আমাদের অর্থ গ্রহণের কুপন-খাতায় এক হাজার টাকা লিখে দিয়েছিলেন। কাজে-কাজেই আমরা কী করছি তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল। আর কী করতে চলেছি, সেটাও জানাতে গিয়েছিলাম। উনি রাজি হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত বলেছিলেন, আপনি 'চিদুকে' (চিদানন্দ দাশগুপ্ত) বলুন, চিদু আমার বিষয় বলতে পারবে। আমি উপস্থিত থাকব। কিন্তু নিজে কিছু বলব না। আলাপচারিতায় যদি একটু-আধটু কিছু কথা চলে আসে তাহলে চিদুর সঙ্গে বলে নেব। আমি তখনই চিদানন্দ দাশগুপ্তের সঙ্গে

> সত্যজিৎ রায়কে রাজি করাতে চলে যাই বিশপ লেফ্রয় রোডে। মনে আছে, আর্টস একরের যে পরিচয়পত্র তৈরি করেছিলাম, তাতে উৎসাহ দিয়ে ছোট্ট ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, আর নিজের হাতে আমাদের অর্থ গ্রহণের কুপন-খাতায় এক হাজার টাকা লিখে দিয়েছিলেন।

পার্ক সার্কাস ময়দানের উল্টোদিকে রাস্তার ওপরে এক অলংকারহীন ধোঁয়া-হলুদ বাড়ি। সরু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে গিয়ে সোজা উঠে যাই বাড়ির চারতলায়। বেল দিই। দরজা খুলে সহাস্যে বলেন, কী খবর, কেমন আছ? উনি ভিতরে ডেকে নিলেন, জুতো খুলে বসলাম নিরাভরণ ঘরে পাতা মাদুরের ওপর। উনি বললেন, চা খাবেন?

যোগাযোগ করার চেষ্টায় সোজা চলে যাই পরিতোষ সেনের বাড়ি। পরিতোষবাবু আমাদের খুব কাছের মানুষ। ওঁর কোনও রাখঢাক নেই। তাছাড়া উনি আমাদের সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত। যদিও আমি ভিত্তিপ্রস্তরের অনুষ্ঠানে ওঁকে নিতে পারিনি। আমাদের অভিপ্রায় পরিতোষবাবুকে জানালে উনি চিদানন্দবাবুকে একটা পোস্টকার্ড লিখে দেন। দিল্লিতে তখন চিদানন্দবাবু স্প্যানের সম্পাদক। আমার সঙ্গে দেখা হত প্রদর্শনী চলাকালীন সেখানে। উনি চলে আসতেন গ্যালারিতে। খুব রসিক। আর সহজ মানুষ। তারপর যোগাযোগ করতে চলে যাই শম্ভু মিত্রের কাছে।

পার্ক সার্কাস ময়দানের উল্টোদিকে রাস্তার ওপরে এক অলংকারহীন ধোঁয়া-হলুদ বাড়ি। সরু প্যাসেজের ভিতর দিয়ে গিয়ে সোজা উঠে যাই বাড়ির চারতলায়। বেল দিই। দরজা খুলে সহাস্যে বলেন, কী খবর, কেমন আছ? উনিও আমায় চিনতেন। বেশ কয়েকবার তাঁর কাছে গিয়েছি। তাই যখন জানালাম, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। উনি ভিতরে ডেকে নিলেন, জুতো খুলে বসলাম নিরাভরণ ঘরে পাতা মাদুরের ওপর। উনি বললেন, চা খাবেন? আমি খাই না বলাতে উনি বললেন, ঠিক আছে একটু বসুন, আমি চা খেতে খেতে কথা শুনি। চা নিয়ে আমার সামনে বসলেন। আমি আমাদের পরিকল্পনা সবটাই উজাড় করে বলি, উনি শোনেন। বলেন, ভালো তো, ভালো তো। আপনারা এরকম কিছু একটা করছেন। আমরা তো পারলাম না। আমরা মিলিতভাবে মঞ্চ গড়ার চেষ্টা করেছি, শেষপর্যন্ত আর হয়নি। হয়তো সে খাতে অল্প কিছু টাকা পড়ে আছে। আমি রুদ্রপ্রসাদকে জানাব, সেই টাকাটা আপনাদের কাছে দিতে পারলে হয়তো কিছু সাহায্য হবে। আমার প্রস্তাব শুনে উনি বললেন, আমি এখনও বুঝতে পারছি না আপনি কেন আমায় নির্বাচন করলেন। আমি তো আর কবিতা পাঠ করি না। আর আমার কবিতা শুনতে, আমার কথা শুনতে কে আর টিকিট কাটবে বলুন? আমি ভেবে দেখব, আপনি পরে আসবেন। সে সময় উনি খুব মজে ছিলেন। সবে কালীদাস সম্মান পেয়েছেন। অশোক বাজপেয়ী তখন ভারত ভবনের সর্বেসর্বা। শম্ভুবাবুর বনজঙ্গল দেখার শখ। অশোক বাজপেয়ী তাঁকে অত্যন্ত যত্ন করে ভূপাল আর তার আশপাশের অরণ্যপথে নিয়ে গিয়েছেন। উনি সেই ভ্রমণে মথিত। আমাকে কী সুন্দর করে তাঁর অনন্য শব্দ উচ্চারণে স্বভঙ্গিমায় উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বর্ণনা শোনালেন। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে শুনতে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। এসেছি সাড়ে ৮টায়। আমার আসল কাজের পাকাপোক্ত উত্তর পাইনি। উনি পরে আসতে বলেছেন। এটাই মাথায় নিয়ে চলে আসি। এরপর দু-চারদিন অন্তর যেতে থাকি। আমার প্রস্তাব গুছিয়ে বলি। এর উত্তর আসে খুব মাপা। আমার কথার মধ্যে কোনও ফাঁক থাকলে বা ওঁর কাছে ঠিকঠাক না মনে হলে সেদিনের আলাপচারিতার বিষয় তা নিয়ে শুরু হত। এভাবেই শিবনারায়ণ রায় সম্পর্কে তাঁর ধারণা, সমাজ বা নীতি নিয়ে, একাল-সেকাল নিয়ে, আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে তাঁর ধারণা জেনেছি। ওঁর সঙ্গে কোনওদিন কোনও যুক্তিতে পারিনি! ওঁর কাছে তখন আমি নেহাতই বাচাল। কী সাহসেই বা আমি জেতার ভাবনা করি! সব কিছুতেই যেন ওঁর শব্দ উচ্চারণে বাজে হতাশার সুর। প্রায় পঞ্চম বা ষষ্ঠ বারে যখন আমি বেপরোয়া হয়ে গিয়েছি, ওঁর অনুমতি নেওয়ার জন্য নাছোড়বান্দা সেদিন। শম্ভুবাবুকে জানাই, আপনি আজ মনস্থির করে আমাকে সম্মতি দিন। আমার হাতে বেশি সময় নেই। এছাড়া যাঁরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন তাঁদের আমাকে ছাপার বিষয় খুব তাড়াতাড়ি দিতে হবে। আমি পোস্টার ডিজাইন করেছি। যাতে একটু প্রচারের সুবিধা হবে। কারণ টিকিট ঠিকঠাক বিক্রি হলে খরচখরচা বাদ দিয়ে যেটুকু থাকবে তা আর্টস একরের কাজে লাগবে। তাঁকে জানাই একটি নামী প্রতিষ্ঠান রাজি হয়েছে আমাদের প্রচার ও ছাপার দায়ভার গ্রহণ করার। রাণা দাশগুপ্ত আমাদের খুব উৎসাহিত করেছেন। আপনার সম্মতি পেলে ওগুলো ঠিকঠাক করতে পারি। আমি যে পর্যন্ত রাজি করিয়েছিলাম তাতে ঠিক ছিল— উনি কীভাবে বসবেন মঞ্চে তার পরিকল্পনা করা। কারা মঞ্চে সে সময় থাকবেন, সেইসব ব্যবস্থা করা। উনি বলেছিলেন, আমি একাই বসব। আমি অল্পক্ষণ থাকব। তারপরে আপনি আপনাদের অনুষ্ঠান করবেন। এরকম একটা জায়গায় মোটামুটি রাজি করিয়েছিলাম। হঠাৎই উনি বেঁকে বসলেন স্পনসরের কথা শুনে। এ কী আপনারা খেটেখুটে আয়োজন করছেন সেখানে সিগারেট কোম্পানিকে জড়িয়েছেন কেন? আমি একেবারে পছন্দ করি না। আপনাদের মতো একটি বিশুদ্ধ কাজে এ ধরনের পাপাচার কেন? এ কথা আমি আগে জানলে আপনার সঙ্গে এত আলোচনা করতামই না। ওঁদের বাদ দিয়ে যদি কিছু ভাবনা করতে পারেন আমায় জানাবেন। নচেৎ আমাকে যুক্ত করবেন না। আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। আর কথা না বাড়িয়ে আমি চারতলা থেকে নেমে বাস ধরার জন্য এগিয়ে গেলাম। এ দুঃখের কথা সে মুহূর্তে আর জানাইনি। এন টি সি-র রাণা দাশগুপ্ত কত উৎসাহ দিয়েছেন। রাজি হয়েছেন কার্ড ছেপে দেওয়ার, ফোল্ডার, পোস্টার ছেপে এমনকী হোর্ডিংয়ে অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করবেন তাঁদের কোম্পানির হয়ে। এসবে আমাদের সত্যিই সাহায্য হবে। সোজা চলে যাই তাঁর কাছে। মার্টিন বার্ন-এর উল্টোদিকে বিরাট বারান্দাওলা কোনের বাড়ি। উঠে যাই তিনতলায় তাঁর অফিসে। রাণাদার ঘরে ঢুকে পড়ি। ওঁকে আমার বিষণ্ণতার সব কথা বলি। এতদিনের যাওয়া, শম্ভু মিত্রের সঙ্গে কথোপকথন আর শেষকালে ফিরে আসা। রাণাদা শোনেন সব কথা। শুনে উঠে দাঁড়ান, আমাকে অনুসরণ করতে বলেন। আমি টেবিল পেরিয়ে ওঁর চেয়ারের কাছে চলে যাই। বাঁ পাশে বিশাল জানলার কাচ দিয়ে আমাকে দেখান, উল্টোপারের কোনে টাঙানো বিশাল বড় হোর্ডিং। যেটা তাঁর কোম্পানির অর্থানুকুল্যে বিজ্ঞাপিত। তাতে মুদ্রিত শাঁওলি মিত্রের

একটি বিশেষ ভঙ্গি। ওপরে লেখা শম্ভু মিত্র প্রযোজিত শাঁওলি মিত্র অভিনীত 'নাথবতী অনাথবৎ' ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে বহুলপ্রচারিত ফোর স্কোয়্যার সিগারেট বক্সের ছবি। লেখা আছে এন টি সি-র সৌজন্যে। সেটি দেখে অবাক আমি। আর বললেন, শম্ভুবাবুর ব্যক্তিগত অনুরোধে এই প্রযোজনার সব কাজই করে দিয়েছি। এটি বড় মাপের অর্থানুকূল্যে আমাদের কাজ। এর পরে আমার অনুভূতি ওই দীর্ঘ সময়ের কথোপকথন তা এতই একান্ত প্রক্রিয়া যা ঠিক অভিজ্ঞতার বিবরণে হবে না। শম্ভু মিত্রকে নিয়ে আর আমাদের অনুষ্ঠান করা গেল না। এর পরের অভিজ্ঞতা সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে। চিদানন্দ দাসগুপ্তের চিঠি এসেছিল খুব তাড়াতাড়ি। তিনি রাজি হয়েছেন এই শর্তে যে, তাঁর দিল্লি যাতায়াতের বিমান ভাড়া পাঠিয়ে দিতে হবে। সে সময় যাতায়াতের ভাড়া ২,০০০ টাকার কিছু বেশি। আমরা ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। ভেবেছিলাম, তিনি চলে আসবেন। তাঁর মতো মানুষের কাছে এই টাকা কোনও ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আমরা তো পাঁচ-দশ টাকা চেয়ে চেয়ে আর্টস একর গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। আমাদের কাছে অগ্রিম পাঠানো দুষ্কর। বিশপ লেফরয় রোডে আবার যেতে হল জানাতে। সত্যজিৎ রায় একটু মৃদু হেসে আমায় বলেন, ঠিক আছে সুন্দর আমার ব্যাপারে খুব উৎসাহী। ঠিকঠাক বলতে পারবে। সুন্দর মানে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। আমি চলে যাই তখনই। ম্যাক্সমুলার ভবনের পাশ দিয়ে কিছুটা এগিয়ে একটা গলি ঢুকে গিয়েছে লাভলক প্লেস। একটি ফ্ল্যাট বাড়ি। তার দু'তলা কিংবা তিনতলায় মনে নেই। আলাদা করে গ্রিলের দরজা লাগানো সে সিঁড়ি। তখন দেড়টা বেজে গিয়েছে। ধৃতিমান নিজেই দরজা খুলে দিল। ঘরে বসি। ওর সঙ্গে আমার এক বন্ধুর সূত্রে পরিচয়। যদিও ওর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আগে আলাপচারিতা হয়নি। কিন্তু আমরা পরস্পরকে চিনতাম। ধৃতিমান খুবই উৎসাহ দেখাল আর বলল, মানিকদা যখন আমাকে নির্বাচিত করেছেন আমি নিশ্চয় ঠিকঠাক তৈরি করে নেব। কোনও অসুবিধা হবে না। সময়মতো পৌঁছে যাব, আর ইতিমধ্যে তো যোগাযোগ হবে। আমি নিশ্চিন্ত হই। অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হয় শম্ভু মিত্রের বদলে একদিন শুধু আবৃত্তি পাঠ। যেখানে শক্তিদা, অপর্ণা সেন প্রভৃতিরা। প্রথম দিন সত্যজিৎ রায়ের সন্ধ্যায় ঠিক হয় 'সদগতি' তথ্যচিত্র দেখানোর। সত্যজিৎ রায় শ্যাম বেনেগালের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে দেন আমায়। শ্যাম বেনেগালের সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের যে চলচ্চিত্র সেটি যাতে আমরা ওই সন্ধ্যায় দেখাতে পারি। চিঠিটি আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাই। খুব দ্রুতগতিতে কাজ চলে। সারাদিন ছুটে বেড়াই আমার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। একদিকে টাকা জোগাড় অন্যদিকে মঞ্চ সাজানো। সামগ্রিক সাজসজ্জা প্রচারের ভাবনা আর অন্যদিকে অশান্ত সময়ের অনিশ্চয়তা ভিতরে ও বাইরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হল— বেশ বড়। রবিশঙ্কর ওখানে আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেও এক ঘটনা। অসম্ভব নৈরাজ্য তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য প্রতিদিন ধিকৃত হচ্ছেন। একদল ছাত্র-কর্মচারী তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেয় না। গালিগালাজ অপমান সহ্য করে তিনি অনড় অবিচল হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক আবহাওয়া একেবারেই ভালোর দিকে নয়। পরিতোষবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এক সকালবেলায় সন্তোষবাবুর কাছে যাই। উনি রাজি হয়ে প্রাথমিক অনুমতি দিয়ে দেন। কিন্তু ঝামেলা, যেসব রীতিনীতি যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীর কাজ, তা নিয়ে এক টালবাহানার সম্মুখীন হই। কোনও কিছুতেই যেন সঠিক নিয়মনির্দেশ নেই। সব কিছুই যেন অনিশ্চয়তার দুর্ভাবনায় আর উৎকণ্ঠায় কাটে। এরকম সময়ে এক সকালে নির্মাল্য আচার্য আমার বাড়িতে আসেন। শুধু উনি এই মহল্লার বাসিন্দাই নন— সেই ইন্দ্রনাথ মজুমদারের দোকানে যেখানে আমি বহুদিন থেকে যাতায়াত করছি, সেখান থেকে 'এক্ষণ' প্রকাশ হত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর নির্মাল্যদা যুগ্ম-সম্পাদক। উনি খুব কম কথা বলতেন। একনিষ্ঠভাবে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সেইভাবে নানান কাজে, নানান কথায় নির্মাল্যদা ছিলেন আমার খুব কাছের মানুষ। মনে আছে আমি প্যারিস যাচ্ছি শুনে উনি কিছু তালিকা দিয়ে দিলেন ওখান থেকে নিয়ে আসার। সেই নির্মাল্যদা সে সময় মানিকবাবুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে যান। 'এক্ষণ'-এর প্রচ্ছদ আঁকা থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সব মিলে ওঁদের খুব কাছের সম্পর্ক ছিল। পরে যখন সৌমিত্রদা 'এক্ষণ' থেকে আলাদা হয়ে গেলেন তখন থেকে 'এক্ষণ'-এর প্রকাশক, সম্পাদক সবকিছুই ছিলেন নির্মাল্যদা। ওই সময় সত্যজিতের ছায়াসঙ্গী হয়ে যান নির্মাল্য আচার্য। আমার বাড়িতে এসে উনি জানালেন, কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ইউনিভার্সিটির শতবার্ষিকী হলে তোমরা যে ওঁকে নিয়ে আসছ— মনে হয় ওঁর শরীরের পক্ষে ঠিকঠাক হবে না। তুমি ভেবে দেখো। মানিকদাকে না আনাই ভালো। আমাদের সাংস্কৃতিক মহল খুব একটা বড় নয়। সকলেই সকলের মনোভাব, মানসিকতা জানেন। কোনও গোপন থাকে না। নির্মাল্য আচার্য যে একমাত্র সত্যজিৎ রায়কে নিয়ন্ত্রণে রাখেন আর তিনিই যে তাঁর গতিবিধির নিয়ন্তা! তিনি সত্যজিতের অন্যতম হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সে সময় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেখানে আমি এক ভুঁইফোড়। সত্যজিৎ রায়কে রাজি করিয়েছি এবং কলেজ স্ট্রিট পাড়ার চৌহদ্দিতে তিনি আসছেন। যেখানে নির্মাল্য আচার্যের কোনও ভূমিকা নেই বা কোনও অনুমতি নেই এটা ঠিক হতে পারে না। তিনি হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে মানিকবাবুকে পরামর্শ দিয়েছেন এই অনুষ্ঠান থেকে সরে আসতে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় উৎসাহী ছিলেন, তাঁর কথামতো ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় রাজি হয়েছে আমার সঙ্গে কথোপকথন করে। তিনি নিজ হাতে চিঠি লিখেছেন শ্যাম বেনেগালকে। যাতে সেই অনুষ্ঠানে সেই ছবি দেখানো যায়। তাঁর এইসব অনুমতি নিয়েই তো আমরা পোস্টার ছেপেছি, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি— এর পরেও যদি মত পরিবর্তনের উপদেশ কেউ দেয় আমি আর কী করতে পারি। সেদিন আমি বিশেষ কাজে আনন্দবাজার অফিসে গিয়েছি।

ক্রমশ

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস ১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে:
১। প্রকাশস্থান: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
২। প্রকাশকাল: মাসিক
৩। প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী।
নাগরিকত্ব: ভারতীয়।
ঠিকানা: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৪। সম্পাদকের নাম: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
নাগরিকত্ব: ভারতীয়।
ঠিকানা: ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৫। যেসব ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং অংশীদার অথবা যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি শেয়ারের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা:
(ক) মালিক: [illegible] প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
(খ) মোট মূলধনের এক শতাংশেরও বেশি শেয়ারের অধিকারী:
১। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
২। [illegible] চক্রবর্তী, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৩। মহাশ্বেতা মজুমদার, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
৪। [illegible] নাগ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯।
আমি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।
স্বাঃ
১ মার্চ, ২০১৪ প্রকাশক

গল্প সম্পর্কে গল্পকার

একটি ছোটগল্প লেখা একটি উপন্যাস লেখার চেয়েও অনেক কঠিন বলে আমি মনে করি। অন্যরা হয়তো অন্য কথা বলবেন। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এক জায়গাতে লিখেছিলেন— 'Nothing is wasted in writer's life' একজন লেখকের দীর্ঘ জীবনে যা কিছু ঘটে অথবা তিনি যা কিছু দেখেন এবং অনুভব করেন তাঁর জীবন থেকে, তাই হয় তাঁর সাহিত্যের রসদ। লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি নানারকম পরস্পরবিরোধী অনুভূতিতে ভরে ওঠে, যার অধিকাংশই নিরুচ্চারিত থাকে, কিন্তু একাংশ ফুটে ওঠে তাঁর লেখায়। যে সমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে যায়, সেইসব অভিজ্ঞতার টুকরো-টাকরা নিয়েই তাঁর ছোট গল্পের ঝুড়ি ভরে ওঠে।

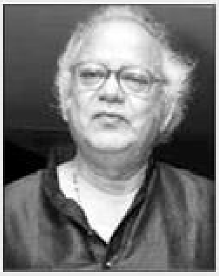

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকা আমার যে দুটি ছোট গল্প প্রকাশের জন্য নির্বাচন করেছেন, সে দুটিকে প্রতিনিধিত্বমূলক বলা চলে। এই নির্বাচনের মাধ্যমটি সম্পাদক অথবা সম্পাদকমণ্ডলীর সাহিত্যবোধই প্রমাণিত করে। এই নির্বাচনে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

'তা' গল্পটির অনুপ্রেরণা আমার ছোট মেয়ের পরিচারিকা। ঘরে ঘরে যেসব মহিলা শিশুদের পরিচারিকা হিসেবে বছরের পর বছর কাজ করেন, তাঁদের যথার্থ মূল্যায়ন আমরা অনেকেই করি না। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাঁরা অন্যের সন্তানদের যে অপরিসীম স্নেহ ও মমতার সঙ্গে বড় করে তোলেন, তা অভাবনীয়। ওরা বিদেশের অতিবিত্তবান পরিবারের গভর্নেসদের মতো অর্থ এবং মান- সম্মান পান না এবং শিশুরা বড় হয়ে গেলে একদিন তাঁরা নীরবে সরে যান। শিশুদের পরবর্তী জীবনে তাঁদের বিশেষ কোনও ভূমিকা থাকে না। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যান। শিশুদের মা-বাবারাও তাঁদের আর মনে রাখেন না। তাঁদের ভূমিকা যে অনস্বীকার্য, এ কথা এই সমাজের অধিকাংশ মানুষই মনে রাখেন না।

এই পর্যায়ের আর-একটি মর্মস্পর্শী গল্প আছে আমার, নাম 'বুনির মা।' যে গল্পটি হয়তো 'তা'-এর চেয়ে অনেকেই বড় বলে সম্পাদক ওটিকে এই সংকলনে স্থান দেননি। তাঁদের অসুবিধার কথা আমি বুঝি এবং বুঝি বলেই কিছু মনে করিনি।

অন্য গল্পটির নাম 'ব্রন্টি'। লেখকের কলেজের এক সহপাঠীকে নিয়ে সে গল্প। সাধারণ ভাবে মানুষ হওয়া বলতে যা আমরা বুঝি, তা যে কত অন্তঃসারশূন্য এক বোধ বা দৃষ্টিভঙ্গী, এ কথাও আমরা অনেকেই বুঝি না। ব্রন্টি, 'ফর ওল্ড টাইমস সেক', পুরনো সহপাঠীর সঙ্গে দেখা করে কিছু অর্থ সাহায্য চায়। বন্ধু খুবই ব্যস্ত মানুষ, তিনি 'সফল' মানুষ, তাঁর সময়ও অমূল্য, তাই বন্ধুকে কিছু অর্থ হয়তো তিনি দেন। কিন্তু সময় দিতে পারেন না। ব্রন্টি জীবনে উন্নতি বলতে যা বোঝায়, আমরা তেমন উন্নতি করতে পারিনি। আসলে ব্রন্টির 'উন্নতির' সংজ্ঞাটাই অন্যরকম ছিল। বাড়ি, গাড়ি, সুন্দরী স্ত্রী, সামাজিক মান এসবের কিছুই তার কাম্য ছিল না। জীবনটাকে Sampling করে দেখতে দেখতে যৌবনের মহামূল্যবান বছরগুলিকে হারিয়ে ফেলেছিল, অথচ সেই 'ক্ষতি' সম্বন্ধে সে অত্যন্ত উদাসীন ছিল, তাই তার Sampling নিয়েই সে খুশি ছিল।

ব্রন্টির মানসিকতা বোঝবার, জানবার এবং তাকে করুণা, দয়া নয়, তাকে দেখে লেখকের মনে এক গভীর হীনম্মন্যতার সৃষ্টি হয়। আমাদের মধ্যে কম মানুষই যে জীবনের প্রকৃত গন্তব্য সম্বন্ধে সচেতন বা উৎসুক, একথা জেনে আমরা মর্মাহত হই। কিন্তু আমরা ব্রন্টির মতো হওয়ার সাহস রাখি না। ছাঁচ ভেঙে ফেলার সাহস আমরা রাখি না। এই প্রেক্ষিতে ব্রন্টি বর্তমান প্রজন্মের কাছে এক অন্য জীবনের দিশারি। ব্রন্টি পাঠকদের ভাবিত করে, কিন্তু তার ব্যথার উপশমের কোনও উপায় তাঁদের কারও কাছেই নেই। এই নিরুপায়, অসহায় এক বোধ বাকিদের উদ্বেলিত করে।

বুদ্ধদেব গুহ

বুদ্ধদেব গুহ-র

দুটি গল্প

তা

প্রথম দিন অফিস থেকে ফিরে প্রমীলাকে দেখেই চমকে উঠেছিলাম।

চমকে উঠেছিলাম, কারণ ওরকম কুৎসিতদর্শন মহিলা আমি এর আগে দেখিনি।

বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে, কুচকুচে কালো রং, উঁচু কপাল, ট্যারা চোখ— এবং অত্যন্ত লম্বা। সব মিলিয়ে প্রথম দেখাটা মনে রাখার মতো।

টাই খুলতে খুলতে রিনিকে বললাম, এ কে?

রিনি গলা নামিয়ে বলল, মুন্নীর নতুন আয়া।

বললাম, কোথা থেকে জোটালে? অন্ধকারে দেখলে মুন্নী তো দূরের কথা মুন্নীর বাবাও কেঁদে উঠবে।

রিনি হাসল, বলল, তুমি ভীষণ অসভ্য। কারও চেহারা নিয়ে ওরকম করে বলতে হয়?

আমি বললাম, সকলেই অপর্ণা সেনের মতো মিষ্টি দেখতে হয় না, তা বলে এতখানি খারাপ হওয়াটাও বাড়াবাড়ি।

রিনি বলল, বাড়ির বাবুদের ছুকছুকে বাতিক থাকলে দেখে দেখে এরকম আয়াই রাখা উচিত।

আমি কপট রাগের সুরে বললাম, অ্যাই! কী হচ্ছে!

রিনি তারপর সিরিয়াসলি বলল, অনেক কষ্ট করে জোগাড় করতে হয়েছে ওকে। চেহারা খারাপ হলে কী হবে, এফিসিয়েন্ট। বেচারার কোনও ছেলেপুলে নেই, তার উপর বালবিধবা।

আমি বললাম, আহা!

।। ২ ।।

সেটা প্রথম দিনের কথা।

তারপর দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে গেছে, অনেক মাসও। প্রমীলার চেহারাটা আমার চোখে সয়ে গেছে দেখতে দেখতে। চেহারা ছাপিয়ে যা চোখে পড়েছে তা ওর দরদ। মনে হয়েছে মুন্নী যেন রিনির মেয়ে নয়, প্রমীলার নিজেরই মেয়ে।

রিনিকে ওর অফিসের কাজে প্রায়ই বাইরে বাইরে যেতে হয়। আজ দিল্লি, কাল বোম্বে, আমাকেও তাই। সে কারণে একজন ভালো আয়া আমাদের বিলাসিতা ছিল না; ছিল নিতান্তই প্রয়োজন।

মনে আছে, একবার রিনি দিল্লি ছিল বেশ কয়েকদিনের জন্য। আমি কলকাতাতেই ছিলাম। সেই ক'দিন আমার চোখের সামনে প্রমীলা যে ভাবে মুন্নীকে বুকে করে রইল তা বলার নয়।

মুন্নীটা যত বড় হচ্ছে, ততই দুষ্টু হচ্ছে। আধো আধো কথা বলতে শিখেছে। সবসময় দু'টি ফেস-টাওয়েল মুখের কাছে ধরে রাখা চাই, আর তা দিয়ে অনবরত নাক ঘষা চাই। টেডি-বিয়ার, জাপানি পুতুল, ফ্লুরির চকোলেট, কিছু দিয়েই তাকে রাখা যায় না, যদি না 'তা' তার সঙ্গে থাকে।

প্রমীলার নতুন নামকরণ হয়েছে আমাদের বাড়িতে। নামকরণ করেছে মুন্নীই। প্রমীলার সেই নতুন নাম : তা।

প্রমীলাকে খেতে পর্যন্ত দিত না মুন্নী। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর যখনই মুন্নী একটু চোখ বুজত তখন ও বেচারী কোনও রকমে চান সেরে, বেডরুমের মেঝেতে বসেই কোনও রকমে খেয়ে নিত। আমি অন্য ঘরেই থাকতাম, তাই প্রাইভেসির বিঘ্ন হত না।

যেখানেই যাক, যাই-ই করুক, তার সঙ্গ ছাড়া মুন্নীর একমুহূর্ত চলত না। মাঝে মাঝে রাতে ঘুমের মধ্যে মুন্নী কেঁদে উঠত। আমি আমার ঘর থেকে দৌড়ে আসতাম। বেডরুমের মধ্যে খাটের পাশে টেবল-ল্যাম্পটা। দেখতাম মশারির মধ্যে মুন্নীকে বুকে করে প্রমীলা বসে থাকত। আর ওর কান্না থামাবার চেষ্টা করত। মুন্নীকে বুকে করে ওর বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে এমন এক মা-সুলভ মমতা থাকত যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগত; মুন্নী সম্বন্ধে মমতা কার বেশি? রিনির না প্রমীলার? এই সন্তানহীনা মহিলার মুখে চোখে টেবিল লাইটের আলোয় যে ভাব দেখতে পেতাম তা রিনির মুখেও কোনওদিন দেখিনি।

মুন্নী সম্বন্ধে মমতা কার বেশি? রিনির না প্রমীলার? এই সন্তানহীনা মহিলার মুখে চোখে টেবিল লাইটের আলোয় যে ভাব দেখতে পেতাম তা রিনির মুখেও কোনওদিন দেখিনি।

আজকালকার মডার্ন মায়েরা নির্দয় হওয়াটাকেই আধুনিকতার লক্ষণ বলে মনে করেন। ভাবাবেগ, সে প্রেমিক, বা স্বামীর সম্পর্কেই হোক কি সন্তানের সম্পর্কেই হোক, প্রকাশ করার মধ্যে যে ইনটেলেকচুয়ালিজম নেই তা এঁদের মতো আর কেউ এমন জানেননি।

আমি জানি না কেন, ইদানীং রিনি প্রায়ই বলত, প্রমীলা বড় আদর দিচ্ছে মুন্নীকে। মেয়েটাকে স্পয়েল করে ফেলল। মেয়েটাকে সামলাতে পারে ও ভালো, কিন্তু শুধু ভালোবাসলেই তো হয় না, তা হলে তো সকলেই আয়া হতে পারত ভালো।

আমি পুরুষ মানুষের স্থূল বুদ্ধিতে বুঝতে পারতাম না, ভালোবাসার চেয়েও বড় কোয়ালিফিকেশন আয়ার মধ্যে আর কী থাকতে পারে? যাই হোক, আমার বুদ্ধি স্থূলই হোক কী সূক্ষ্মই হোক বাড়ির মধ্যে, বাড়ির ব্যাপারে আমার বুদ্ধি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সেখানে আমি নন-এনটিটি। তাই বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে আমি অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতাম। কিন্তু আমার মন কেবলই বলত, এই সন্তানহীনা মহিলার প্রতি রিনি ভালো ব্যবহার করছে না। কারণ, কেন জানি না, আমার মনে হত প্রমীলাকে আর যে গঞ্জনাই দেওয়া হোক সে তা সইতে পারে, মুন্নীর অযত্ন হচ্ছে মুন্নীকে ঠিকমতো দেখাশোনা হচ্ছে না; এ অপবাদ তার পক্ষে অসহ্য ছিল।

কিছুদিন বাদে রিনি কয়েকদিনের জন্য জামশেদপুরে গেল। জামশেদপুর যাওয়ার আগেই মুন্নীর জ্বর এসেছিল। জ্বর প্রায় তিন পর্যন্ত উঠেছিল, কিন্তু ওষুধ পড়াতে জ্বর আবার কমে যায়। ডাক্তারের অভয়বাণী পেয়ে মুন্নীকে রেখেই রিনি জামশেদপুরে চলে গেল। ওর নাকি না গেলেই নয়।

আমার মন ভালো লাগছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, কিছু একটা গোলমাল হবে।

রিনি যেদিন বিকেলের ট্রেনে গেল, সেদিনই রাতে মেয়ের ধুম জ্বর এল। মুখ চোখের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি ডাক্তারবাবুকে খবর দিলাম, তিনি এসে ওষুধপত্র দিয়ে গেলেন। কিন্তু সারা রাত মুন্নী যন্ত্রণায় চিৎকার করল। সে রাতে আমার ঘর থেকে কম করে পাঁচবার আমি উঠে এলাম। কিন্তু আমার মতো অপদার্থ বাবারা শুধু টাকা রোজগার করতে জানে, ছেলেমেয়েদের, বুকের সব ভালোবাসা উজাড় করে ভালোবাসতে জানে, কিন্তু তাদের শারীরিক কষ্ট লাঘব করার কোনও উপায়ই জানে না তারা।

মুন্নীর বয়স এখন দু'বছরও হয়নি। আধো আধো কথা বলে, কিন্তু কোথায় ব্যথা, কীসের কষ্ট তা বুঝিয়ে বলতে পারে না। যন্ত্রণায় চোখ দিয়ে জল পড়ে, কিন্তু জানাতে পারে না, কী করলে সে কষ্টের উপশম হয়। বাবা হওয়ার আনন্দ অনেক কিন্তু অবলা শিশুসন্তানের যন্ত্রণা চোখের সামনে নিরুপায়ে দাঁড়িয়ে দেখাটা বড়ই কষ্টের।

যতবারই আমি দৌড়ে ওঘরে গেছি ততবারই দেখেছি যে, প্রমীলা মুন্নীকে বুকে করে ওর কষ্ট উপশমের জন্য নানারকম প্রক্রিয়া করছে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই মুন্নীর কান্না বা গোঙানি থেমে গেছে। আরামে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে মুন্নী তার তা'র কোলে।

ও থামতেই প্রমীলা বলেছে, দাদাবাবু আপনি গিয়ে ঘুমোন, আমি তো আছি। আপনি কেন কষ্ট করছেন?

পাশের ঘরে আমি শুতে যেতে যেতে ভেবেছি, আমি তো ওর বাবা। ওর জন্য কিছু কষ্ট তো আমার করা উচিত, কিন্তু তুমি তো পঞ্চাশ টাকার আয়া— তুমি কী জন্য ওকে বুকে নিয়ে এত কষ্ট করছ? কেবলই ভেবেছি, আর মনে হয়েছে, প্রমীলা যা করে, যা করেছে এতদিন, তা শুধু ওর কর্তব্য নয়, শুধু টাকার বিনিময়ে করা নয়। ভগবান কখনও ওর কোলে যা দেননি, তা ওর নিজের না হলেও, ক্ষণেকের জন্য, কিছুদিনের জন্য ওর কোলে পেয়ে ও যেন ধন্য হয়ে গেছে। আমার মনে হয়েছে এই সন্তানহীনা রমণীর কোল থেকে সাক্ষাৎ যমদূত এলেও আমারে মুন্নীকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কী, এ কথা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি ঘুমুতে গেছি।

পরদিন ভোরেই মুন্নীর সমস্ত শরীর ভরে হাম দেখা গেল। মেয়ে একেবারে বেহুঁশ হয়ে রইল। চোখ মুখ লাল। চোখের পাতা, মুখের ভিতর হাম একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। সকালে

মুন্নীর মুখের দিকে চেয়ে আমি খুব ভয় পেলাম। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ভয়ের কিছু নেই। হাম বেরোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবুও ভয় পেলাম।

তারপর প্রমীলার মুখের দিকে চাইতেই দেখি আমার মেয়ের ক্লিষ্ট মুখের ছায়া তার মুখে। প্রমীলা মুন্নীর চেয়ে বেশি বই কম কষ্ট পাচ্ছে না।

ডাক্তার আবার এলেন। হাম ভালো করে উঠে যাবার ওষুধ দিয়ে গেলেন।

মন খারাপ করে আমি অফিসে গেলাম। অফিস থেকে বার তিনেক ফোন করে খবর নিলাম। শুনলাম হাম উঠেছে। প্রমীলাই ফোন ধরল, কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মুন্নী বড় কষ্ট পাচ্ছে দাদাবাবু।

অফিস থেকে ফিরে আমি মুন্নীর অবস্থা দেখে ওর কাছে আর দাঁড়াতে পারলাম না। পাশের ঘরে এসে ডাক্তারবাবুকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, কোনও চিন্তা করবেন না, যেমন যেমন বলেছি, ওষুধ খাইয়ে যান। এরকম হয়। অসুখ মানেই তো সুখের অভাব।

আমি একটা গল্পের বই নিয়ে তাতে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সে রাতেও সারারাত প্রমীলা ঘুমুল না। সারারাত প্রায় ঠায় বসে কাটাল। পরদিন এবং পরের রাতেও ওরকম করেই কাটল।

তার পরদিন ভোরবেলা বহুদিন পর মুন্নীর গলা শুনলাম। মুন্নী তার মার নাম ধরে ডাকল না, তার বাবার নাম ধরে ডাকল না। ঘোরের পর জ্ঞান এলে, মুন্নী প্রথম কথা বলল : তা।

তারপর বারবার ডাকল : তা, তা, তা, তা।

আমি দৌড়ে বেডরুমে গেলাম।

প্রমীলা মাথার দিকে জানালার পর্দা সরিয়ে দিয়েছিল। কাচের সার্সি বন্ধ ছিল, কারণ, ঠান্ডা লাগানো বারণ। সেই ভোরের আলোয় দেখলাম প্রমীলা মুন্নীকে বুকে নিয়ে বসে আছে, আর তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইছে আনন্দের। আর মুন্নী তার ছোট ছোট হাত দু'টিতে প্রমীলার কুশ্রী মুখটি ধরে সমানে ডেকে চলেছে, তা, তা, তা।

এই দৃশ্য দেখে আমার বুকের মধ্যে কোথায় না জানি কী হয়ে গেল। কোন তারের সঙ্গে কোন অদৃশ্য তারের যোগাযোগ ঘটে গেল। প্রমীলার কাছে নিজেকে বড় ছোট লাগল। মনে হল, কই? মুন্নীর ডাকে আমার চোখে তো এমন জল এল না? না কি আমি পুরুষমানুষ বলে? না কি আমি দু'পাতা ইংরেজি পড়েছি বলে?

সেদিন সকালের পরই দেখতে দেখতে মুন্নী ভালো হয়ে উঠতে লাগল।

আমি অফিসে গিয়েই কাজে বেরিয়েছিলাম সেদিন। ফিরে জানলাম যে, রিনি কলকাতা ফিরে ফোন করেছিল আমায়। অফিসে ফিরতে

কাজকর্মের অবকাশে মাঝে মাঝে প্রমীলার কথা মনে পড়ে। খুব ইচ্ছা করে, যদি পথে ঘাটে কোথাও দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে তাহলে ওর হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব, ওর জন্যে যদি কিছু করতে পারি তা করব।

ফিরতেই বেলা হয়েছিল বলে এবং তাড়াতাড়ি ফিরব বলে আমি আর রিং ব্যাক করলাম না।

অফিস থেকে ফেরার পথে গাড়িটা ট্রাফিক লাইটে দাঁড়িয়েছিল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলাম। মনটা খুব খুশি ছিল আমার। মুন্নীটা ভালো হয়ে উঠেছে, রিনি ফিরে এসেছে। এ কথা ভেবেও ভালো লাগছিল যে প্রমীলা আজ তিন রাত পরে ঘুমুতে পারবে। বেচারী গত তিন দিন তিন রাত একটুও ঘুমোয়নি। অন্য প্রাণীও কেউ ছিল না যে, ওকে একটু রিলিভ করে।

বেল টিপতে ঠাকুর দরজা খুলল। বসবার ঘরে ঢুকতেই মুন্নীর গলা শুনতে পেলাম বেডরুম থেকে। মুন্নী ডাকছে তা, তা ও তা। আধো আধো গলায় করুণ স্বরে ডাকছে মুন্নী। তা, তা, তা।

এমন সময় রিনির গলা শুনলাম, রাগ রাগ গলা। রিনি বলল, খুব বকব। চুপ করো, চুপ করো বলছি। তা তা করবে না, খুব বকব।

দেখলাম ঠাকুরের মুখটা ফ্যাকাশে।

ওকে শুধালাম : কী হয়েছে রে?

ঠাকুর বলল, প্রমীলাকে বৌদি তাড়িয়ে দিয়েছে।

সে কি? অবাক হয়ে বললাম আমি।

রিনি খাটে বসেছিল, মুন্নীকে পাশে শুইয়ে।

আমাকে ঢুকতে দেখেই বলল, তোমার পেয়ারের আয়াকে একটু আগে তাড়ালাম।

আমার খুব রাগ হয়ে গেল। বললাম, কারণটা কী?

রিনি বলল, কারণ নিশ্চয়ই একটা ছিল। এটা আমার ব্যাপার। ঘর-গেরস্থালীর ব্যাপার। সবতাতে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে পারব না।

তারপর একটু পরে নিজেই বলল, আমার মুখে মুখে কথা বলছিল, অনেকদিন থেকেই বলছিল, তার ওপর মুন্নীটার স্বভাব একেবারে নষ্ট করতে বসেছিল।

আমি বললাম, প্রমীলা তিন রাত তিন দিন এক ফোঁটা বিশ্রাম পায়নি, ঘুমোয়নি একটুও। কাজটা কি তুমি ভালো করলে? ওকে কি ফিরিয়ে আনা যায় না?

রিনি চড়া গলায় বলল, ওকে ফিরিয়ে আনলে আমিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

আমি কোনও কথা বললাম না। নিজের ঘরে চলে গেলাম।

সে রাতে আমি খাইনি। রিনির সঙ্গে তিন দিন কথা বলিনি, কিন্তু তাতে কারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি।

।।৩।।

প্রমীলার জায়গায় নতুন আয়া এসেছে নেপালি। তার নাম কাঞ্চী। বয়সে প্রমীলার চেয়ে ছোট— দেখতেও প্রমীলার চেয়ে ভালো।

মুন্নীর সব কাজ এখন সে-ই করে। সকাল বিকেল বেড়াতে নিয়ে যায়। 'নিনি-বাবা-নিনি, মাখন-রোটি-চিনি' বলে মুন্নীকে ঘুমও পাড়ায়। মুন্নী প্রথম ক'দিন মাঝে মাঝে তা, তা, করে ডেকে উঠত। ইদানীং একবারও ডাকে না।

মাঝে মাঝে ভাবি মেয়েটাও কি তার মায়ের মতোই অকৃতজ্ঞ?

কাজকর্মের অবকাশে মাঝে মাঝে প্রমীলার কথা মনে পড়ে। খুব ইচ্ছা করে, যদি পথে ঘাটে কোথাও দেখা হয়ে যায় ওর সঙ্গে তাহলে ওর হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে নেব, ওর জন্য যদি কিছু করতে পারি তা করব। প্রমীলা কোথায় গেছে তা আমি জানি না। কেউ জানে না। তার পুরো ঠিকানাটাও আমাদের কাছে নেই।

জানি না, রিনি হয়তো তার মেয়ের ভালোর জন্যই প্রমীলাকে তাড়িয়েছিল। হয়তো তার হিসাবই ঠিক।

কিন্তু এও জানি না, জগতে এবং জীবনে যা কিছু ঘটে সবকিছুই হিসেবের ভিতরে পড়ে কি না। প্রমীলার মমতা, প্রমীলার চোখের জলও তো হিসেবের বাইরেই ছিল।

আমার ভারী ভয় করে। প্রমীলার চোখের জলে মুন্নীর কোনও অভিশাপ লাগবে না তো! পরক্ষণেই মনে হয় মুন্নীর 'তা' কি কখনও মুন্নীর কোনও ক্ষতি করতে পারে?

অনেকদিন হয়ে গেছে প্রমীলাকে তাড়ানোর দিন থেকে কিন্তু আজও তার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়নি। সে সুযোগ আসেনি আমার।

প্রমীলা কি কলকাতাতেই আছে? না কি চলে গেছে ডায়মন্ডহারবার লাইনে তার গরিব ভাইয়ের আশ্রয়ে?

না কি আবারও ভুল করে কোনও নতুন মুন্নীকে বুকে নিয়ে তার বুকের উত্তাপে তার 'তা', কী 'থা', কী 'দা' হয়েছে সে?

ব্রন্টি

দিনের কাজ প্রায় শেষ, এবার উঠব অফিস থেকে। ঘড়িতেও সাড়ে পাঁচটা বাজে। গজেন আর ঘোষ ছাড়া আর কেউই নেই এখন। আমি উঠলেই জমাদার ঘর পরিষ্কার করবে। দারোয়ান আজকের মতো তালা-টালা লাগিয়ে দিয়ে যাবে বাইরে। এমন সময় ইন্টারকম-এ ঘোষ বলল, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, স্যার। বলছেন, আপনার বন্ধু। নাম বরুণ চ্যাটার্জি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।

বরুণ চ্যাটার্জি? আমার বন্ধু?

মনে পড়ছে না ঐ নামের কোনও বন্ধুকেই। রাতে সাড়ে সাতটাতে বলা নেই কওয়া নেই অফিসে এসে হাজির হল কে? কী দরকার? আমি চিনিই না। বলে দাও, এমন অসময়ে দেখা হবে না। আমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাব। তুমি কি জানোনা যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া আমি কারও সঙ্গেই দেখা করি না? বলে দাও ওঁকে।

পরমুহূর্তেই আবার ইন্টারকম চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠল।

উনি যেতে চাইছেন না স্যার। বলছেন, কোনও কাজে আসেননি, এমনিই এসেছেন। আপনার সঙ্গে কলেজে পড়তেন নাকি! ওঁর ডাকনাম ব্রন্টি!

ব্রন্টি? ও হো ব্রন্টি! তাই বলো। কিন্তু তবুও...

আচ্ছা, দু-মিনিট লাগবে আমার। আমি ডিকটেটেড ম্যাটারগুলো দেখে, সই করে দিয়েই ডাকছি। একটু বসতে বলো।

এমিলি ব্রন্টির উইদারিং হাইট্স পড়া আর ব্রন্টির সঙ্গে পরিচয় আমার প্রায় একই সময়। তাই-ই ওর নামটি এ জীবনে ভোলার নয়। টাইপ-করা চিঠিগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতে ভাবছিলাম। ব্রন্টি! ব্রন্টির ভালো নাম যে বরুণ চ্যাটার্জি, তা ভুলেই গেছিলাম। মনে থাকার কথাও ছিল না। আমরা সকলেই ওকে ব্রন্টি বলেই ডাকতাম।

বন্ধু বলতে ঠিক যা বোঝায়, ও তা ছিল না। শুধু আমারই নয়। ও কারওরই বন্ধু ছিল না। কারও বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা বা মানসিক সমতা ওর ছিল না। ক্ষমতাও বোধহয় ছিল না। কলেজে প্রথম দু-বছর শুধু শুধু একসঙ্গে কতগুলো কমন ক্লাস করেছি। ব্রন্টি চিরদিনই ভুলো-ভালা। ট্রাউজারের মধ্যে এমনভাবে শার্টটাকে গুঁজত যে, পিছন দিকে অথবা সামনে দিকেও অনেকখানি শার্ট বেরিয়ে থাকত। যতদূর মনে আছে, খুব বড় পরিবারের অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল ও। ওদের প্রাসাদের মতো পৈতৃক বাড়িতেও গেছিলাম একদিন। চমৎকার অ্যাকসেন্টে ডান হাতের তর্জনী নামিয়ে কথা বলত। বেশিই ইংরেজিতে। কিন্তু ওর বেশির ভাগ কথারই কোনও মানে ছিল না। মনে হত, ও কাল্পনিক কোনও সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছে।

আমার আর এক সহপাঠী, রুদ্র, গত সপ্তাহে একদিন ফোন করেছিল বম্বে থেকে। নানা কথার পর বলছিল, ব্রন্টির নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অবশ্য জানি না, কবেই বা ওর মাথার ঠিক ছিল!

— তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি রিসেন্টলি?

— না তো! কলেজ ছাড়ার পর আর দেখাই হয়নি। কী করে রে ব্রন্টি এখন? রুদ্রকে শুধিয়েছিলাম।

— করার মতো কিছুই তো করত না। বি-এ পরীক্ষাটাও তো দিল না শেষ পর্যন্ত! কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিল হঠাৎ। মনে নেই তোর?

টাইপ-করা চিঠিগুলো সব সই করে গজেনকে ডেকে বললাম, কাল সব যাবে ডাকে। আর যিনি ঘোষবাবুর কাছে বসে আছেন, তাঁকে এবারে ডাক। ঘোষবাবুকেও চলে যেতে বল। তুইও ব্রিফকেসটা ড্রাইভারকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যা। আমি একটু পরই উঠব। দারোয়ানকে বলে যাস।

চেয়ার থেকে উঠে দরজা খুলে দেওয়ার আগেই ব্রন্টি ঢুকল। চেহারাটা অবিকল সেইরকমই আছে, তবে রোদে জলে ময়লায়, তেলচিটে, এই্ই যা। চুলে ও জুলপিতে পাক ধরেছে যদিও, কিন্তু বয়সের ছাপ পড়েনি এখনও তেমন। নোংরা শার্ট আর ট্রাউজার। শার্টটা ঠিক সেইরকমভাবে গোঁজা। সামনে পেছনে খাবলা খাবলা বেরিয়ে আছে।

ব্রন্টি বলল, হাল্লো নাটু, হাউ নাইস টু হ্যাভ মেট উ্য আফটার এইজেস।

বললাম, বোসো বোসো।

ও বসে বলল, থ্যাঙ্কস্। হাউ ইজ লাইফ?

— চলে যাচ্ছে। নাথিং টু গ্রাম্বল অ্যাবাউট।

— খুব সুখী তাহলে। ইস্স সুখী হওয়া কী কঠিন! আমি যদি হতে পারতাম!

— তুমি কী করছ এখন ব্রন্টি?

— আমি? সেইমথিং— । সেইম ওল্ড থিং।

— কোথায় আছ তুমি? আই মিন, কোন কোম্পানিতে? না-কি ব্যবসা-ট্যবসা? বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী?

ব্রন্টি সেই ছেলেবেলারই মতো আমার দু-চোখে ওর দু-চোখ রেখে নির্ভেজাল গলায় বলল, আছি মানে, আছি ঠাকুর্দারই দোতলার বারান্ডারই এক কোণে। এখন সবই ভাগাভাগি হয়ে গেছে। থাকার ঘর, ভালোবাসা, মন, হৃদয়ের তাপ; সব। ছোটকাকার সখের কুকুরের নাতির নাতি আর আমার থাকার জায়গা হয়েছে একই কোণে। ফার্স্ট ক্লাস আছি নাটু। কুকুরের ক্যারেকটার স্টাডি করছি, একেবারে খুবই কাছ থেকে। কুকুরটা একেবারে ডোসাইল মানুষদেরই মতো। একটা থিসিস তৈরি করব ঠিক করেছি। আ কমপারেটিভ স্টাডি।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকেই ও বলল, এক গ্লাস জল হতে পারে?

বিব্রত হয়ে বললাম, ইস্স, সকলেই চলে গেল যে। আচ্ছা, আমিই দিচ্ছি। একটু দাঁড়াও—

ঘরের কোণের ছোট্ট ফ্রিজ খুলে ওকে জল ঢেলে দিলাম।

ফ্রিজটা যখন খুললাম, তখন ব্রন্টি বলল, কিছু খাবার হতে পারে? যা হোক কিছু? আমি জেনারেলি লাঞ্চটা ফিরপোতেই করি। আজ করা হয়নি। সময়ই হয়নি।

ফিরপো? অবাক হলাম, আমি। মনটাও খারাপ হয়ে গেল ফিরপোর কথাতে। এখন একটা বাজার বসেছে সেখানে। কলকাতা যদিও ফিরপো ছাড়া কানা হয়ে গেছে কিন্তু কবে বন্ধ হয়েছে ফিরপো? বছর কয়েক হতে চলল। ব্রন্টির মাথা সত্যিই খারাপ।

লজ্জিত গলায় বললাম, খাবার? না, খাবার তো রাখি না ফ্রিজে। শুধু চিজ আছে একটু, খাবে?

— চিজ খাই না। আরে! মাখন আছে দেখছি এক প্যাকেট। হতে পারে?

— তাই? আছে বুঝি? আমার পার্টনার রেখেছেন তাহলে। ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কিটে মাখিয়ে খান। এগিয়ে দিতে দিতে, অ্যাপোলজিটিক্যালি বললাম আমি।

— খাব, খাব। রোজই মাখন খাওয়া উচিত আমার। জানো, নাটু, শরীরে খুবই লাবণ্যর অভাব ঘটেছে। লাবণ্য তো বিয়েও করল না আমাকে। সে সব ছোটবেলার কথা। তোমাকে কি কখনও বলেছিলাম লাবণ্যের কথা? জানি না। লাবণ্যর কোনও সাবস্টিটিউট হয় না; হল না। দাও, মাখন দাও। লাবণ্য। হাঃ হাঃ। আমাদের ছিল কাফ-লাফ। আজকাল তো ডগ আর বিচদের যুগ। কি বল? হিঃ হিঃ। ডোন্ট্যু থিংক সো?

একমুহূর্ত চুপ করে থেকেই বলল, একটু প্রেম, ভালোবাসা হতে পারে?

এ কথার উত্তর হয় না। চুপ করেই রইলাম।

ব্রন্টি মাখনের প্যাকেটটা খুলে, চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেই, বলতে গেলে প্রায় চুষেই পুরো প্যাকেটটা একেবারে সড়াৎ করে খেয়ে ফেলল, আমি ডিশ চামচ বের করার আগেই। তারপর যেটুকু মাখন হাতে লেগেছিল, সেটুকুও দুগালে মেখে নিয়ে বলল, ন্যাপকিন দেবে নাকি একটা?

কাগজের ন্যাপকিন দেওয়ার আগেই ও জামাতে ও ট্রাউজারে হাত মুখ সব মুছে ফেলল। চোখ কুঁচকে বলল, শার্ট আর ট্রাউজারটাও একটু লাবণ্যময় হোক। কি বল? হোক। লাবণ্যনির্মূল জীবন অন্তত আমূল-লাবণ্যে ভরে থাকুক। আ-মূল। মাই ফুট। ওয়াট আ সাবস্টিটিউট। দ্যাট লাবণ্য; অ্যান্ড দিস।

মনে পড়ে গেল, কলেজে থাকাকালীন ব্রন্টি আধুনিক কবিতা লিখত। ও একবার লিখেছিল; 'প্রিয়তমা, দেখা হবে আমাদের নিশ্চয়ই গতকাল।'

রোজই মাখন খাওয়া উচিত আমার। জানো, নাটু, শরীরে খুবই লাবণ্যর অভাব ঘটেছে। লাবণ্য তো বিয়েও করল না আমাকে। সে সব ছোটবেলার কথা। তোমাকে কি কখনও বলেছিলাম লাবণ্যের কথা? জানি না। লাবণ্যর কোনও সাবস্টিটিউট হয় না; হল না।

গ্রেট পোয়েট! আমাদের ব্রন্টি! প্রমিস ছিল; কারণ ওর মধ্যে দুর্বোধ্যতার গ্রেটনেস ছিল।

মনে পড়ে গেল, একদিন লাইটহাউস সিনেমার উল্টোদিকে বইয়ের দোকান থেকে 'দ্যা ফ্লাইট অফ দ্যা পাইড হর্নবিলস্' বলে একটা পেপারব্যাক বই হঠাৎ কিনে তাতে ও নিজে হাতে লিখে দিয়েছিল: 'টু ডিয়ার নাটু। আই ক্যুড ডু নো বেটার এন্ড দিস আই বিলিভ!'

ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, pied hornbills সম্বন্ধে তোমার বুঝি খুব ইন্টারেস্ট?

ও বলেছিল, দুস্‌স। কে জানে? কোনও পাখিটাখি হবে হয়তো। শিংওয়ালা কোনও জানোয়ারও হতে পারে। হু কেয়ারস?

— সে কি? তাহলে, হঠাৎ আমাকে এই বইটি কিনে প্রেজেন্ট করলে?

— জানো না? আজ বোদলেয়ারের জন্মদিন যে! প্রত্যেক কবিকেই আজ উদার হতে হয়।

দিস ইজ মাই ওয়ে অফ রিমেম্বারিং দ্যা পোয়েট।

আড়াইশো গ্রাম মাখন খেয়ে লাবণ্যময় হয়ে উঠে ব্রন্টি বলল, তোমার ছেলেমেয়ে কী?

— মেয়ে বড়। ছোট ছেলে।

— মেয়ে কত বড়? বিয়ে দিয়েছ?

— বয়স হয়নি মেয়ের। মাত্র এগারো বছর। তাছাড়া, বিয়ে তো আস্তে আস্তে উঠেই যাচ্ছে। এখন তো লিভ-টুগেদারের দিন।

— জানি। তবু, আমি পুরনো দিনের লোক। আমি বিয়েতে আজও বিশ্বাস করি। আমি কিন্তু বিয়েই করব। এবং করলে, তোমায় নেমন্তন্ন করব। তোমার মেয়েকেও।

— কবে হবে? তোমার বিয়ে?

— হাঃ? দ্যাট্‌স আ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন। লাবণ্য নেই। নো হোয়্যার ইন দ্যা ওয়ার্লডে। আই হোপ, য়্যু নো, হোয়াট আই মিন। লাবণ্য ইজ আ মাচ ওয়াইডার, ডিপার; ওয়ার্ড। লাবণ্য, বুঝলে নাটু; শি ইজ আ সিম্বল। শি ইজনট জাস্ট মাই গার্ল। অর, ফর দ্যাট ম্যাটার; এনিবডিজ এলসএস গার্ল ইদার। শি ইজ আ সুপারলেটিভ এলিমেন্ট। আ কনসেপ্ট, হু মুভ্‌স আওয়ারসেলভস ফ্রম উইদিন। মুভ্‌স হেভেন অ্যান্ড আর্থ।

একটু চুপ করে থেকে আরেক ঢোক জল খেয়ে বলল, বাই দ্যা ওয়ে, নাটু, আমার এক বোন বলছিল; তুমি নাকি আজকাল গল্প লেখো বাংলায়? ফিকশান? বই লেখো? তুমি? নাটু সেন? অফ ওল পার্সনস?

হেসে বললাম, বাংলা সাহিত্য কোন পর্যায় নেমে এসেছে তাহলে বুঝতেই পারছ। নইলে, নাটু সেনও গল্প লেখে?

— হ্যাঃ। আই লাইক দ্যাট। তোমার সেন্স অফ হিউমার এখনও ঠিক সেইরকমই আছে। ভেরি ফিউ উইল পুল সাচ আ ফাস্টওয়ান অন হিমসেল্‌ফ। গ্রেট! বাই দ্যা ওয়ে! হোয়াট্‌স ইওর নেক্সট প্রজেক্ট? অ্যান অটোবায়োগ্রাফি অফ অ্যান ইডিয়ট? অর ফর আ চেঞ্জ, দ্যাট অফ আ মেগালোম্যানিয়াক?

এরও উত্তর হয় না। প্রজেক্ট দুটিই ভেবে দেখার মতো। তাই চুপ করেই রইলাম।

— গাড়ি কিনেছ?

— ফার্মই দিয়েছে। বহুদিন।

— ফ্ল্যাট কিনেছ?

— না। বাড়িই তৈরি করছি, সল্ট লেকে।

— নিজের বাড়ি? বাঃ।

— ফরেনে গেছ?

— গেছি বারকয়েক।

— কোথায়?

— ব্যাংকক।

— বাঃ। তবে তো গেছই।

— ক্লাবের মেম্বার হয়েছ?

— হ্যাঁ। অনেকদিন।

— কোন্ ক্লাব?

— ক্যালকাটা ক্লাব।

— তোমার বিয়ের তারিখে ইংরেজি কাগজের পার্সোনাল কলামে তোমার শালীর শুভেচ্ছা ছাপা হয়?

— হ্যাঁ। হয় বৈকি। শালী ছাড়া আরও অনেকেরই হয়।

এবার মনে মনে আমি বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম।

— বাঃ। তবে তো তুমি একজন সম্পূর্ণ মানুষ। টোটাল। সাকসেস তো একেই বলে।

কনগ্রাচুলেশন্‌স। জীবনে তোমার আর কী-ইবা চাইবার থাকতে পারে? বাঙালির বাচ্চাদের পক্ষে ঢের করেছ। যুগ যুগ জিও। তোমাকে দেখে ছোটকাকার পেডিগ্রি গ্রেট-ডেন কুকুরের নাতির নাতি পর্যন্ত লজ্জা পাবে। সাব্বাশ।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, তুমি কী করো ব্রন্টি, এখনও খুলে বললে না তো?

— সেইমথিং! বললাম ত। ওঃ খুলে বলিনি বুঝি এখনও। আউচ। দ্যাট বাটার অফ ইয়োরস, রিয়্যাল গুড।

ব্রন্টি আরেকটা ঢেকুর তুলল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, একটা জেলুসেল হতে পারে?

না। নেই। সরি।

ডোন্ট বদার। তোমরা যাকে 'করা' বলো তেমন কিছুই করি না আমি। আই অ্যাম সিম্পলি স্যাম্পলিং লাইফ। গত পঁচিশ বছর ধরে এইই করছি। গ্রেট ফান। নিজের জীবন কুরে কুরে খেয়ে দেখছি ভুট্টার দানার মতো। স্বাদ চাখছি। দেখছি, নোন্তা না মিষ্টি। একসপিরিমেন্ট করে দেখছি, জীবন সলিড, না লিকুইড, না গ্যাসি? আই রিয়ালি ডু স্যাম্পল মাই ও-ওন লাইফ। ঠিক কি ভাবে বলব জানি না; ধরো যদি বলি, অ্যাজ আ টি-টেস্টার স্যাম্পলস টি। সামথিং ভেরি মাচ অ্যাকিন টু দ্যাট। বুঝলে নাটু। আই এনজয় মাইসেলফ, থারোলি, এভরি মিনিট অফ মাই লাইফ। একটা শামুকের মতো, দার্জিলিং-এর রেলগাড়ির মতো। আর তোমরা?

তোমরা সবাই জেট প্লেন। টাকা, নাম, যশ, সিকিওরিটি এসবেরই পেছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছ। তাই না? তোমাদের করুণা করি আমি। তোমরা সকলেই, তুমি, রুদ্র, শ্যামল, আ প্যাক অফ স্টুপিড উলফ্‌স।

— আর তুমি? নিজে? তুমি নিজে কী করছ, করলে জীবনে?

— নাটু। আমি রেললাইনের পাশের টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকা ছোট্ট ননডেসক্রিপ্ট ফিঙে। করার মতো কিছুই করি না আমি। তোমাদের দেখে মজা পাই। তোমরা কেউই জানো না, জানবার সময়ই পেলে না যে, লাইফ ইজ ফর লিভিং। তোমাদের জীবন, জীবনই নয় হে, সে একটা অভ্যেস। ইয়েস। ইয়োরস ইজ ওনলি অ্যান অ্যাপলজি ফর আ লাইফ। হোয়াট্‌ আ শেম্‌।

বলেই ব্রন্টি বলল, কুড়িটা টাকা হতে পারে? খুবই ক্ষিদে পেয়েছে। লাবণ্য তার অস্তিত্বে এবং অনস্তিত্বে মাঝে মাঝেই আমার মধ্যে বড় ক্ষিদের উদ্রেক করে। কী দারুণ বাংলা বললাম, দেখলে। তোমার সঙ্গগুণেই কি? গ্রেট!

কুড়ির জায়গায় ওকে একশোটা টাকা দিলাম। বললাম, তোমাকে বেশিই দিলাম, যাতে

ডোন্ট বদার। তোমরা যাকে 'করা' বলো তেমন কিছুই করি না আমি। আই অ্যাম সিম্পলি স্যাম্পলিং লাইফ। গত পঁচিশ বছর ধরে এইই করছি। গ্রেট ফান। নিজের জীবন কুরে কুরে খেয়ে দেখছি ভুট্টার দানার মতো। স্বাদ চাখছি। দেখছি, নোন্তা না মিষ্টি। একসপিরিমেন্ট করে দেখছি, জীবন সলিড, না লিকুইড, না গ্যাসি?

তোমার বার বার না আসতে হয়। সত্যিই আমি খুবই ব্যস্ত থাকি। উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্টে কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারি না। কিছু মনে করো না ব্রন্টি।

ফেয়ার এনাফ! বলল, ব্রন্টি।

ফেয়ার এনাফ। তুমি কি বলতে চাইছ বুঝেছি। আর হয়তো আসব না। কিংবা কি জানি, আসতেও পারি। তোমার মাখন বড় ভালো। লোকে মাখন দেয়, আমি নেব।

তারপরই বলল, পঁচিশ বছর পর কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। আরও জাস্ট দেড়শোটা টাকা কি হতে পারে? পার ইয়ারে তাহলে দশ টাকা করে হবে। হিসেবে গোলমাল কোরো না। আমার অ্যাডিশানাল ম্যাথ্‌স ছিল। অঙ্কে ভুল হয় না।

— আজই ব্যাঙ্ক থেকে হাজার টাকা তুলেছিলাম। তাই-ই দিতে পারছি তোমাকে।

ব্রন্টি হাসল। বলল, বড়লোকেরা এমন বলেই থাকে। দু-নম্বর কি একনম্বর টাকা তাতে ভিখিরির কি এসে যায়? দু-নম্বর টাকা হাত বদলালেই তিন নম্বর হয়ে যায়, তাও জানো না। নাও, দাও, দাও, আরও দেড়শোটা টাকা দাও, ফর ওল্ড টাইম্‌স সেক। হতে পারে?

টাকা তুলেছিলাম প্রয়োজন ছিল বলেই। তবু নাও।

টাকাটা যেই দিলাম, অমনি তা পকেটে পুরে হঠাৎই উঠে পড়ল ব্রন্টি। ডান হাতের তর্জনী নেড়ে বলল, নেভার এক্সপ্লেইন ইওর কনডাক্ট। ন্যো। নট ইভিন টু ইওরসেলফ্‌!

পরমুহূর্তেই যেমনই আচমকা এসেছিল তেমনই আচমকা উধাও হয়ে গেল ও।

অনেকক্ষণ হতভম্বর মতো চেয়ারে বসে রইলাম। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছিল না। সত্যিই কি ব্রন্টি? আমাদের কলেজের বন্ধু ব্রন্টিই!

নীচে নেমে যখন আমি গাড়িতে উঠলাম, তখন দেখি; ব্রন্টি আমারই অফিসের নীচের জিলিপি-সিঙাড়ার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শুকনো শালপাতার দোনায় দু-হাতে রস আর আলু প্রায় মাখামাখি করে সিঙাড়া জিলিপি খাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে একটা ষাঁড় ওকে নিবিষ্টমনে লক্ষ্য করছে।

ষাঁড়টা হঠাৎ চলি কি চলি না করে চলতে আরম্ভ করল, রাস্তা থেকে আবর্জনা কুড়িয়ে খেতে খেতে। জনস্রোত তাকে ধাক্কা দিতে লাগল। ধাক্কা দিতে লাগল ব্রন্টিকেও। ব্রন্টি তখন তার টুকরো করে ভেঙে খাওয়া নিজের জীবনেরই একটি টুকরোর মতো সিঙাড়া-জিলিপি স্যাম্পলিং করছিল। আমি যেন শুনতে পেলাম, বাঁ হাতের চেটোয় শালপাতার দোনা ধরে ডানহাত দিয়ে খেতে খেতে ও বলছে, লিভিং ইজ গ্রেট ফান। উ্য ওনলি হ্যাভ টু ফ্লোট উইথ ইট। নেভার ট্রাই টু সুইম এগেইনস্ট লাইফ।

ষাঁড়টা চলেছে সোজা। এবার সেন্ট্রাল এভিনিউতে গিয়ে পড়বে। তার মুখ বড়বাজারের দিকে।

বি আ ফ্লোটসাম।

কে যেন বলল, কানের পাশে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। টাকাটা কোনও ব্যাপারই নয়। ও আবারও টাকা চাইবে, শুধুমাত্র এই ভয়েই ব্রন্টিকে আমি আসতে বারণ করিনি। ও আসলে ভীষণ, ভীষণই খারাপ লোক।

দারোয়ানকে বলে দিতে হবে যাতে ওকে আর কোনওদিনও ঢুকতে না দেয়।

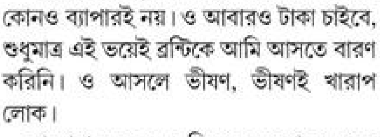

◆

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায়
সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস
'রাজ্যপাট' প্রকাশিত হল না।

বইবাজার

সাগর চৌধুরী

ওপরের ছবিতে কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে বইবাজার, যেখানে বারো মাস-ই উৎসব বইয়ের — নিজস্ব চিত্র

বিশ্বের বৃহত্তম পুরনো বইয়ের বাজার বিষয়ে লিখব। কিন্তু সেটা বিদেশে। আমাদের চেনা শহর দিয়ে শুরু করি। কলকাতার কলেজ স্ট্রিট এলাকা একাধারে বইপাড়া এবং বইবাজার সে-কথা তো কলকাতাবাসী মাত্রেরই জানা। শহরের প্রায় সমস্ত ছোট-বড়, নামী-অনামী, প্রাচীন-নবীন পুস্তক প্রকাশকদের ঠিকানা এই এলাকায়, এবং এই প্রকাশকরা ছাড়াও অন্যান্য সহস্রাধিক পুস্তক ব্যবসায়ীর দোকান-গুদাম, ছাপাখানা, বই বাঁধানোর দফতরিদের কারখানাও কলেজ স্ট্রিটের আশেপাশে। কলেজ রো, বেনিয়াটোলা লেন, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট ইত্যাদি সবই এক কথায় কলেজ স্ট্রিট। সুপ্রাচীন এই রাস্তাটি মধ্য কলকাতার বউবাজার এলাকা থেকে শুরু হয়ে উত্তরে মহাত্মা গান্ধী রোডের (সাবেক হ্যারিসন রোড) মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত, যার পর থেকে আরও উত্তরে শ্যামবাজার পর্যন্ত এর নাম বিধান সরণি (সাবেক কর্নওয়ালিস স্ট্রিট)। কলকাতার বিখ্যাত ও ঐতিহ্যশালী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটাই, যেমন ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ (বর্তমানে

বিশ্ববিদ্যালয়), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ, ডেভিড হেয়ারের নামধন্য হেয়ার স্কুল, হিন্দু স্কুল, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এই রাস্তার উপরেই অবস্থিত। সামান্য হাঁটাপথের দূরত্বে মহাত্মা গান্ধী রোডের ওপরে রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, যার পুরনো নাম রিপন কলেজ— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত' উপন্যাসের তরুণ অপু কলকাতায় পড়তে এসে এই কলেজেই ভর্তি হয়েছিল, কারণ প্রেসিডেন্সি, মেট্রোপলিটান (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ) ও সিটি কলেজ ঘুরে দেখার পর 'অবশেষে রিপন কলেজের বাড়ি তাহার কাছে বেশ ভালো ও উঁচু মানের মনে হইলো'। তারপর বিধান সরণি বরাবর কয়েক পা এগিয়ে গেলেই বিডন স্কোয়্যার বা চলতি 'হেদুয়া' নামের জলাশয়টির (এখনকার পোশাকি নাম আজাদ হিন্দ বাগ) এক পাশে ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাবিদ জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন-এর স্মৃতি বহনকারী ভারতের প্রথম মেয়েদের কলেজ বেথুন কলেজ এবং অন্য পাশে স্কটল্যান্ড থেকে আগত ধর্মযাজক অ্যালেকজান্ডার ডাফ-এর উদ্যোগে ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কটিশ চার্চ কলেজ, একেবারে গোড়ায় যার নাম ছিল জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন। অতএব সংগত কারণেই রাস্তার নাম কলেজ স্ট্রিট। কয়েক দশক ধরে কলকাতা শহরের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া ছাত্রদের ও বুদ্ধিজীবীদের, সেই সঙ্গে উঠতি কবি-সাহিত্যিক-রাজনীতির শিক্ষানবিশদের আড্ডা হিসেবে পরিচিত ইন্ডিয়ান কফি হাউসও কলেজ স্ট্রিটের গায়েই, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিটের প্রায় শুরুতে শতবর্ষের প্রাচীন অ্যালবার্ট হল নামে ভবনটির দোতলা ও তিনতলা জুড়ে। বস্তুত, ১৯৪২ সালে চালু হওয়ার পর থেকে আজও পর্যন্ত কলেজ স্ট্রিটের এই কফি হাউজকে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবি ও সাহিত্যিকদের, জনপ্রিয় মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতার, এক সময়ের বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতার সৃতিকাগৃহ বললেও সম্ভবত অত্যুক্তি করা হবে না। এঁদের কাউকে কাউকে এখনও মাঝেমধ্যে কফি হাউসের বর্তমান প্রজন্মের আড্ডাধারীদের পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের বিপরীত দিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে ওই এলাকার আর একটি ল্যান্ডমার্ক— কলেজ স্কোয়্যার, বর্তমানে যার নাম বিদ্যাসাগর সরোবর। চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্রাকৃতি এই পুষ্করিণীটির চলতি নাম কী কারণে 'গোলদিঘি' তা আমি জানি না। পাঠকদের কেউ কি কোনও সূত্র দিতে পারেন?

কলেজ স্ট্রিটের পুরনো ও প্রধান পুস্তক প্রকাশকদের কয়েকটির নাম কলকাতা তথা বাংলার পুস্তকপ্রেমীদের ও প্রায় সমস্ত সাধারণ মানুষের সুপরিচিত। যেমন সংস্কৃত কলেজের মুখোমুখি অবস্থিত সিগনেট প্রেস, ১৯৪৩ সালে ডি কে (দিলীপকুমার) গুপ্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এক সময়ে এই প্রকাশনা সংস্থার বইপত্রের অলংকরণের কাজ করেছেন সত্যজিৎ রায়। তারপর দে'জ পাবলিশিং, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি, আনন্দ পাবলিশার্স, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স ইত্যাদি। এদের পাশাপাশি, মননশীল সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য নামগুলোর মধ্যে রয়েছে 'অনুষ্টুপ' (অন্যান্য বইপত্রের সঙ্গে একই নামের ত্রৈমাসিক পত্রিকাটির প্রকাশক) এবং অবশ্যই 'সুবর্ণরেখা'। শেষোক্ত সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৯৬২ সালে। কমলকুমার মজুমদার, নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় 'এক্ষণ' নামে পাঠকপ্রিয় সাময়িক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে এসেছে সুবর্ণরেখা থেকে। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু করে কিছুদিন আগে পর্যন্তও শান্তিনিকেতনে সুবর্ণরেখার একটি বিক্রয়কেন্দ্র ছিল, যেটি খোলার সক্রিয় সাহায্য করেছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক অম্লান দত্ত। আমি নিজেও শান্তিনিকেতনে গিয়ে দু'-তিনবার এখান থেকে বইপত্র, সিডি ইত্যাদি কিনেছি। তবে যতদূর শুনেছি, গত বছরের মে মাসে ইন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু মতান্তরের দরুন এই দোকানটি আপাতত বন্ধ। প্রসঙ্গত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের আশুতোষ হলে রয়েছে সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন বুক পাবলিশিং, যেখানে পুস্তক প্রকাশনায় নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম সমাপন করার পর শিক্ষার্থীদের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়ে থাকে।

ইংল্যান্ডের হে-অন-ওয়াইয়ে সারিবদ্ধ বইয়ের দোকান

শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়িই একটা বইয়ের দোকান, এমনকী প্রত্যেকটা 'পাব' বা পানশালা এবং রেস্তোরাঁর ভেতরেও অন্তত একটা দেওয়ালের গায়ে লাগানো তাকে পুরনো বই।

হে-অন-ওয়াইয়ে প্রাচীনতার কুয়াশা-মাখা বই-বিপণি

কলেজ স্ট্রিটের বইবাজার সারা ভারতে সবচেয়ে বড়। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ছাড়াও, দেশের অন্যান্য প্রায় প্রত্যেকটি ভাষায় কোনও না কোনও বিষয়ে লেখা বই, কিছু না কিছু পত্রপত্রিকা এই বাজারে পাওয়া যায়। আর কলেজ স্ট্রিটের দু'-ধারে ফুটপাতের কিনারাবরাবর, প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এর গায়ে এবং আশপাশের সংকীর্ণ গলিগুলোতে অসংখ্য ছোট ছোট খুপরির মতো দোকানে কেনাবেচা হয় 'সেকেন্ড হ্যান্ড' বা হাতফেরতা পুরনো বই। বিভিন্ন ভাষার ক্ল্যাসিক বা ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে শুরু করে সমকালীন বইপত্র, যাবতীয় বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক ও 'রেফারেন্স' বই তো আছেই, বহু দুষ্প্রাপ্য 'আউট অব প্রিন্ট' বই, এমনকী পাণ্ডুলিপির খোঁজও পাওয়া যায় এইসব দোকানে, প্রায়শই অবিশ্বাস্য কম দামে। বস্তুতপক্ষে কলেজ স্ট্রিটের এই বাজার বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পুরনো বইয়ের বাজার। ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'টাইম'-এর ২০০৭ সালের একটা সংখ্যায় প্রকাশিত 'বেস্ট অব এশিয়া' তালিকায় কলকাতার কলেজ স্ট্রিট সম্পর্কে এই তথ্য জানিয়ে তাকে ভারতের তথা বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত আকর্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল।

ক্রেতাদের জন্য ছোট, মাঝারি আর বড় এই তিন আকারের ব্যাগ থাকত আড়াই পাউন্ড, পাঁচ পাউন্ড আর দশ পাউন্ড দামে। ক্রেতারা যে-কোনও দামের ব্যাগ কিনে তার মধ্যে যতগুলো ইচ্ছে যে-কোনও দামের বই ঢোকাতে পারতেন।

তবে এক নম্বর বৃহত্তম পুরনো বইবাজার হল গ্রেট ব্রিটেন-এর ইংল্যান্ড-ওয়েলস সীমান্ত অঞ্চলের ছোট্ট শহর হে-অন-ওয়াই (Hey-on-Wye) বা 'ওয়াই নদীর তীরে অবস্থিত হে'। কোনও নদীর তীরে এই ধরনের নামের শহর বা গ্রাম বিলেতে আরও আছে। যেমন উইলিয়াম শেক্সপিয়ার-এর জন্মস্থান স্ট্র্যাটফোর্ড-এর পুরো নাম স্ট্র্যাটফোর্ড-আপন-এভন (Stratford-upon-Avon) বা 'এভন নদীর তীরে অবস্থিত স্ট্র্যাটফোর্ড' অথবা দক্ষিণ অক্সফোর্ডশায়ার কাউন্টিতে টেমস নদীর তীরে হেনলি-অন-টেমস (Henley-on-Thames)। হে-অন-ওয়াই কালক্রমে পুস্তকপ্রেমীদের স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার শুরু খুব বেশিদিন আগে নয়, ষাটের দশকের গোড়ার দিকেই, ১৯৬১ সালে। ওই আধা-গ্রাম আধা-শহরটির একজন বাসিন্দা রিচার্ড বুথ প্রাচীন জিনিসপত্র—antiques—বিক্রির একটা দোকান খোলেন, যেখানে তিনি কিছু পুরনো বইও রেখেছিলেন। তাঁর দোকানের প্রাচীন জিনিসপত্র তেমন বিক্রি না হলেও বইগুলো কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে সবই বিক্রি হয়ে যায়। এতে যারপরনাই উৎসাহিত হয়ে বুথ আরও পুরনো বইপত্র জোগাড় করে দোকানে রাখা শুরু করলেন এবং সেগুলোও চটপট বিক্রি হতে থাকল। তারপর তিনি শহরের যাবতীয় খালি এবং বিক্রির জন্য বাজারে রয়েছে এমন ঘরবাড়ি কিনে ফেলে সেগুলোতে পুরনো বইপত্র মজুত করতে লাগলেন। বাতিল একটা সিনেমা হল, দমকলের খালি গ্যারাজ, পরিত্যক্ত একটা ছোট গির্জা, এমনকী শহরের প্রান্তে একটা প্রাচীন, ভাঙাচোরা ক্যাসল বা প্রাসাদও বুথ কিনে ফেললেন এবং সেগুলোর প্রত্যেকটাকে ভরিয়ে তুললেন রাশি রাশি পুরনো বইপত্র, দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে। ওই প্রাসাদের জীর্ণ আসবাবপত্র ইত্যাদির সঙ্গে বেশ কিছু পুরনো বই, নকশা, মানচিত্র আগে থেকেই ছিল। কিছু দিনের মধ্যেই বুথ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং প্রচারপত্র ছাপিয়ে ও বিলি করে নিয়মিত ঘোষণা দেওয়া শুরু করলেন যে তিনি হচ্ছেন ''The World's Largest Second-hand Book Seller''—'বিশ্বের সবচেয়ে বড় হাতফেরতা বই বিক্রেতা'। অচিরেই তিনি সর্বত্র পুস্তকপ্রেমীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন এবং নিকটবর্তী বার্মিংহ্যাম-ম্যানচেস্টার-ব্রিস্টল নগরাঞ্চল ছাড়াও লন্ডন থেকে, এমনকী ব্রিটেনের বাইরের নানা জায়গা থেকেও, আগ্রহী পাঠক, গবেষক, রসগ্রাহী লোকজনের ভিড় ক্রমে বাড়তে শুরু করল ওয়াই নদীর তীরের এই অখ্যাত, প্রায়-অপরিচিত ছোট্ট শহরটিতে। সাধারণ কৌতূহলী 'ট্যুরিস্ট' বা পর্যটকদের কাছেও অন্যতম আবশ্যিক গন্তব্যস্থল হয়ে দাঁড়াল হে-অন-ওয়াই। বর্তমানে শহরের প্রায় প্রতিটি বাড়িই একটা বইয়ের দোকান, এমনকী প্রত্যেকটা 'পাব' বা পানশালা এবং রেস্তোরাঁর ভিতরেও অন্তত একটা দেওয়ালের গায়ে লাগানো তাকে সাজানো কিছু পুরনো বই।

এই বইবাজারের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ একসময়ে ছিল 'ব্যাগ অফ বুকস' নামে একটা দোকান। 'একসময়ে ছিল' বলছি এজন্য যে, অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই দোকানটি এখন আর নেই। কী কারণে জানি না,

এটার মালিক কয়েক বছর দোকান চালানোর পর ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন। এই দোকানে একটা, দুটো বা তিনটে-চারটে করে বই বিক্রি করা হত না, যেমন আর সব দোকানে হয়। তার বদলে ক্রেতাদের জন্য ছোট, মাঝারি আর বড় এই তিন আকারের ব্যাগ থাকত আড়াই পাউন্ড, পাঁচ পাউন্ড আর দশ পাউন্ড দামে। ক্রেতারা যে-কোনও দামের ব্যাগ কিনে তার মধ্যে যতগুলো ইচ্ছে যে-কোনও দামের বই ঢোকাতে পারতেন, শর্ত ছিল একটাই— বই ঢোকাতে গিয়ে ব্যাগ যেন একটুও ছিঁড়ে না যায়। এইভাবে আড়াই পাউন্ড দিয়ে যতগুলো বই কেনা যেত স্বাভাবিকভাবে তাদের দাম, পুরনো বই হলেও, হয়তো পঁচিশ বা ত্রিশ পাউন্ড কিংবা পাঁচ পাউন্ডের বদলে পাওয়া যেত পঞ্চাশ পাউন্ড দামের বই অথবা দশ পাউন্ড খরচ করে হয়তো একশো পাউন্ড দামের বই। বই কেনাবেচার এমন মৌলিক ও ইন্টারেস্টিং কায়দা দুনিয়ার অন্য কোনও বাজারে দেখা গিয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পুরনো বই কেনাবেচার দুনিয়ায় রিচার্ড বুথের এই অভাবনীয় সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে আরও বহু পুস্তক ব্যবসায়ী এই শহরে এসে জড়ো হতে লাগল। এখানে দোকানঘরের ও গুদামের ভাড়া তখনও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে অনেক কম হওয়া তাদের আকর্ষণের আর একটা কারণ। 'অক্সফ্যাম' নামে ব্রিটেনের যে দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি দুনিয়ার প্রায় সর্বত্র সমাজসেবামূলক কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য বিখ্যাত, তারাও একটা পুরনো বইয়ের দোকান খুলল হে-অন-ওয়াই-তে। রিচার্ড বুথ ততদিনে রীতিমতো একজন সেলিব্রিটি, তাঁর খামখেয়ালিপনা, উদ্ভট সব কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা প্রায় প্রবাদে পরিণত। ১৯৭৭ সালের ১ এপ্রিল তারিখে তিনি সবাইকে চমকে দেওয়ার মতো একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন। বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্মের প্রতি এবং ব্রিটেনের ঐতিহাসিক ছোট শহরগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সরকারি ঔদাসীন্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি হে-অন-ওয়াই-কে একটা স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করলেন। নিজেই নিজেকে তিনি এই রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন, সেখানকার অধিবাসীদের যথেচ্ছ বিচরণ ও জীবনযাপনে সাহায্য করার জন্য পাসপোর্ট ও স্থানীয় মুদ্রা চালু করলেন এবং সরকারি টাউন কাউন্সিল বা পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে আবেদন করলেন যে, হে-অন-ওয়াই শহরের চৌহদ্দির মধ্যে যেন মোটরগাড়ির প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, সেই সঙ্গে লোকজনের চলাফেরার জন্য যেন আবার ঘোড়ায় টানা গাড়ি ফিরিয়ে আনা হয় যাতে ঘোড়ার সহিস, আস্তাবলের কর্মী এবং ঘোড়ার পায়ের লোহার নাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাণের কাজে নিযুক্ত কামারদের বেকারত্ব ঘুচিয়ে তাদের জন্য কর্মসংস্থান করা যায়। বাস্তবে অবশ্য এইসব ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি, শহরের মাঝখানের দু'-তিনটি রাস্তা কেবলমাত্র পদচারীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকলেও অন্যত্র মোটরগাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করার দাবি সরকারি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায়নি। বুথের প্রবর্তিত পাসপোর্ট ও মুদ্রাও পর্যটকদের সংগ্রহের স্মারকবস্তু হওয়ার বাইরে অন্য কোনওরকম বৈধতা অর্জন করতে পারেনি। আশির দশকের গোড়ার দিকে এক অগ্নিকাণ্ডে তাঁর প্রাসাদের অনেকটা অংশ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর 'রাজা রিচার্ড বুথ' তাঁর বেশ কিছু সম্পত্তি খোলা বাজারে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। এই সুযোগে ছোট-বড় অন্যান্য পুস্তক ব্যবসায়ীরাও শহরে গুছিয়ে বসতে পারল, এবং 'আর কোথাও না পাওয়া গেলেও এখানে পাওয়া যাবেই' এমন বইবাজার হিসেবে 'হে-অন-ওয়াই'-এর প্রসিদ্ধি বেড়েই চলল।

বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্মের প্রতি এবং ব্রিটেনের ঐতিহাসিক ছোট শহরগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সরকারি ঔদাসীন্যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি হে-অন-ওয়াই-কে একটা স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করলেন।

হে-অন-ওয়াই সাহিত্য উৎসব (Hay-on-Wye Festival of Literature)— যা বর্তমানে ইউরোপের সর্বত্র এবং এই মহাদেশের বাইরেও সুপরিচিত— সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে, এবং প্রতি বছর বিশ্বের নানা দেশ থেকে বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সমাগম ঘটে এই উৎসবে। একজন স্থানীয় অভিনেতা ও থিয়েটার ম্যানেজার নর্মান ফ্লোরেন্স, তাঁর অভিনেতা পত্নী রোডা ল্যুইস এবং তাঁদের ছেলে পিটার ছিলেন উৎসবের প্রথম ও মূল সংগঠক। জনশ্রুতি এই যে পোকার খেলায় জেতামাত্র ১০০ পাউন্ডের মূলধন সম্বল করেই হে

হে-অন-ওয়াই ফেস্টিভ্যাল অব লিটারেচার চত্বরে বইয়ের পৃষ্ঠায় মগ্ন দুই পাঠিকা

এখন ভারতেও আয়োজিত হচ্ছে লিটারারি ফেস্ট। ছবিতে জয়পুর সাহিত্য উৎসবের এক ঝলক

ফেস্টিভ্যালের পরিকল্পনা করেছিলেন নর্মান। চলতি বছরের, অর্থাৎ ২০১৪ সালের হে ফেস্টিভ্যাল, সেইসঙ্গে হে ফিভার চিলড্রেনস্ ফেস্টিভ্যাল (Hay Fever Children's Festival) নামে শিশুদের উৎসব, শুরু হবে ২২ মে তারিখে, চলবে জুন মাসের ১ তারিখ পর্যন্ত।

উৎসবের বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে যেসব লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী উপস্থিত থাকবেন তাঁদের একটা প্রাথমিক তালিকা ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং এইসব অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রিও শুরু হয়ে গেছে। এই তালিকাভুক্ত ব্যক্তিরা হলেন স্টিফেন ফ্রাই ছদ্মনামধারী একজন জনপ্রিয় ব্লগার এবং নানা পুরস্কার বিজেতা লেখক; একাধিক অস্কার-বিজেতা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতা জুডি ডেঞ্চ; সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজেতা লেখক, সম্পাদক ও অধ্যাপক টোনি মরিসন; ইংরেজ সাংবাদিক, টেলিভিশন উপস্থাপক ও যুক্তরাজ্যের লেবার দলের জোন ব্রেকওয়েল; ছদ্মনামধারী আর একজন আমেরিকান লেখক কাসান্দ্রা ক্লেয়্যার (আসল নাম জুডিথ রামেল্ট); ব্রিটিশ লেখক, নাট্যকার ও অভিনেতা, শিশুসাহিত্যে নোবেলের সমতুল্য পুরস্কারবিজেতা (Children's Laureate) জুলিয়া রবার্টসন; গ্রিক-আমেরিকান লেখক ও কলামিস্ট অ্যারিয়ানা হাফিংটন; ইংরেজ চিত্রনাট্যকার, গায়ক, অভিনেতা, তিনটি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অব ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস্ (বাফটা) পুরস্কার, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব টেলিভিশন, আর্টস্ অ্যান্ড সায়েন্স পুরস্কার (এমি অ্যাওয়ার্ড) এবং ব্রিটিশ কমেডি পুরস্কার বিজেতা জেনিফার স্যান্ডার্স; ব্রিটিশ-আমেরিকান লেখক ফ্র্যানচেস্কা সাইমন; এবং ইংরেজ লেখক জ্যাকেলিন উইলসন যিনি শিশুসাহিত্যে তাঁর ব্যাপক ও বৈচিত্রপূর্ণ গবেষণাধর্মী কাজের জন্য, বিশেষ করে দত্তক সন্তানগ্রহণ, বিবাহবিচ্ছেদ, মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি বিষয়ে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। অন্যান্য কয়েকজন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর উপস্থিতিতে আয়োজিত আরও কিছু অনুষ্ঠানের তালিকা জানুয়ারি মাসেই প্রকাশিত হওয়ার কথা। চূড়ান্ত অনুষ্ঠানসূচি প্রকাশিত হবে এপ্রিল মাসে। কয়েক বছর ধরে এই উৎসবে সংগীতানুষ্ঠান এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজনও করা হচ্ছে এবং কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা ছাড়াও বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, পরিবেশবিদ ও বিজ্ঞানীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

ওয়েলস্-এর এই ছোট্ট শহরটিকে গোটা দুনিয়ার পুস্তকপ্রেমীদের অতি প্রিয় তীর্থস্থানে পরিণত করায় রিচার্ড বুথের অবদান অনস্বীকার্য। বুথ এখনও তাঁর প্রাসাদে বাস করেন এবং এই বার্ষিক সাহিত্য উৎসব সংগঠনে ও পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকেন। হে-অন-ওয়াই-কে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার ২১তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৯৮ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে তিনি নিজেই নিজেকে খেতাব দিয়েছেন 'Emperor of All Book Towns'— 'সমস্ত বই-শহরের সম্রাট'। ওই অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরে এই শহরেই প্রথম জন্মগ্রহণ করা স্টিফেন ডেভিস নামে এক ব্যক্তি, এবং ব্রিটেনের কয়েকজন সাবেক মন্ত্রীর সঙ্গে লন্ডনের হে স্ট্রিট থিয়েটারের কয়েকজন কর্মকর্তাও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কয়েকটি শহরের পুরকর্তৃপক্ষের মতো, হে-অন-ওয়াই বইবাজারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এ পর্যন্ত ব্রিটেনের বাইরে ইউরোপের ত্রিশটি শহর এবং আমেরিকারও আরও ত্রিশটি শহর রিচার্ড বুথের চিন্তাভাবনা ও প্রচার-পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে নাইরোবি, ঢাকা, মেক্সিকোর জাকাটেকাস, মালদ্বীপ, ভারতের কেরল রাজ্যের তিরুবনন্তপুরম, বেইরুট, বেলফাস্ট, স্পেনের কার্টাজেনা, আলহামব্রা প্রাসাদ ও সেগোভিয়া এবং দক্ষিণ ওয়েলস-এর ব্রিজঅ্যান্ড, যেখানে উৎসবের মূল স্থান হল অল্পবয়সি অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট সংশোধনাগার 'পার্ক' কারাগার (Parc Prison)। হে-অন-ওয়াই যদিও ওয়েলস-এ পর্যটনের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ, সরকারি ওয়েলস ট্যুরিস্ট বোর্ড-এর কাছ থেকে বিশ্বের বৃহত্তম এই পুরনো বইয়ের বাজার তেমন কোনও আর্থিক সাহায্য বা অনুদান পায় না। তার দরকারও হয় না, অগণিত পুস্তকপ্রেমী এবং উৎসুক পর্যটকদের স্বতঃস্ফূর্ত পৃষ্ঠপোষকতাই বইবাজারের দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট।

বিলেতপ্রবাস জীবনে আমার স্ত্রী উর্মি ও আমি হে-অন-ওয়াই বইবাজারে গিয়েছি তিনবার এবং প্রতিবারই ফিরেছি অগাধ তৃপ্তি নিয়ে। হে-অন-ওয়াই সাহিত্য উৎসবেও একবার যাওয়ার বাসনা ছিল, কিন্তু নানা কার্যকারণে সেটা আর হয়ে ওঠেনি। তবে তা না হলেও এটা মানতেই হবে যে, আমরা সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের মধ্যে যাদের বিশ্বের দুই বৃহত্তম পুরনো বইয়ের বাজার ঘুরে দেখার সুযোগ মিলেছে— বিলেতের হে-অন-ওয়াই এবং কলকাতার কলেজ স্ট্রিট।

বিশ্বের বৃহত্তম এই পুরনো বইয়ের বাজার তেমন কোনও আর্থিক সাহায্য বা অনুদান পায় না। তার দরকারও হয় না, অগণিত পুস্তকপ্রেমী এবং উৎসুক পর্যটকদের স্বতঃস্ফূর্ত পৃষ্ঠপোষকতাই বই বাজারের দীর্ঘায়ু নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট।

সৌজন্য: 'আরেকরকম', ১-১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, সম্পাদক: অশোক মিত্র

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

নীলকণ্ঠ ঘোষাল

কমলহিরের আলো

অধ্যায় ১

পর্ব ২

বুঝতে পারলাম আমার মুখ বন্ধ করার জন্য ওরা এটা করেছে। এভাবে কথা বললে ওরা মনে করে আমি আধ-পাগলামি করছি। এটা পাগলামি? ওরা তাই মনে করে, কী করব! তা যে নয়, প্রমাণ দিলাম— অম্বরিষের গানের সঙ্গে বাজালাম। এতেও যদি মনে করে বাহাত্তুরে হয়েছে আমার, কী বলার আছে! বয়েসেরই দোষ হয়তো-বা। আমি যা, আমি তাই। এটাই আমার কথা বলার ইয়ে— মানে, আমার কথা এমনই।

তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে উঠলাম একটু পরেই— আর থামাথামি নয়, চলুক গান, বাজনা আমার আর থামবে না। বলেই গিটারে ঝালা তুললাম। সকলে হই হই করে উঠল, ঘরে এসে জড়ো হল যারা বাইরে গেছিল।

— হেডমাস্টারমশায়ের আরও দু'খান গান হউক, মন্দ লাগছে নাকো, হউক। যে ছেলেটি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল, তার কথা শোনা গেল। কে বলল বুঝেছে অম্বরিষ, তবু জিজ্ঞাসা করল মুখ না তুলে— আমার কোন গুরু আদেশ দিল?

— রামগরুড়ের ছা। টুক করে প্রমিতার মন্তব্য। বলেই মুখ টিপে চুপ করে গিয়েছে সে। হাসিতে আবার ঘরটা ভরে গেল। কিন্তু বক্তা বিমান হাসল না। এটাই বিমান— কম কথা বলে। ওর অনেক কথায় অন্যে হাসে, ও হাসে না মোটে। তখনই অম্বরিষের গলা জোরে বাজল— শা— ল—

গানে গানে জমে গেল মহড়ার ঘর। অম্বরিষের পর শেখর, তারপর অনেক চাপাচাপিতে প্রমিতাও গাইল। অনেক অনেক গান, শেষে হল সেই কোরাস—

আমরা তো নয় শুধু নাটকের শিল্পী
জীবনের রূপসাজে সাজি বহুরূপী।
মঞ্চে ও নেপথ্যে আমরা রূপকার—
আমরা জ্বালি আলো সমাজের ভাবনার,
আমাদের কাজ তাই জগৎ-ব্যাপী।
জীবনের শিল্প গড়তে যারা চাও
কৃষ্টির কারিগর হতে যারা চাও—
ভালোবাসায় হাতে হাত ধরো এসে শিল্পী।

এই গানটির কথাগুলি আমার, সুর অম্বরিষের। গানটাকে একসময় গ্রুপের গান বা সংগঠনের গীত হিসেবে ঘোষণা করতে চাওয়া হয়েছিল। আমি রাজি হইনি। বলেছিলাম— কী দরকার? যেমন গাওয়া হচ্ছে হোক দরকার মতো, ঘোষণা টোসনার দরকার কী?

গানের পালা শেষ হতেই দেখা গেল নবি, নবদিশা উঠে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। অনেকেই আড়চোখে দেখল, কেউ কিছু বলল না। আমি সোজা চোখেই ওকে দেখলাম, কিছু বলার দরকার মনে করলাম না। অম্বরিষকে দেখলাম, ও না-দেখার চেষ্টা করছে। প্রমিতা চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকাতে নবদিশা অস্পষ্ট ক্ষীণ স্বরে বলল— রিহার্সাল হবে না তো!

অনেকেই উঠে দাঁড়িয়েছে। বেরিয়ে যাচ্ছে না কেউ। কথা বলছে নানারকম। তার মধ্যে রেবন্ত উঠেই মুখ নিচু করে বেরিয়ে গেল, সুড়ুৎ করে

চলে গেল যেন। বোঝা গেল, তাড়া আছে, নবদিশা কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবে।

এবার অম্বরিষ তাকাল, চোখে রোষ ঝকঝক করছে।

এখন ঘরের ভিতরটা খালি খালি, বাইরে রক ভরে গিয়েছে। প্রমিতা ও তার পাশ থেকে ধারা ধীরে ধীরে উঠে রকে চলে গেল।

অম্বরিষকে দেখলাম— ডান পা সতরঞ্চের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুল নিয়ে ব্যস্ত। যেন আঙুলগুলোতে ময়লা জমেছে, সহজে ছাড়ানো যাচ্ছে না।

কোল থেকে নামিয়ে গিটারটা পাশে রাখলাম, ওকে দেখতে দেখতে নিঃশব্দে ঘষটে ঘষটে ওর পাশে গেলাম।

ওর সমান্তরালে মুখ নামিয়ে চাপা গলায় বললাম স্পষ্ট উচ্চারণে— অম্বু, ডোজ বেশি হয়ে যাচ্ছে, ভেবে দেখ।

— ভেবেছি। চোখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকাল অম্বরিষ।

— তাহলে?

— তাহলে কী? হোমোপ্যাথিতে আর হবে না। এই কড়া ডোজেও না হলে এবার সার্জারি। আমি সোজা হয়ে বসলাম। গলাটা এমনিতেই ভারী হল। বললাম ওর দিকে না চেয়ে— রি-অ্যাকশন সইতে পারবি তো? আমরা কেউ গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল নই কারও।

— তা বলে এইটুকু মোর‍্যাল ডোমিনেশন থাকবে না? তাহলে তো— পা গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল অম্বরিষ।

— ওদের ইমোর‍্যালিটির কোনও ইয়ে তোর কাছে আছে? অন্যের মুখে ঝাল খাওয়ার পরে বদহজমের জ্বালা কেমন হয় তোর জানা নেই? জানলে কী হবে? নিজেকে ভুলে যাওয়ার জিন আছে তো আমাদের পরিবেশে, গোঁড়ামির জিন।

শেষের কথাটা আমার স্বগতোক্তির মতো হয়ে গেল। অম্বরিষ হাঁ করে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে— জানা নেই, নাকি কী বললে?

একটু চুপ করে থেকে নরম হয়ে বললাম— তোর মনে নেই? মনে নেই বসন্ত-দয়িতা-চেতাদের কথা? গ্রুপের কাছে তো ওটা ঐতিহাসিক। ভুলে গেলি? ভোলা যায় ওদের ত্রিভুজ সম্পর্কের কথা? ভোলা যায় দয়িতার মতো একটি মেয়ের— বলা উচিত এক নারীর কথা? ভুলে গেলি তুই অম্বু?

মাথা নাড়তে নাড়তে অম্বরিষ উঠে দাঁড়াল। বলল— কিচ্ছু ভুলিনি, সঞ্জুদা। কিচ্ছু ভুলিনি। কিন্তু আমাকে তো টিমটাকে— মানে, পরিস্থিতি অনুযায়ী সব দিক সামলে চলতে হবে। অন্যদের ফিলিংসকে দাম দিতে হবে। তুমি অভিজ্ঞতার কথা বলবে তো? একটা কথা মানবে নিশ্চয়ই— জীবনে কোনও ঘটনা দু'বার কেন, বারবার ঘটলেও, কোনওটাই তার আগেরটির মতো

যেখানেই কল-শো করতে যাই না কেন, এখন থেকে বসু, চেতা ও আমি একঘরে অথবা বড় জায়গা হলে একধারে পাশাপাশি শোব। আপনারা সেই ব্যবস্থা করে দেবেন। তাতে বিছানা যা-ই হোক, চটে শুতে হলেও চলবে।

অবিকল একরকম হয় না। বিচিত্র রকমফের ঘটে, তাই না? এটাই তো জীবন! জটিল, সঞ্জুদা। আমি একটু আসছি।

বলতে বলতে অম্বরিষ বাথরুমে ঢোকে।

আমি সেই সুযোগে বসু, দয়ি ও চেতার কথা ভাবতে ভাবতে দু'গালে দুই হাতের তালুর ঠেকনা দিয়ে, কনুই দুটোকে খুঁটির মতো মেঝেতে ঠেকিয়ে সামনে ঝুঁকে বসে কখন চোখ বুজলাম। এটা আমার একটা ফেভারিট বসার ঢং, মেঝেতে বসলে। আমি দেখেছি এভাবে বসলে মনটাকে সহজে সরিয়ে নিয়ে অতীত বা ভবিষ্যতের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। অনেকক্ষণ এভাবে বসে থাকতে পারি, তালু বা আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে কান দুটোও ঢেকে রাখতে পারি। এখন কান ঢাকিনি, বাইরে রোয়াক থেকে নানা কথাবার্তার আওয়াজ তালগোল পাকিয়ে কানে ঢুকছে। তার মধ্যে আবার শুনলাম অম্বরিষের 'আসছি' কথাটা। বেরিয়ে ও বাইরে গেল কাউকে ডাকতে ডাকতে।

... বাজল যেন দয়িতার গলা! কানে নয়, মনে। পুরো মনে পড়ল— দয়ি অম্বরিষ ও আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে নাটুকে ভঙ্গিতে সেদিন বলেছিল— দুই দাদাকে বলছি, মানে আমাদের দুই অভিভাবককে বলছি, শুনুন, যেখানেই কল-শো করতে যাই না কেন, এখন থেকে বসু, চেতা ও আমি একঘরে অথবা বড় জায়গা হলে একধারে পাশাপাশি শোব। আপনারা সেই ব্যবস্থা করে দেবেন। তাতে বিছানা যা-ই হোক, চটে শুতে হলেও চলবে। আজ থেকেই ব্যবস্থা করবেন অম্বরিষদা। আর একটা কথা, এ নিয়ে কারও কোনও কথা বা প্রশ্নের উত্তর দেব না আমি। কেউ যেন সামনাসামনি কোনও কথা না বলে। বাইরে কেউ কিছু বললে আই ডোন্ট কেয়ার। সঞ্জয়দা! এটা কেন করছি, কারণ কী, এসব জিজ্ঞাসা করবেন না প্লিজ।

দলের একজন সেরা শিল্পীর মুখে এমন কথা শোনার পর অম্বরিষের তো বটেই, আমারও মুখে কথা এল না। অম্বরিষকে দেখে মনে হল, কঠিন এক চ্যালেঞ্জ তার সামনে হাজির। উড়িয়ে দিতে পারছে না। পাল্টা কিছু বলতে না পারার একটা অসহায়তা তার সারা মুখে করুণ ছবি হয়ে গিয়েছে।

আমার দিকে ওইরকম চোখে তাকাল অম্বরিষ। আমি যে কিছু বলব না, তা বুঝে নিতে দেরি হয়নি বুদ্ধিমান নাট্যকার-নির্দেশকের। নীরবে চলে গেল সে। দলের সম্পাদককে কথাটা জানাতেই হয়েছে। সম্পাদক সুধাকর নন-প্লেয়িং ক্যাপ্টেনের মতো মানানসই কথায় মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছে। বলেছে— তোমার শিল্পীদের জন্য কী কী করতে হবে বলবে, করে দেব।

প্রখর রোদের দুপুরে মেঘবিহীন আকাশে ধূলিঝড় উঠলে যা হয়, সেরকমই ঘটল গ্রুপের মধ্যে। আমি চেষ্টা করছি কিছু শীতল বারি ছড়াতে।

বসন্ত ও চেতার মধ্যে অন্যায় প্রেমের সম্পর্ক চলছে— অম্বরিষ এই ধারণায় নিশ্চিত নির্ভুল মনে করে নিজেকে। দয়িতাকে অনেকবার সে সতর্ক করে দিয়েছে। আশা করেছে ও তার স্বামীকে সরিয়ে নিতে পারবে চেতার কাছ থেকে। কিন্তু একসময় তার মনে হতে থাকে— দয়িতা এই বিষয়ে উদাসীন। ওদের তিনজনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, ঘোরাফেরা দেখতে দেখতে অম্বরিষের পাকা ধারণা, দয়িতার প্রশ্রয় আছে এতে। একজন স্ত্রী কী করে সহ্য করছে স্বামী ও তার বন্ধুর এমন অবৈধ সম্পর্ক? না, এ জিনিস বরদাস্ত করে নাটকের ঢংবাজি করা সম্ভব নয়। প্রকাশ হয়ে গেলে সংগঠন থাকবে না। অনেক শ্রমে অনেক স্বপ্নে এই দল তৈরি করেছে সে। দলে তার কন্ট্রোল রাখতেই হবে।

একসময় অম্বরিষ তার রাগ-বিষ সামলাতে পারল না। দয়িতাকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে বলেছে— দয়ি, তুই আমার গ্রুপের বড় অ্যাসেট, তোর বরও। আমি জানি, তোরা নাটক ভালোবাসিস আমারই মতো, সংগঠনটাকেও ভালোবাসিস। কিন্তু এ জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। তুই কী করে হজম করছিস? আমি অবাক, ভাবতে পারছি না। তোদের চলে যেতে বলা বড় কষ্টের। শোন, আমি কিন্তু চেতাকে তাড়াব। দয়িতা কেঁপে উঠে বলেছিল— না অম্বুদা, না। এটা তুমি কোরো না গো। খুব কঠোর ভঙ্গিতে অম্বরিষ বলেছে— তোর এত আশকারা! ছিঃ দয়ি, আমার মধ্যে এমন করে ঘেন্না জমিয়েছিস না! ভেবেছিলাম, তুই, তোরা নিজের শিল্পী-

সত্তাকে সম্মান দিয়ে চলিস। দেখছি ধারণাটা মিথ্যে। আমার শেষ কথা, চেতাকে চলে যেতেই হবে। তুই কষ্ট পেলেও কিছু করার নেই। সোজা কথা, বসন্ত ও চেতার এই নোংরামি—

—মিথ্যে। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি— এসব মিথ্যে রটনা। বাজে ধারণা। আমি এসবের ভীষণ প্রতিবাদ করছি অম্বুদা।

দয়িতার কড়া বিরোধিতার ফলে তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা হয়। শেষে দয়িতা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছে— সে প্রমাণ করে দেবে এসব মিথ্যে।

তার পরেই দয়িতা ওই অদ্ভুত দাবিটা করে বসল।

গোপনীয়তা ভেঙেচুরে গেল। গ্রুপের মধ্যে দুটি দল তৈরি হয়ে গিয়েছে। একদল অম্বরিষের, অন্যরা দয়িতাদের সমর্থন করছে। যখন-তখন তর্কবিতর্ক, নিন্দা-ঝগড়ার গরম হাওয়া বয়ে যেতে লাগল। তার ওপর দয়িতাদের ওইরকম বেপরোয়া বে-আচার— পাশাপাশি শুয়ে রাত কাটানোর ব্যাপার দেখে সকলে প্রথমে স্তম্ভিত। পরে প্রতিবাদ, নিন্দা, এমনকী ঘৃণার নোংরা ভাষা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একটা অসুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়ে গেল। সংস্কৃতির জগতে যার শেষ কথা বলে কিছু হয় না, সেই শ্লীল-অশ্লীল বিষয়ে আলোচনা ও তর্কে তুমুল ফেনা ভাসতে শুরু করেছে, যার অনেকটাই দূষিত। কিছুদিন পরে দয়িতারা তিনজনেই ছুটি চেয়ে বসল। চিঠিতে একযোগে সই করেছে। চেয়েছে একমাসের ছুটি। এর মধ্যে দুটো কল-শো আছে। সংগঠনের সম্পাদক ও পরিচালকের মাথায় হাত। ওরা যা রোল করে, তার বদলি তৈরি করা এই সময়ের মধ্যে অসম্ভব। কমিটির মিটিং বসে গেল। চিঠিতে ছুটির প্রয়োজনীয়তা যে ভাষায় লেখা হয়েছে, তাতে তা মঞ্জুর না করার সাহসটা হালে পানি পেল না। প্রথম কল-শো আছে পাঁচ দিন পরে, দ্বিতীয়টি তার কুড়ি দিন পরে। ওদের কাছে প্রস্তাব রাখা হল— তাদের ছুটি শুরু হোক প্রথম শো-এর পরের দিন থেকে এবং দু'দফায় ছুটিটা নেওয়া হোক। মাঝখানে শো-এর জন্য দুটো দিন আসতে হবে। তারপর আবার ওরা দশ-পনেরো দিন ছুটিতে যেতে পারে। ওরা রাজি হল।

অম্বরিষকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে। বোঝা গেল— ওদের একযোগে ছুটি নেওয়ার রহস্য এবং ওদের মুভমেন্টগুলো ধরে ফেলা সহজ হবে, এটাই অম্বরিষের আহ্লাদের কারণ। বিড়াল-কুকুরের মতো গন্ধ শোঁকার স্বভাবটা ওর বাড়ছে। অম্বরিষের জন্য দুঃখ নয় শুধু, আমার ভাবনা বেড়ে গেল। সবই ঠিকঠাক চলেছে— কল-শোগুলো হয়েছে এবং ওই প্রধান কুশীলবদেরও ছুটিতে যাওয়া হয়েছে একমাসের কিছু বেশিই। কিন্তু পরিচালকের ইপ্সি পূরণ

চট করে নাটকের ঢঙে বললাম গলা তুলে— সময় হয়েছে, দরজা খোলো। — 'নন্দিনীর' কথা। বাইরে থেকে সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ, রক্তকরবীর 'রাজা', কিউ দিল— 'আবার এসেছ অসময়ে। এখুনি যাও, যাও তুমি।

হয়েছে বলে মনে হল না।

ছুটিশেষের দিনই 'তারকাপুঞ্জ' নামে আমাদের এই নাট্য-গ্রুপের মহড়াঘরে যেন একটা ধূমকেতুর টুকরো ছিটকে এসে পড়েছিল, তার আলোর ছটা বিস্ময় ও আলোড়ন জাগিয়ে দিয়েছিল।

দয়িতা এল, সঙ্গে তিনজন। প্রশান্ত উজ্জ্বল হাসি নিয়ে সকলের দিকে তাকাল। তারপর সরাসরি অম্বরিষের দিকে চেয়ে বলল— অম্বুদা, আপনার জন্য আর একজন শিল্পী এনেছি। চেতা ও নতুন যুবকটিকে দেখিয়ে বলল— দেখুন তো, অভিনয়ে কোনওদিন হিরো-হিরোইন হয়ে উঠতে পারলে ওরা বাজারে চলবে কিনা!

দয়িতাকে আর বলতে হল না। ধারা ও প্রমিতারা চেতাকে এবং শেখর-বোধনরা তার স্বামী ছেলেটিকে নিয়ে মশগুল হয়ে গেল। সেদিন দয়িতার মুখে এক অনুপম হাসি দেখেছিলাম।

সেদিন এসরাজখানা সঙ্গে ছিল। কখন বাজাতে শুরু করে দিয়েছিলাম! ফুল্ল আনন্দের যে সোলো একখানা বাজিয়েছিলাম, তা আজও আমি মনে করতে পারি।

যাই হোক, আর একটু সার-সংক্ষেপ অন্তত না বললে আমার ছোট কাহিনিটা কায়া পাবে না। কলেজের প্রিয় সহপাঠী চেতাকে দয়িতাই আমাদের 'তারকাপুঞ্জে' নিয়ে এসেছিল। পরে পরে জানা গিয়েছিল— ও ওর প্রেমিকের কাছে প্রবঞ্চিত এবং লাঞ্ছিতও। ওকে আত্মহত্যার চেষ্টা থেকে সরিয়ে এনে প্রাণিত করে তোলে দয়িতা। স্বামী বসন্তকে একমতে এনেছে। ওকে অভিনয়ের কাজে লাগাতে রাজি করিয়েছে। দিনের পর দিন ওকে ওদের বাসায় এনে রাখছিল। ওদের কুণ্ঠাহীন ও সংস্কারহীন খোলা ভালোবাসার ছোঁয়ায় চেতা নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছে। দয়িতা কথাগুলো বড় তৃপ্তির সঙ্গে বলেছে আমার কাছে।

ওদের অনেক কথা হুহু করে এখন মনে আসছে। খিদের আর্তি গাঢ় হলে কান ভোঁ ভোঁ করে। আমার মনটা ভোঁ ভোঁ করে উঠল ওদের জন্য— 'তারকাপুঞ্জ' থেকে সেই দয়িতাদের সরে যেতে হয়েছে। ওদের কথা মন খুলে ফিরে দেখার সময় পাওয়া গেল না— অম্বরিষের ফিরে আসার শব্দ শোনা গেল।

তাড়াতাড়ি কান ও গাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। মনে হল, অম্বরিষ ঢুকেই তার পুঁথি-পড়া ভাষ্য শুরু করতে পারে— জীবন কেন জটিল ইত্যাদি! ওকে দেব না এই সময়টা মাটি করতে— ঠিক করে নিলাম এক পলকে।

— রাজু! স্বরাজ বাইরে আছে বুঝে নিয়ে ডাক দিলাম মাত্র একবার।

তারপরেই চট করে নাটকের ঢঙে বললাম গলা তুলে— সময় হয়েছে, দরজা খোলো। — 'নন্দিনীর' কথা।

বাইরে থেকে সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ, রক্তকরবীর 'রাজা', কিউ দিল— 'আবার এসেছ অসময়ে। এখুনি যাও, যাও তুমি।

— অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা।

— কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

— বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

— আমার ধ্বজাপূজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না, পূজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখুনি যাও।

— আমার ভয় ঘুচে গিয়েছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

— রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখুনি তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাওয়ার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

— দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্য যুগযুগান্ত অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

— আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজা-পূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

— বুকের ওপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

— নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় করো না। আজ ভয় করতেই

হবে।

— আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

— ঘৃণা করো? স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেওয়ার সময় এসেছে।

— পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার...।'

স্বরাজ বলতে বলতে সামনে এসে দাঁড়াল— তুমি খুলে না দিলে এ দুয়ার খুলবে না—

ধমকে বলে উঠলাম— এই! এটা নেই! স্বরাজ হাসতে হাসতে পাশে বসল। সবাই এসে দাঁড়িয়েছিল। হাততালি দিয়ে উঠল প্রথমে প্রমিতা, তারপর সকলে, অম্বরিষ ছাড়া। ও নিশ্চয় ভাবছে— হঠাৎ এইসময় 'রাজা ও নন্দিনী'র কথা এল কেন! নিশ্চয় বুঝেছে, তাই নীরব? প্রমিতা এগিয়ে এসে বলল— জয়দা! পায়ের ধুলো দিন দাদা। রাজুদা তো বললেন, রাজার ডায়লগ, ওটা ওনার করা। আপনি তো নন্দিনীর পার্ট বললেন। ওটা নিশ্চয়ই আপনি করেননি। এত স্মৃতিশক্তি আপনার, বাপরে! কত কাল আগে এ নাটক করা। আমি দেখিনি, শুনেছি! এখনও এমন মুখস্থ আপনার!

— পরে হয়েছিল আবার। কেউ বলল পিছন থেকে।

— হ্যাঁ, সেটা দেখেছি বটে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে অম্বরিষ কথা বলল— মিতা, তোমরা নতুন, জানো না, কোনও নাটকের রিহার্সালে যদি সঞ্জুদা আগাগোড়া থাকতে পারত, তাহলে অভিনয়ের সময় উইংসের পাশে ও থাকলে স্ক্রিপ্ট বা বই রাখত না। বললাম— না রে, সেই স্মরণ-শক্তি আর নেই। তবে দু-একখানা নাটক আমার এখনও মনে আছে আগাগোড়া। অন্যগুলো সব খাপছাড়া।

শেখর জিজ্ঞাসা করে— কোন দু'খানা জয়দা?

বললাম— নবান্ন আর রক্তকরবী।

স্বরাজ বলল— আমাদের দলের নতুন করে জন্ম এই দুটো নাটক করে। তার আগে এটা-সেটা হাবড়ি-জাবড়ি নাটক।

অম্বরিষ বলল— শোনো, দশ বছরের তফাতে এই দুটো নাটকই বাংলা মঞ্চে দুটি প্রধান শিল্পশৈলীর জন্ম দিয়েছিল। দুটি যুগান্তকারী ধারা।

— দাদা, কবে কোন কোন বছরে প্রথম অভিনয় হয় নাটক দুটোর? মনন জিজ্ঞাসা করল।

— সা-ল? হ্যাঁ— উনিশ শো চুয়াল্লিশে নবান্ন, চুয়ান্নতে রক্তকরবী। তারিখ মনে নেই। সঞ্জুদা, তোমার মনে আছে? অম্বরিষ বলল।

বললাম— মনে হচ্ছে, প্রথমটা ২৪ অক্টোবর, দ্বিতীয়টা ১০ ই মে।

স্বরাজ বলে ওঠে, এই হচ্ছে আমাদের সঞ্জুদা।

আপনি তো নন্দিনীর পার্ট বললেন। ওটা নিশ্চয়ই আপনি করেননি। এত স্মৃতিশক্তি আপনার, বাপরে! কত কাল আগে এ নাটক করা। আমি দেখিনি, শুনেছি! এখনও এমন মুখস্থ আপনার!

— স্মৃতিধর গণেশঠাকুর। বিমানের মন্তব্য। সকলে হাসে।

অম্বরিষের ধমক শোনা গেল— এই! স্মৃতি নয়, শ্রুতি, গণেশ শ্রুতিধর।

— ওই হল। এটা ছাড়া ওটা বাঁচে না।

— অম্বু, সাবধান। বিজ্ঞ লোকেরা থাকলে আমাদের বুঝেশুনে কথা বলা উচিত। কথা ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য জোকটা করলাম।

— সেটাই দেখছি দাদা। অনেক ব্যাপারেই সাবধান হতে হবে।

বিমান নিঃশব্দে উঠে সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছে। কেউ ফিসফিস করে বলল, এ-ই পালাচ্ছিস কেন?

আমি বললাম— কথাটা নিশ্চয়ই তুই সিরিয়াসলি বলিসনি, অম্বু? এই বিমান! বোস। অম্বরিষের মন্তব্য শোনা গেল নিচু গলায়— যেভাবে নেবে তা-ই হবে।

— আচ্ছা, আমাদের এই নাটুকে দলটার বয়স কত হল কে জানে? হাঁসের মতো গলা তুলে জিজ্ঞাসা করলাম।

কেউ কিছু বলছে না।

একটু পরে সম্পাদক সুধাকর বলল— আপনি কী কুইজ শুরু করলেন নাকি সঞ্জুদা?

— এ-কী! কেউ না? নানাজনের মুখে তাকাচ্ছি।

স্বরাজের গলা পাওয়া গেল— তিরিশ-চল্লিশ একটা কিছু ধরে নাও না। নাটুকে প্রশ্ন তো!

— তা বইকি। হবে না, অনেকে ঠিক করে জানুক, যারা জানে না।

বলতে বলতে অম্বরিষের দিকে তাকালাম।

অস্ফুট গলায় সে বলে— রেজিস্ট্রেশন থেকে ধরলে ছত্রিশ, না হলে বেশি তিন বছর।

— ছত্রিশেরও তিন বেশি। মানে আঠারোর দ্বিগুণের বেশি! তাহলে তো সাবধানে চলতেই হবে, অম্বু।

সবাই আমার দিকে তাকায়— সাবধানে চলার কথা বলেছি কেন।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম— যারা এখন আঠারোর আতপে আছে, তাদের কাছে তো আমাদের সাবধান থাকতেই হবে, মানে আমরা যারা দ্বিগুণ বা তিন-চারগুণ বয়েস পেরিয়ে এসেছি। মনে নেই সুকান্তর কবিতা? কী? কে জানে কবিতাটা? কেউ আবৃত্তির ঢঙে বলে উঠল। দেখলাম মনন বলছে— আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ/স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,/আঠারো বছর বয়সেই অহরহ/ বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি...।

দলের আর আমাদের বয়সের গোঁজামিল হিসেব দিয়ে আসর জমাতে পেরেছি দেখে হেসে ফেললাম নীরবে এবং যথারীতি অম্বরিষকে দেখতে দেখতে।

ও ঝোলা ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, চলে যাবে। তখনই আমার নিজের দিকে মন পড়ল— এত জনের মধ্যে বসে যখন-তখন অম্বরিষের দিকে আমার চোখ পড়ছে কেন? মনটাই আগে পড়ে। কেন? এখনই এর উত্তর নেই আমার কাছে।

অনেকে উঠে দাঁড়িয়েছে, কারণ অম্বরিষ উঠেছে।

মননের আবৃত্তি চলছে। অনেকে বেরিয়ে যাবে যাবে করেও যেতে পারছে না। আমি উঠিনি দেখে অম্বরিষও চলে যেতে পারছে না হয়তো।

আবৃত্তি শেষ করে মনন সকলকে এক পলক দেখে নিয়ে বলে— এ কী! চলে যাবেন সবাই? এখনই? এখন তো মোটে— নিজের ঘড়িটা দেখে মনন।

অম্বরিষ বলল— রিহার্সাল হল না। চলে যাওয়া যাক। আজ একটু অভ্যাস ভাঙা হোক।

মনন উঠে দাঁড়ায়। আমি বসে আছি দেখে, ও আবার বসে পড়ল আমার পাশে। মুখে জড়তার হাসি নিয়ে একবার অম্বরিষের দিকে, একবার আমার দিকে চেয়ে বলল— আমার যে ভারি ইচ্ছে হচ্ছে একটা। মনে হয় সেটা শুনলে অনেকেই বসে পড়বেন। সকলের দিকে চেয়ে মনন হাসছে।

আমি বললাম— বটে বটে। তোমার ইচ্ছেটা জানতেই হয়। বলে ফেল। দেখি কেউ বসে কিনা।

— ব-লব?

— হ্যাঁ, বলো।

অম্বরিষ ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে মননের দিকে। চোখে প্রচ্ছন্ন বিরক্তি। শেখর, বোধনরা বসে পড়ল। প্রমিতাও ধীরে ধীরে বসছে দেখছি। মনন বলল— ওই যে, ইয়ে—রাজুদা বললেন না যে, দুটো নাটক অভিনয় করে আমাদের গ্রুপের নতুন জন্ম। তার মধ্যে পরের নাটকটা একটু শুনলাম, কিন্তু তার দশ বছর আগেকার নতুন ধারার জন্ম দেওয়া নাটক—

মানে, ওই নবান্ন নাটকের একটুখানি শুনতে ইচ্ছে করছে। যদি অবশ্য দাদা, মানে— বলতে বলতে মনন অম্বরিষের দিকে তাকায়। আবার বলে— মানে, আজকে তো হাতে একটু সময় আছে, মানে অন্যদিন হয়তো সময় হবে না, যারা আমরা ওটার কিছু জানি না, মানে দেখিনি শুনিনি কোনওদিন, তাদের কাছে—

শেখর ও বোধন পরপর বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ নবান্ন। নবান্ন নাটকটার শুধু নামটাই আমরা শুনেছি। কখনও দেখিনি, শুনিওনি কিছু।

প্রমিতা বলল— হয়ে যাক দেখি একটা সিন। রাজুদা!

— রাজুদা— ! সব ব্যাপারে রাজুদা কেন? ওই যে দাঁড়িয়ে আছে, যার মেন রোল করা আছে অনেকবার। আমার তো— অম্বরিষকে দেখিয়ে বলতে বলতে স্বরাজ আমার পাশে বসে পড়ল।

ব্যাপার দেখে অম্বরিষকে বললাম— অম্বু বোস। যা দেখছি, বসতেই হবে তোকে। আরে আমাদের এই ছেলেটা, মনু দেখছি বেশ মনস্বী ছেলে রে! মৃদু গলায় প্রমিতা বলে— নামটাই তেমনি কিনা।

হাসতে হাসতে অন্যরা বসে পড়ছে। অম্বরিষ প্রমিতার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বসল। ওকে বসতে দেখে বললাম— রাজু, তুই-ই বল কোন জায়গাটা ধরা যায়? কোন জায়গাটা ভালো মনে আছে তোদের? অম্বু আর তুই ছাড়া আর তো কেউ নেই, যারা করেছে আগে।

— তুমিই বলো। স্বরাজ বলল।

আমি বললাম— অম্বু বলুক।

— না। তুমি বলে দাও— কোন জায়গাটা করলে নতুনরা সেই নাটক এবং সেই সময়ের কথা কিছু শুনবে, তার মেসেজ কিছু বুঝবে। বলল অম্বরিষ।

— তুই বল না অম্বু। তুই জায়গাটা বেছে দে। তুই হলি পরিচালক। অম্বরিষ বলে— আমি ইঞ্জিনিয়ার, আর তুমি হলে ফিলোজফার। তুমি বলো।

— দারুণ বলেছিস অম্বু, কথাটা। বলো, সঞ্জুদা? স্বরাজ বলল।

হেসে বললাম— নিজেকে ও একটু গুটিয়ে রাখল আর কী। যাক গে শোন, আমার মনে হয়, অম্বু যা বলল, মানে ও নিজেই ব্যাপারটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে— সময়ের কথা, মেসেজ, এসব শোনাতে হলে একটা নয়, দু-তিনটে জায়গা অন্তত একটু করে শোনাতে হয়।

অম্বরিষ মাথা নাড়ে।

স্বরাজ বলল— মাথা তো নেড়ে দিলি। তুই আমি দুটো ক্যারেক্টারের কথা বলব, বাকিগুলো?

— রাজু, আমরা তো অভিনয় করছি না, শুধু

হাসতে হাসতে অন্যরা বসে পড়ছে। অম্বরিষ প্রমিতার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বসল। ওকে বসতে দেখে বললাম— রাজু, তুই-ই বল কোন জায়গাটা ধরা যায়? কোন জায়গাটা ভালো মনে আছে তোদের?

শোনাব। এখানে সবাই নাটকের লোক, নিজের মতো করে ওরা বুঝে নেবে। কী, ঠিক তো?

সকলে সরবে সায় দিল।

বললাম— বেশ। তাহলে আমি একটা কিউ দিচ্ছি, তোরা ধরে নিবি।

আমি ভাবছি। গোটা ঘর নিস্তব্ধ। সবাই বসে আছে। নীরব অপেক্ষায় আগ্রহ ভাসছে চোখে চোখে।

ভাবা শেষ। বললাম— প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যের শেষ, যুধিষ্ঠিরের ডায়লগ, প্রধান ও কুঞ্জ আছে, পরে পঞ্চাননী আসবে।

অম্বরিষ ও স্বরাজের দিকে তাকাতে ওরা মাথা নাড়ল।

শুরু করলাম।

নাটকের অংশটি প্রয়োজন মতো এখানে লিখলাম।

যুধিষ্ঠির (আমি)।।... আমি জানি, জয় পরিণামে হবে আমাদেরই, কিন্তু সেই বিজয়গৌরব অনায়াসলভ্য নয় কুঞ্জ, প্রতিটি পদক্ষেপ রক্তরেখায় রঞ্জিত করে জিতে নিয়ে আসতে হবে সেই বিজয়লক্ষ্মীকে।

প্রধান (অম্বরিষ)।। (পৈশাচিক উল্লাসে) আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের। তা কুঞ্জ শোনে না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু— আজ যদি আমার শ্রীপতি— ভূপতি— (ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ে প্রধান)

কুঞ্জ (স্বরাজ)।। (যুধিষ্ঠিরকে একান্তে) শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটো ছেলের শোকে।

যুধিষ্ঠির।। না না, পাগল নয় কুঞ্জ, প্রধান পাগল নয়। এই ঠিক, এই ঠিক। প্রয়োজন আছে এই উন্মত্ততার। এ পাগলামি নয়।

প্রধান।। না, না।

যুধিষ্ঠির।। (কুঞ্জর প্রতি) তুমি বলছ পাগল, কিন্তু বলতে পারো কুঞ্জ, কোথা থেকে আসে এই পাগলামি? কেন এই উন্মত্ততা? ভুল-ভুল কুঞ্জ, মহাভুল। প্রধান পাগল নয়।

কুঞ্জ।। পাগল নয়?

প্রধান।। (অস্ফুট স্বরে) না, না, না, না।

যুধিষ্ঠির।। আমাদের অন্তরের সমস্ত খর্বতাকে আজ প্রধানের অন্তর্দাহই পরিশুদ্ধ করতে পারে। (কুঞ্জর বুক চাপড়ে) আমার সময় হয়ে গিয়েছে কুঞ্জ। আমি চলি এখন। (প্রধানের প্রতি) আবার আসব প্রধান।

... (প্রস্থান)

(হঠাৎ নেপথ্যে একটা হট্টগোল শোনা যায়... ক্রমে বাড়তে থাকে... নেপথ্যে বাঁশ ফাটার শব্দ)

কুঞ্জ।। জেঠা! জেঠা! ওই! (হাত দিয়ে অনুসরণের ইঙ্গিত করে) (দ্রুত কুঞ্জর প্রস্থান)

প্রধান।। (পৈশাচিক উল্লাসে) ওই, ওই আবার! ও কুঞ্জ, কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে! কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব। প্রাণ দেব! প্রাণ দেব! প্রাণ দেব! (দ্রুত প্রস্থান)

(নেপথ্যে গন্ডগোল ভয়াল হয়ে উঠেছে।... বৃদ্ধা পঞ্চাননী জনতাকে পরিচালনা করে নিয়ে ঢোকে।)

পঞ্চাননী।। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব। এগিয়ে যা।

(জনতা বন্দেমাতরম ধ্বনি করে)

এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা! এগিয়ে যা!

(নেপথ্যে বাঁশ ফাটার শব্দ বিরামহীন। জনতা পিছিয়ে যায়।)...

(পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে)...

এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব।

এর পরের অ্যাকশনগুলি মুখে বলে দিলাম— ইঙ্গিতে 'এগিয়ে যা' বলতে বলতে নীরব হয়ে যাবে পঞ্চাননী। নাটকে বাঁশ ফাটার শব্দ বলা হয়েছে গুলি করার আওয়াজকে। ... পঞ্চাননী গুলি খেয়ে মারা যাবে।...

পরে করলাম দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের শেষটা। সেই দৃশ্য: একদিকে ধনীর বাড়িতে বাজছে উৎসবের সানাই ও আনন্দমুখর মানুষের উল্লাসধ্বনি; অন্যদিকে তার পাশের ফুটপাতে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে মানুষ ও কুকুরের মারামারি— পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবি।

... (কুকুরটা গর্জে উঠে যেন কাউকে কামড়ে দিল। দেখা গেল কুঞ্জ তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তুলে ধরেছে।)

প্রধান।। (অন্ধকারের ভিতর থেকে) দুটো খেতে দাও বাবু। ও বাবারা...

রাধিকা।। (সভয়ে) ওমা— একেবারে কামড়ে খেলে গো!

ক্রমশ

কবিতা-পরিচয়

গ্যেটের অষ্টম প্রণয়: বুদ্ধদেব বসু

নরেশ গুহ

বর্তমানে কাব্যে আমি রাজা,
গদ্য লেখায় আমার নেই জুড়ি।
কুঞ্জবনে মরণ বটে তাজা,
কিন্তু আরেক রক্তরঙা কুঁড়ি

দুলিয়ে দেয় স্বনিত স্বপ্নেরা
হিমের ক্ষীণ বৃন্তে টলোমলো।—
দেশান্তরে, লবণ-জলে ঘেরা,
গোলাপ, তুমি কোন বাগানে জ্বলো?

কোন দ্রাঘিমায় উদ্ভাসিত নীলে
বাঘের মতো নিদাঘে ডাক দিলে,
তুলতে কি চায় তারই প্রতিধ্বনি

পাতার লালে মাতাল নিঃস্বেরা!
আকাশ ভেঙে আগুন ফোটে উষার,
ছদ্মবেশে ব্যর্থ করে তুষার।

—হাতেম, হায়, কবির শিরোমণি,
গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা?

কবিতাকেও সাধতে হয়। কবির পক্ষে তো বটেই, সাধতে হয় পাঠককেও। যে-কোনো কবিতারই মর্মে পৌঁছতে গেলে সাবয়ব কবিতাটিতেই যে মনোনিবেশ করতে হবে, চোখ-কান সজাগ রেখে ঠোঁট আর মন দিয়ে সেটি পাঠ করতে হবে একবার, অনেকবার— এ-কথায় আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি যে কবিতা পড়তে গিয়ে শিবের গীত গাইতে বসা নিষ্প্রয়োজন, কবির জীবনচরিত বিষয়ে জ্ঞান অনিবার্য নয়, এমন-কি এ-কথাও জানার দরকার নেই যে তিনি কী দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস করেন কিংবা করেন না, রাজনীতিতে তাঁর উৎসাহ কতটুকু, কিংবা সাহিত্য-শিল্পকলা বিষয়ে তিনি কোন-কোন গুরুতর মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তাই বলে এমন কথা মানা একটু কঠিন যে লিখিত কবিতার বাইরে গিয়ে সেই কবিতার পরিমণ্ডল জানতে চাওয়া অকর্তব্য, এবং এ-নিয়ম ভঙ্গ ক'রে আনুষঙ্গিক তথ্যাদির উল্লেখ করলে আমরা কবিতার আসল অভিপ্রায় থেকে স্খলিত হই। কবিতা যাঁরা পড়বেন তাঁদের প্রত্যেকেরই হয়তো জানা থাকা উচিত ১৯১৬ সালের ঈস্টারে কী এক ভয়ঙ্কর ঘটনা আয়ার্ল্যান্ডে ঘটেছিল। কিন্তু এমন যদি হয় যে আমি সত্যি সে-ঘটনা জানি নে, তাহলে সে-বিষয়টি পূর্বেই না-জেনে নিলে ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতাটি কতদূর আমার কাছে সে-বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ সন্দিহান।

'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়' কবিতাটি পড়তে গেলেও কবিতার দেহসংলগ্ন এই রকমের দু-একটি তথ্য জেনে নেওয়া দরকারি বলে মনে করি। যাঁর নামে কবিতা সেই বিশ্বকবি অষ্টমবার— 'প্রেমে পড়েন' বললে ঠিক হয় না— প্রণয়াসক্ত হন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে (ঠিক কোন বয়সে তার দরকার নেই), এবং যে-কন্যাটির উদ্দেশে হ্বাইমারের বিখ্যাত ঋষিচিত্ত উদ্বেল হ'য়ে ওঠে তার নামটি এই কবিতা পাঠের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হলেও তার তিরিশ বছর বয়সটা খুবই জরুরি। অভিনেত্রী জীবনের 'নৈতিক সংকট' থেকে উদ্ধার ক'রে আনা, খেয়ালি চঞ্চল উচ্ছল প্রণয়কুশলী এই যুবতীটি ছিলেন গ্যেটের এক বন্ধুপরিবারের আশ্রিতা। প্রেমিকের প্রণয় না হয়ে বরং তার প্রতি বৃদ্ধ মহিমান্বিত কবির পিতৃস্নেহ ধাবিত হলেই সামাজিক ভাবে সংগত হত। বিচলিত কবি অতি সত্বর এই প্রণয়জাল থেকে নিজেকে নিষ্ক্রান্ত করেন, কিন্তু হৃদয়ের এই নবজাগরণ থেকে জন্ম নেয় জর্মান গজলগুচ্ছ, গ্যেটে যার নাম দিয়েছিলেন 'প্রতীচীর প্রাচ্য দিওয়ান'। কিছুকাল থেকেই অনুবাদে পারস্যের কবি হাফিজের কবিতা তাঁকে প্রলোভিত করছিল। কিন্তু তাজা প্রণয় না হলে কি গজল জমে? কুশলা যুবতীর অভিজ্ঞ আবেগের সদ্য স্মৃতিকে মন্থন করে বৃদ্ধ কবির পরিণত প্রণয়-কাব্য মুঞ্জরিত হয়ে উঠল। প্রণয়ী হাতেম-গ্যেটে; প্রণয়িনী জুলেখা-যুবতী। গ্যেটের ব্যবহৃত ছদ্মনাম। অথচ—

কিন্তু এবার বাংলা কবিতাটিতে ফেরা যাক। আঁটো গড়ন, —বলতে পারি ষোলো পঙক্তির আধুনিক সনেট। কঠিন সনেটের মতোই মিলের বিন্যাস:১২১২, ৩৪৩৪, ৫৬৭-৩৮৮-৭৩। প্রথম ছ-পঙক্তির পরে নিশ্বাস নেবার জন্য একবার থামে তৎক্ষণাৎ এতক্ষণ ঠেকিয়ে রাখা এক আদিম হাহাকারে ফেটে পড়বার জন্য। এর পরেই সনেটের চরিত্র অনুযায়ী সংবৃত হ'য়ে আসে কবিতার সুর, যে-জাল ফেলা হয়েছিল তা যেন গুটিয়ে নেয়া হচ্ছে। হাহাকার পেরিয়েও কিছু যেন বাকি আছে সান্ত্বনা পাবার মতো। নিয়মমাফিক সনেটে এই দ্বিতীয় স্বরের আবর্তনেই সাঙ্গ হতো কবিতা। এখানে কিন্তু শেষ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ ঘনিয়ে আসে তৃতীয় আর-একটি স্বর, গভীর দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে যার অবসান। অর্থাৎ সংকেতে মহৎ একটি নাটক ঘটে যাচ্ছে এই ক্ষীণকায় কবিতার বিন্যস্ত পদগুলিকে অবলম্বন করে— সে-নাটকটি তিন অঙ্কে সমাপ্ত। স্বরলিপির মতো ড্যাশ্‌, প্রশ্নচিহ্ন, কমা— এ-সব সেই নাটকীয় সুরের আবর্তনকে সূচিত করছে ব'লেই পড়ার সময় চোখকে সতর্ক রাখা প্রয়োজন।

কবিতার অবয়বে কোথাও গ্যেটের নাম নেই যদি-না শিরোনামকে কবিতার অঙ্গ বলা যায়, কিংবা যদি-না গ্যেটের কবিতাবলির সঙ্গে পরিচয়-সূত্রে জানা থাকে যে তাঁর গজলগুচ্ছের হাতেম, বর্তমান কবিতার পঞ্চদশ পঙক্তিতে যাকে সম্বোধন করা হয়েছে, সে, আসলে 'ছদ্মবেশী' গ্যেটে। এই 'ছদ্মবেশ' কথাটাও পূর্বপঙক্তিতে আছে, যদিও অন্য প্রসঙ্গে, যেন অমনোযোগী পাঠককে একটু উসকে দেবার জন্য। কবিতার স্বগতোক্তিতে যাকে হাতেম সম্বোধিত করা হচ্ছে সে-ই আসলে কবিতার 'আমি'। বোঝা যাচ্ছে এই 'আমি' বাঙালি কবি নন, গ্যেটে, জীবনের সেই সময়ে উপনীত যখন গদ্যে বা কাব্যরচনায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অথচ যাঁর কুঞ্জবনে সদ্য সদ্য মৃত্যুর রটনা হয়েছে। বিদ্বান পাঠক এখানে আপত্তি তুলতে পারেন যে গ্যেটের কুঞ্জবনে 'তাজা' মরণ রটেছিল অষ্টম নয়, নবম এবং শেষ প্রণয়ের সমকালে যা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুরই আরো একটি

কবিতা রয়েছে। তা, একমাত্র ঐ 'তাজা' শব্দের ব্যবহার ছাড়া এর ফলে কবিতার কোনো বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে না কিন্তু। কবিতাটি গ্যেটের মুখে বসানো এক স্বগত খেদোক্তি।

সমস্ত কবিতায় একটিমাত্র চিত্রকল্পের (?) ব্যবহার হয়েছে— তা একটি বিবর্তমান কুঞ্জবনের। আপাতত মনে হ'তে পারে সেই কুঞ্জবন আসলে একটি নয়, দুটি; দ্বিতীয়টি হচ্ছে লবণ-জলে ঘেরা দেশান্তরের এক 'বাগান'। এবং 'দেশান্তর' কথাটিও যে দু-বার ব্যবহার করা হয়েছে তাও অকারণে নয় হয়তো। দুবার, কেননা 'দ্রাঘিমার'ও সেই অর্থ ধরে নিতে ভাষাগত বাধা নেই। এই ' দেশান্তর' কথার সঙ্গে 'উদ্ভাসিত নীল', 'বাঘের মতো নিদাঘ', এবং 'হাতেম' মিলিয়ে পড়লেই মনে হ'তে পারে গ্যেটের কাব্যকাননের সঙ্গে হয়তো বা পারস্য গোলাপবাগতুল্য হাফিজের কবিতাবলিরই তুলনা হচ্ছে। বিশেষত 'বাগান' কথাটা যখন ফারসি থেকেই বাংলায় নেওয়া তখন সেই শব্দের চতুর ব্যবহারে হাফিজের পারস্যের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা কবির অভিপ্রায় হতেও তো পারে! অর্থাৎ মনে করা যেতে পারে যে হাফিজ-মুগ্ধ গ্যেটে স্বয়ং প্রৌঢ় প্রেমের স্মৃতিতে গজল লিখতে গিয়ে...ইত্যাদি। কিন্তু 'দেশান্তরের গোলাপ' যদি হাফিজের কাব্য তাহলে শেষ দুই পঙক্তির হাতেম (হাতেম যদি হাফিজ) গ্যেটের আক্ষেপের উপলক্ষ্য হন কী করে?

কথা হচ্ছে, এইমাত্র যা বলা গেল তার কোনো ইঙ্গিত এ-কবিতায় একেবারেই যে থাকতে পারে না তা বলছি না। কিন্তু তার চাইতেও বেশি সম্ভব যে কুঞ্জবন এ-কবিতায় একটিই, তা গ্যেটের বিবর্তমান জীবন, এবং ব্যবহারগুণে 'দেশান্তর' এখানে ভৌগোলিক শব্দ নয়, কালবাচক শব্দ। বৃদ্ধের কাছে নিজেরই উত্তীর্ণ যৌবন নিতান্তই লবণ-জলে ঘেরা দেশান্তর, একদা যেখানে প্রণয়ের রক্তগোলাপ ফুটেছিল। শক্তি, দর্প, ঔদ্ধত্যে ভরা আলোকিত মধ্যাহ্ন। সেই রক্তগোলাপ আজ আর কাদের বাগানে জ্বলছে! কুঞ্জবনে কোন আকাঙ্ক্ষায় হেমন্তের পাতারা আজ লালে মাতাল, যদিও তা শীতাগমে অবসানেরই নিশ্চিত সূচনা। আর এই সমাগত তুষারপুঞ্জকে প্রাণপণে ঠেকিয়ে রাখছে, মৃত্যুবিদ্বেষী লাল পাতার মতো হাতেমের ছদ্মবেশে প্রৌঢ় কবির প্রণয়াসক্তি। বিশ্বকবি গ্যেটে যে ইউরোপীয় তার প্রমাণ, কুঞ্জবনে তাজা মরণের রটনা শুনেও ঈশ্বরের কাছে তিনি নতশির, নতজানু হয়ে করুণা ভিক্ষা করেননি, বরং জেনেছেন, মৃত্যুকে ব্যর্থ করতে পারে একমাত্র সেই শক্তি যা স্খলিত বৃদ্ধের ফ্যাকাশে চোখেও কামনার আগুন জ্বালিয়ে তোলে। এবং মৃত্যু, বলা বাহুল্য, একমাত্র দেহকেই আক্রমণ করে না। হুইমারের ঋষির পক্ষে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত ক্লান্তিহীন প্রণয়চর্চার আর কোন রহস্য থাকতে পারে? আর স্বকীয় অভিজ্ঞতার আঘাত থেকেই যে জন্ম নিতো তাঁর কবিতা সে-কথা তো তিনি নিজেও বহুবার বলেছেন।

আলোচ্য কবিতার কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এখানে শেষ হলে বিশ্বকবি গ্যেটের সঙ্গে এ-কবিতায় রচিত তাঁর প্রকৃতির কোনো মিল থাকতো না। হেমন্তে পাতার লাল যৌবনের জ্বলন্ত গোলাপের প্রতিধ্বনিই তুলতে চায় হয়তো, কিন্তু আসলে কী চেয়েছিলেন গ্যেটে? মৃত্যুর চক্রান্ত ব্যর্থকারী প্রণয়কৌশল? নারী? নাকি কবিতা? কবিতাই নিশ্চয়ই। তাই তো: 'বর্তমানের কাব্যে আমি রাজা,/গদ্য লেখায় আমার নেই জুড়ি'। অথচ নিশ্চয়ই কি কবিতা? তাহলে কেন বিশ্ববিজয়ী প্রতিভার ফসল নিয়েও দীর্ঘশ্বাস পড়ে: '—হাতেম, হায়, কবির শিরোমণি,/গদ্য লেখায় সবার চেয়ে সেরা! কেন এই আত্মপরিহাস? শিল্পের সঙ্গে জীবনের এই জটিল দ্বন্দ্বের তত্ত্ব টোমাস মান কি গ্যেটের কাছেই শিখেছিলেন?

শেষ কথা। এ কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পের (?) বিভিন্ন অংশগুলিকে কোনো একটিমাত্র বিশেষ অর্থের পেরেকে ঝুলিয়ে দেবার চেষ্টা করা বৃথা। একই সঙ্গে বহু অর্থের আলো বিচ্ছুরিত হয় এর শব্দাবলি থেকে। এবং কবিতাটির অভিপ্রায় তার কোনো একটি অর্থকে ত্যাগ করলে স্পষ্টতর হবে কিনা সন্দেহ। ইচ্ছে করেই এতক্ষণ যাকে চিত্রকল্প বলেছি তারও সংশোধন প্রয়োজন। চিত্রকল্প না-বলে বলব প্রতীক।

শুভময় রায়

বুদ্ধদেব বসুর যে কবিতা নিয়ে লিখেছেন নরেশ গুহ, সেটি আগেও অনেকবার পড়েছি আমি। কিন্তু স্বীকার করতে হবে যে তাঁর লেখাটি থেকেই আমার ধারণার অনেকগুলি জট খুলে গেল। দু-একটি তথ্য আমার জানাই ছিল না, দু-একটি ছবি হয়তো-বা ভালো মিলিয়ে নিতে পারিনি আগে। এইবার পারলুম। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনাদের পরিকল্পনাটি কতো উপকারী। আমরা অল্পস্বল্প কবিতা পড়ি যারা, আমরা এ-ধরনের লেখার আয়োজনে খুব কৃতজ্ঞ।

তবে লেখাটি থেকে আমার একটি ছোটো প্রশ্নও তৈরি হচ্ছে। আমরা কবিতাটির আভ্যন্তরীণ সমস্তই জানলুম, গ্যেটে এবং হাতেম বিষয়ক তথ্যাবলি। কিন্তু সমস্ত আলোচনার পর এক মৌলিক প্রশ্ন বাকি থেকে যাচ্ছে যে বুদ্ধদেব আদৌ কবিতাটি লিখতে গেলেন কেন। কোনো একটি প্রসঙ্গে যে নিছক তন্মাত্র কবিতা কিছু লেখা যাবে না তা নিশ্চয় নয়, সে তো ইচ্ছে করলেই লিখতে পারেন কবি। কিন্তু এখানে কি বুদ্ধদেব সত্যি সেইরকম কোনো ইচ্ছে করেছেন? অর্থাৎ কথাটা এই-যে এখানে গ্যেটে কি সত্যি বুদ্ধদেব বসুর অবজেক্ট, না কি অবজেক্টিভ কো-রিলেটিভ মাত্র? 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইতে যে-কারণে ব্যবহৃত হয় ফাউন্ট বা হান্স আণ্ডেরসেনের গল্প বা কচ-দেবযানী দ্রৌপদী-অর্জুন— গ্যেটেও কি এখানে সে-রকম এক কারণমাত্র নন?

নরেশবাবু এ-কথা একেবারে ভাবেননি তা নিশ্চয় নয়, হয়তো তাই স্পষ্ট করে একবার তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন 'বোঝা যাচ্ছে এই 'আমি' বাঙালি কবি নন, গ্যেটে'। তবে কবিতায় আমি-তুমি ব্যাপারটা বড়ো গোলমেলে, কে যে কখন আমি, কে তুমি— খুব হিসেব করে বলা অনেক সময়ে কষ্টজনক। কবিরাও সব সময়ে জানেন কি না, ঠিক বুঝি না আমরা। এখানে অবশ্য নরেশবাবু ঠিকই বলেন যে এই আমি গ্যেটে। কিন্তু পুরোপুরি ঠিকও কি? সেই গ্যেটে-আমির অন্তর্বর্তী কোনো নিশ্বাস কি বাঙালি কবিকেও চকিতে-চকিতে ছুঁয়ে যাচ্ছে না?

আমার মতো পাঠকের কাছে অবশ্য কবির সেই আপনস্পর্শ ভিন্ন কবিতাটি মনের মধ্যে পৌঁছোয় না, শুকনো থেকে যায়। কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত এই মর্জির ফলে জিজ্ঞাসাটা তুলছি তা নয়। ভেবে দেখুন, কবিতাটির বিষয় কী। দুটি তো কথা মূলত মনে থাকে, নরেশবাবুর ভাষাতেই যদি বলা যায়, (এক) 'বৃদ্ধের কাছে নিজেরই উত্তীর্ণ যৌবন নিতান্তই লবণজলে ঘেরা দেশান্তর, একদা যেখানে প্রণয়ের রক্তগোলাপ ফুটেছিল। শক্তি, দর্প, ঔদ্ধত্যে ভরা আলোকিত মধ্যাহ্ন। সেই রক্ত-গোলাপ আজ আর কাদের বাগানে জ্বলছে!' (দুই) 'কেন এই আত্মপরিহাস? শিল্পের সঙ্গে জীবনের এই জটিল দ্বন্দ্বের তত্ত্ব...'।

এখন, এ-দুটি ভাবনার প্রতি মনোযোগী হলে কি বুদ্ধদেবেরই কবি-জীবন মনে চলে আসে না? যদিও একসময়ে লিখেছিলেন তিনি 'ফিরে ফিরে স্মৃতিরে ডেকো না— নিজেই সে বড়ো গুরুভার' তবু সমস্ত 'যে-আঁধার আলোর অধিক' কবিতার বইটি সেই গাঢ় রক্তিম স্মৃতিরই চর্চা, তাকেই শিল্পের সাযুজ্যে বেঁধে নেবার সাধনা, সূচনাতেই রেখে দিয়েছেন কবি তিন-তিনটি 'স্মৃতির প্রতি' কবিতা। সেই স্মৃতি যৌবনোত্তাপকে নবীন করে ফিরিয়ে আনে

হেমন্তের পাতার লালে, অথবা আয়ু-তুষারের ষড়যন্ত্র ভেদ ক'রে। এই প্রসঙ্গেই হয়তো মনে পড়তে পারে ইয়েট্‌সের কিছু কবিতা, অথবা বুদ্ধদেব যে ইয়েট্‌স-ভক্ত, সেই তথ্য। উষার আগুন তুষারের ষড়যন্ত্র ভেদ করছে, নিদাঘের বাঘের মতো ডাক পাতার লালে প্রতিধ্বনি তুলছে, কুঞ্জবনে মরণের মধ্যে স্বনিত স্বপ্নে আরেক রক্তরঙা কুঁড়ি দুলে উঠছে— এ-সব বিপ্রতীপ উচ্চারণের পাশাপাশি ভেবে দেখুন 'যে-আঁধার আলোর অধিক' বইটির ইতস্তত ছড়ানো কিছু লাইন: 'কবে সেই তুফান ফুরালো/তবু কেন কাঁপন থামে না' 'নতুন জ্ঞান নেড়েছি খুব কষে/কয়লাশেষের আগুন থামেনি তো' 'ফুরোয় না যে-আগুন সে কি আমার?' লবণজলে ঘেরা যে-দেশান্তরের কথা আছে এই কবিতায়, রাত তিনটের একটি সনেটে তারও ধ্বনি শোনা যায় ঈষৎ ভিন্নভাবে: 'যাও দূরে, দেশান্তরে, সাগরের শেষ দ্বীপান্তরে'— নির্জীবতা এবং বর্তমান থেকে নিজেকে গর-ঠিকানিয়া করে নেবার ইচ্ছায়।

এই অতীত যৌবনতাপকে বর্তমানে ব্যবহার করবার প্রক্রিয়ার সঙ্গে এসে মিশে যায় শিল্পপ্রতীতি। 'শীতের প্রার্থনা: বসন্তের উত্তর'-এ কবি জানিয়েছিলেন যে সবই তাঁর ভালোবাসার কবিতা। কিন্তু নাম কী এ-ভালোবাসার? ততক্ষণ তো কবি থামতে পারছেন না 'যতক্ষণ আমার হৃদয়ে প্রেম/কবিতা না হয়েছে, আবার/কবিতাই প্রেম', কেননা এখন তাঁর 'নারীরে, বাণীরে/এক মনে হয়'।

নরেশবাবু প্রশ্ন রাখছেন 'আসলে কী চেয়েছিলেন গ্যেটে? মৃত্যুর চক্রান্তব্যর্থকারী প্রণয়কৌশল? নারী? না কি কবিতা? কবিতাই নিশ্চয়ই।...অথচ নিশ্চয়ই কি কবিতা!'

উপরের ঐ কবিতাপঙক্তিগুলির মধ্যেই ধরা আছে এর উত্তর। যতক্ষণ কবির হৃদয়ে 'প্রেম কবিতা না হয়েছে আবার কবিতাই প্রেম' ততক্ষণ এর স্পষ্ট উত্তর পাওয়া কঠিন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর রচনায় ক্রমশ সেই উত্তরের দিকে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন বলেই গ্যেটের অষ্টম বা নবম প্রণয় তাঁর রচনায় নিছক বিষয়ের চেয়ে বেশি তাৎপর্যে আসে, এই রকম কি মনে হয় না?

নরেশ গুহ

'গ্যেটের অষ্টম প্রণয়' বিষয়ে শুভময় রায় মহাশয়ের চমৎকার চিঠিটির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর সঙ্গে কোথাও দ্বিমত নেই আমি। আমার লেখায় যা-যা নেই বলে তিনি জানিয়েছেন, আমি ধরে নিয়েছিলাম পাঠকেরা তা নিজেরাই বুঝে নেবেন। কেননা 'কবিতা-পরিচয়'র উদ্দেশ্য কবিতাটির আদ্যোপান্ত ব্যাখ্যা নয়। এ-সব লেখা পড়ে পাঠকরা কবিতাটিতেই ফিরে যাবেন আবার, এটাই অভিপ্রেত। তবু বলতে পারেন খানিকটা ফাঁকি ছিল আমার ঐ লেখাটিতে, আরো একটু সময় নিয়ে যেহেতু লিখি নি। চিঠিটি প'ড়ে এতোটাই কৌতূহল হ'লো যে শুভময়বাবুর আরো লেখা পড়তে চাই।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, তৃতীয় সংকলন বছর
(মাস অনুল্লিখিত) সম্ভবত আষাঢ় ১৩৭৩ সাল

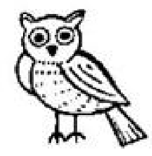

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার
পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে
পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ,
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রমুখ কবি। ₹১৫০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

উত্তর লিখেছেন: সিদ্ধেশ্বর সেন

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন।—
সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কীরকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

১. মূলত ও মুখ্যত বোধ হয় পরিমিতিবোধ, শিল্পের সত্যেও— তাই-ই। এর মানে এ নয় যে আমি বিচলিত নই। বরং তো এ আলোড়ন আমাদেরও, আমাদেরই। তবে, যেভাবে আমি লিখতে অভ্যস্ত, ভালো কি মন্দ, তাতে কোনো কিছু স্থিরতা বা অস্থিরতাই যতক্ষণ না আমার ব্যক্তিগত সত্তায় ব্যক্তির সংকট বা উত্তরণে পরিণতি চাইছে, আজকের কবিতা শেষপর্যন্ত যে নৈর্ব্যক্তিকতায় পৌঁছতে চায়, ততক্ষণ এক কলমও লেখা আমার পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য। আবার, প্রতিবারেই, লেখাই তো এক আত্মপরীক্ষা— হ্যাঁ, অবশ্যই, সমসাময়িকের কষ্টিপ্রস্তরে। তা অস্বীকার করলে নিজেরই সত্তার খানিকটা কেটে বাদ দেওয়া হয় না কি? লেখার সময়, অন্তত, আমি বাইরের কোনো চাপের থেকে অন্তর্গত চাপ বা অনুষঙ্গময় অভিজ্ঞতাকেই বড়ো মূল্য দিতে বাধ্য হই। যতক্ষণ না সে প্রক্রিয়া বুঝি যে, ভেতরে ভেতরে দানা বেঁধে উঠলো, ততক্ষণ আমি নাচার— চুপ করে থাকতেই হয়, আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠায়, যেন বুকে ব'য়ে বেড়াচ্ছি এক নিরেট পাথর বা লুকানো ঝরনা, তারই আড়ালে। সে সময়টা হয়তো যায় কর্মে, আহরণে, কবিতারই প্রত্যক্ষতা অর্জনে অস্তিত্বের সামাজিক মূল্যের অন্বেষায়। ব্যক্তিমানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ আবার ব্যক্তিমানুষটিরও অন্তর্সংঘাত ও আত্মদাহ— এদের টানাপোড়েনেই তো যা কিছু প্রকাশ বা কবিতা— দ্বান্দ্বিক উদ্বর্তনে, নয় কি?

> সামাজিক উপযোগিতায় আমরা যে যেমনটি মুখের ভাষাকে পেলাম ঠিক তেমনই তো আর কবিতায় বসিয়ে যাচ্ছি না। এ হলো কবিতারই শরীর নির্মাণ, একতাল মাটি ছেনে মৃৎশিল্পী প্রতিমাটি গড়েন— সেই-ই গঙ্গামাটি, কিন্তু প্রতিমাগড়নে তার রূপবদল হলো তো?

২. মার্কস ও এঙ্গেলস তো এক গোটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের, বিশ্বদর্শনেরই গোড়াপত্তন করেন, হেগেলীয় ডায়লেকটিকসের তত্ত্বকে মাথা থেকে নামিয়ে পায়ের ওপর খাড়া ক'রে। এবং লেনিনই তো আনেন সেই বিশ্বপ্লাবী অসামান্য বিপ্লব। (কারণ শর্ত ছিল, জগতের ব্যাখ্যা হয়েছে অনেক, এখন কথা হলো তাকে বদলে ফেলার।) কিন্তু, এঁদের কারুরই ধ্রুপদী সাহিত্যরুচিতে যে বিকার ঘনিয়েছিল, এমন কথা তো আজও শুনিনি। উলটোপক্ষে, তলস্তয়-প্রসঙ্গে লেনিনের বিশ্লেষণী সন্দর্ভ তো এক নিরিখই হ'য়ে রইল। তাই বাংলা দেশে আজ যদি রাজনৈতিক সচেতনতাই শিল্প বা কবিতা ব্যাপারে ঔদাসীন্যের দায়ে কাঠগড়ায় ওঠে, তবে বলতে হবে সর্ষের মধ্যেই ভূত ঢুকে গেছে আমাদেরই অজান্তে বোধ হয়, সারা কলকাতা বর্ষার কাদাছিটকানোর মতো দেওয়াললিখনে আক্‌চার ভ'রে গেলেও। আমার ধারণা, আজকের কবিতার সমাজবিচ্ছিন্নতার (এখানে কি লেখক-পাঠকের সম্পর্কের কথা উঠছে) মূল খুঁজতে গেলে তা খুঁড়তে হয় আরও গভীরে— এই শ্রেণী-সমাজে ব্যক্তির বিযুক্তিবোধে; আর, এ মুহূর্তে দায়ী করা হোক, উদাহরণত, এক ফাটকাবিলাসী 'সাহিত্যের' বাজারহাটের নিয়মের অমানুষিক অমানবিকতাকেই, —কারণ লেখক-পাঠকের যোগ তো হওয়া উচিত মানবিক মূল্যবোধে। তা যদি উপার্জিত না হয়, লেখকদের অক্ষমতায় বা দায়িত্বহীনতায় বা দণ্ডমুণ্ডধারী বণিকদেবতাটির পায়ে করুণ আত্মসমর্পণে, কিংবা অপরপক্ষে, পাঠককুলের সহিষ্ণুতা বা ধৈর্যের অভাবে— তবে তো উভয়তই ভরাডুবি হ'তে বসেছে। শিল্পীর সততাই, আমার মনে হয়, এক্ষেত্রে তার একমাত্র রক্ষাকবচ হ'তে পারে।

আর বলতে গেলে, ব্যাপ্তভাবে, সমাজমানসে আজকের কবিতার প্রভাবের সন্ধানের উত্তর বোধ হয় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের পারস্পরিকতার নিগূঢ় সম্বন্ধ-বিচারেই সম্ভব।

যে শ্রেণীগত উৎসে আজও মধ্যবিত্তের সাহিত্যের স্ফূর্তিবৃত্তি, মনে রাখা দরকার, বাংলাদেশেরই বৃহৎ জনসমাজের সঙ্গে তুলনায় তা মাত্র এক অতিক্ষীণ ভগ্নাংশকেই আলো দেয়, যদিই-বা দেয়;

যদিও ঢের আগেই রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার পিলসুজের উপমায় সেদিকে আমাদের নজর ফেরাতে চেয়েছিলেন এবং সমগ্রভাবে এই সভ্যতার সংকট পারাপারের যাত্রী আমাদের মহাকবির চৈতন্যকে যন্ত্রণাকাতরতার হাত থেকে যে আদপেই রেহাই দেয়নি, সেও তো আমাদের অজানা থাকবার কথা নয়।

৩. আর মাইকেলই তো, তাঁর পাশ্চাত্ত্য-বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও, শেষাবধি 'মজিনু বিফল তপে' ব'লে দেশজ-অঙ্গীকারে স্থিত হতে চেয়েছিলেন। তাঁর সমকালের ওলোটপালোটে আমাদের মহাকাব্যপাঠে মূল্যবোধেরই এক রূপান্তর ঘটাতে চান। এবং একালে, সাযুজ্য-প্রয়াসে স্বদেশ ও বিশ্বের পরিবর্তমান সময়ের বোধে, আত্ম-সচেতনতায় ও লোকায়ত জিজ্ঞাসায় উৎরাই-চড়াই ভাঙেন এমন কবিও, যেমন বিষ্ণু দে, কবিতার উৎক্রমণের প্রান্তরেখাটিকেও আমাদের লক্ষণীয় করে তোলেন।

কিন্তু, বিশেষ ক'রে কবিতায় ভাষা ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠায় মনে হল যে, হয়তো বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্ক সূত্রটিকেই আবার ঘুলিয়ে ফেলা হল। কারণ, সচল ভাষা, মুখের কাছাকাছি ভাষাই তো হবে এই কবিতার নিজস্ব ভাষা নির্মাণের প্রাণ। এমনকি, যে সমকালীনের সমস্যায় বুঝি এ প্রাসঙ্গিক অবতারণা তাও তো নিস্ফলা হয়, যদি ভাষা চলে যেতে চায় মুখ ফিরিয়ে উলটো সড়কে, পিছু হটে। যা আসলে অসম্ভব। আমার তো মনে হয়, বিষয়বস্তুর সঙ্গে আঙ্গিকের যা-প্রকাশমান হ'তে চায় কবিতায়, এক্ষেত্রে তার উপযোগী ভাষা খুঁজে নিতে, বাক্‌প্রতিমায়, —সেখানে কবিতাকে তো অনিবার্যভাবেই আবিষ্কার করে নিতে হয় ভাষার নিজস্ব সম্ভাবনারই বিকাশ। আমি মনে করি চলতি ভাষার কাছাকাছি থেকেই হতে পারে, কবিতার এই নিজস্ব ভাষা নির্মাণ অন্তত আমার যেটুকু হাতেকলমে প্রয়াস তো তাই বলে। শুধু মুখের ভাষার কাছাকাছিই নয়, একজন জীবন্ত মানুষের শ্বাসাঘাতও, শ্বাসপর্বলয় তাতে যেন ধরা পড়বে, ওঠা-পড়ার ক্রমিক দৈর্ঘ্যহ্রস্ব অনুযায়ী; যদিও এই কবিতার ভাষা কি জনসাধারণের ভাষা নয় বলে অভিযুক্ত হবে, আমি জানি না। তবে বলতে হবে, কবিতার ভাষা, এমনকি কথ্য ছন্দের চালও সাধারণের কথিত উক্তি থেকে স্বতন্ত্র হ'বে বৈকি! কেননা সামাজিক উপযোগিতায় আমরা যে যেমনটি মুখের ভাষাকে পেলাম ঠিক তেমনই তো আর কবিতায় বসিয়ে যাচ্ছি না। এ হলো কবিতারই শরীর নির্মাণ, একতাল মাটি ছেনে মৃৎশিল্পী প্রতিমাটি গড়েন— সেই-ই গঙ্গামাটি, কিন্তু প্রতিমাগড়নে তার রূপবদল হলো তো?

৪. জনসাধারণের নিছক দৈনন্দিনের সমস্যা নিয়ে লিখিত হলেই কি কবিতাকে তা জনগ্রাহ্য করবে? শুধু জনগণের কবি কেন, বিপ্লবেরই কবি ব'লে আমরা যাঁদের চিনি তাঁরাও তো এ অতিশয় সরলীকরণের প্রস্তাবের প্রতিবাদে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসবেন। ধরা যাক, মায়কোভস্কি। রুশ-বিপ্লবের মোহনায় গভীর আত্মিক সমুদ্রমন্থনই কি তিনি তাঁর জীবনে ও কবিতায় ধরেন না? শুধুই-কি বিপ্লবের দৈনন্দিনের পঙ্ক্তি রচনা? এদেশে-ওদেশে মানুষের ন্যায়ের সংগ্রামেই যে মানুষ আবার নতুন মহিমা পেল, তাই-ই কি তবে এই নতুন কবিতারও মর্মে বাজে না? ফ্যাসিস্ত-ফ্যালাঞ্জিস্টদের শত্রু-চিহ্নিত হ'য়ে গোপনে নিহত হবার আগে পর্যন্ত লরকার কবিতা কী বলতে চেয়েছিল? কিংবা নাৎসি অধিকারের কালো দিনগুলিতে এল্‌সা-র উদ্দেশে লেখা আরাগঁর কবিতা, সুররিয়ালিজমের বিন্যাস না ছেড়েও এলুয়ার কিংবা অন্য আমেরিকায় নেরুদা-র কাব্য? আমাদের দুই বাংলাতেই নজরুলের আসন কি শুধু তার উচ্ছ্বাসেরই প্রাবল্যে? কিংবা আমাদের স্বল্পায়ু সুকান্ত! 'আমি যাই তার দিনপঞ্জিকা লিখে,'— লিখলেও সুকান্ত কি শুধুই দিনপঞ্জিকে পদ্যে বেঁধে গেছে? না বাংলা দেশের এক বিশেষ কালপর্বের আর্তি ও আবেগমুখর প্রতিবাদই তার কণ্ঠস্বরে আমাদের চকিত করে, আজও। এই শেষের শর্তটি তো হলো কবিত্ব। তার ব্যাখ্যা এখানে নাই বা করা হলো।

৫. কোনো সময়ই কবিতা লেখার অনুকূল বা প্রতিকূল নয়, হ'তে পারে না। তা নির্ভর করে একমাত্র কবিরই মনের গড়নের ওপর। (সুধীন্দ্রনাথের যুক্তিপ্রত্যয়ী বিদগ্ধ মনও তবু কেন নিজেরই মেরুতে আবর্তিত হ'তে হ'তে নিখিল নাস্তিতে অবসিত হয়! জীবনানন্দও কি তাঁর নিজের মতো ক'রেই এক চিত্রিত মায়ালোক রচনা করেন না!) কিছু না থাকলেও তো একজন কবির কাছে রয়েছে তার শৈশব, বয়ঃসন্ধি, বয়স্কের মানসিক প্রসার, প্রেম বা জীবনের দাবি, কিংবা জীবনেরই অসংগতির, দুঃখের, চেতন-অবচেতনে মৃত্যুরও দ্যোতনা, ব্যক্তি-স্বরূপের আলো-আঁধারি, কিংবা— প্রতিমুহূর্তে পতন অথচ পুনরুত্থানের বোধ,— স্মৃতি, সময়, প্রবহমানতা। ঐ অভিজ্ঞতা কে কেড়ে নিতে আসবে?

তা ছাড়া, ঠিক একজন কবির দায় কি অন্যজনে ব'য়ে নিতে পারবেন?

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা
ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
₹১০০

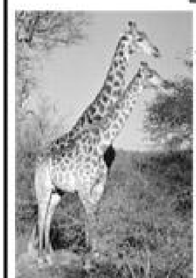

আফ্রিকার জঙ্গলে
আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা
ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি
চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড।
ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন।
ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া।
ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া।
মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া।
চেক রিপাবলিক। নেপাল।
নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়
জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়।
হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া।
অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ।
কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়
অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:
for Preview: www.bhraman.com

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত একাদশ কবিতা

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

কে এই মহা-আগন্তুক?

কালীকৃষ্ণ গুহ

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে কেউ কেউ গল্পকার হিসেবে চেনেন, কেউ কেউ কবি হিসেবে, কেউ কেউ কবি-গল্পকার-চিত্রকর-ভাবুক হিসেবে এবং একজন আশ্চর্য মানুষ হিসেবে চেনেন। ১৮ অক্টোবর '১৩-তে ৭৬ বছর বয়সে মারা গেলেন তিনি। নিজেকে ছোট পত্রিকার লেখক হিসেবে প্রায় অজ্ঞাতবাসে জীবন কাটিয়ে গেলেন। তাঁর এই অপরিচয়ের আরও একটা কারণ হয়তো এই যে তিনি পরিণত বয়সে, নব্বইয়ের দশক থেকে, লেখালিখিতে প্রকৃত মনোযোগ দেন, অনেকটা আদিষ্টের মতো! কিন্তু তাঁর লেখা যখনই কোনও সংবেদনশীল পাঠকের চোখে পড়েছে তখনই তিনি শিহরিত হয়ে প্রশ্ন করেছেন: কে এই মহা-আগন্তুক? বর্তমান প্রতিবেদকও এই প্রশ্ন থেকে তাঁকে পড়া শুরু করেন এবং তাঁর রচিত প্রতিটি বাক্য— কবিতায় গল্পে সন্দর্ভে আত্মজীবনীতে ব্যবহৃত প্রতিটি বাক্য— পড়তে হয় তাঁকে।

বহুকথিত আধুনিকতার চর্চার ব্যাপার এখানে প্রায় কিছুই নেই। নাগরিক বিষাদ বা উল্লাস খুঁজে পাওয়া যাবে না তাঁর লেখায়। মনে হবে, সংসারের মাঝখানে আসন পেতে বসেছেন এই লেখক আর তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে অবলোকন ও ব্যাখ্যা করছেন সংসারকে, সংসারকে ঘিরে থাকা চরাচরকে, পরিব্যাপ্ত নশ্বরতাকে। যেন একজন সিদ্ধাচার্য সন্ধ্যা-ভাষায় কিছু গূঢ় রহস্যের কথা বলে যাচ্ছেন— সংক্ষেপে, আত্মমগ্ন বিস্তারে। সবই জীবনের কথা, সেখানে বাস্তবও অচেনা হয়ে যায় কখনও, কখনও কল্পনায় পরাবাস্তব মিশে গিয়ে। আপাতত এইটুকুই আমাদের বলবার কথা।

ঘটনাচক্রে তাঁর কিছু লেখা নিয়ে প্রকাশিত 'নারায়ণ মুখোপাধ্যায়' নামের স্মারকপুস্তিকাটি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। মনে পড়ছে, ২২ নভেম্বর মহাবোধি সোসাইটিতে নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় আহ্বায়ক মণীন্দ্র গুপ্ত-আলোক সরকার সহ তেত্রিশ জন প্রবীণ-তরুণ লেখক ও ভাবুকের কথায় বারবার শোনা যাচ্ছিল, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মূল্যায়নের সময় একদিন আসবে। এই মুহূর্ত থেকে শুরু হোক সেই কাজ। সে কাজে আমাদের বন্ধু অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নিজেকে জড়ালেন। তাঁকে ধন্যবাদ।

না পি ত ব উ

নাপিতবউ নখ কাটতে এসেছে অবেলায়।
তার ঘোমটা খোলে না।

এই আবরণ খুলে দাও খুলে দাও—
আবেদনেও তার কোনও কানই খোলে না।
তার হাতে নরুন ঝিকোয়—
কাল অপসারণের ধার এবং ঝিলিক।
সূর্য পাটে বসে। আম-জাম-দিনের কথা।
পুকুরের জলে কাঁ হৈরি ঘিণি মেলি...
নাপিতবউ বলে, ত্বরা করো ত্বরা করো
সন্ধে হয় হয়;
সকল দুখের প্রদীপ

ছো ট কা কী

একসময় এই পৃথিবীটা আমাদের ছোটকাকীর মতো ছিল।
বড়ঘরের মেয়ে, অপরূপ সুন্দরী কিন্তু মাথায় সামান্য ছিট।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ছোটকাকীর মাথার ছিট
পাগলামো থেকে উন্মত্ততায় গেল।

এখন সে বাড়ি থাকে না
এবং যে-কোনও দিন সে সবকিছু ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে।

সং সা র প ট

ঘর এবং পথের মাঝখানে তৃতীয় ভূমিতে জলের একটি ফোঁটা।
পাশে, ধুলোয় ধুলো এই সংসার।
বাতাস ঘুরছে চক্রাকারে
গাছ থেকে পাতা ঝরছে গাছের গোড়ায়

দূরে একটি সরীসৃপ নানা রঙে ফণা সাজিয়ে
গূঢ় চেয়ে আছে।

পূ র্ণ ক বি

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের শেষ পর্বে কবি ব্যাস নিজে এসে হাজির।
হাতে কালির দাগ। রাত্রি জাগরণে
চক্ষুদুটি লাল। দীর্ঘ চুল নেমে এসেছে পিঠ-অব্দি,
মুখভরা দাড়ি।

একটি জীবন গেছে কাব্য রচনায়— বিষে ও অমৃতে।
পা দুখানি হয়ে উঠেছে পাথর।
বড় তৃষ্ণা।
দীর্ঘ দীর্ঘ কান্নারা সাঁতরাচ্ছে বাতাসে।

চতুর্দিকে মৃতদেহ। মৃত অস্ত্র, মৃত-অশ্রু।
শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন কলমটিকে,
কাঁদলেন দাউ দাউ করে
এইবার পূর্ণকবি হলেন।

অ নি বা র্য

মহাকবি ব্যাস অনেক ভেবেচিন্তে শেষঅব্দি
ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ করে নির্মাণ করলেন।
বললেন, 'ধৃতরাষ্ট্র, আমাকে মার্জনা করবেন!
আপনাকে অন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আমার কোনও
উপায় ছিল না।'

ধৃতরাষ্ট্র বললেন: জানি!
দীর্ঘতম কাহিনীতে অন্ধত্ব একান্ত জরুরী

কা লো মে য়ে

কালো রঙের কিশোরী দেখলে
আমার রামপ্রসাদী শুনতে খুব লোভ হয়।
কিন্তু ঘরভর্তি লোক থাকে
দেরিদা ফুকো হকিং একদিনের টেস্ট ম্যাচ ইত্যাদি।

আড্ডা শেষ হতে হতে বেলাও শেষ
সন্ধ্যায় তারা ফোটা রবীন্দ্র-রচনাবলী
তখন তো আর এইটুকু মেয়েকে ডাকা যায় না!

অ চ্ছে দ

আমাদের অগাধ পিসেমশায় জগদীশ ভট্টাচার্য
কালো রঙের সিল্কের পাঞ্জাবি পরে, হাতে 'প্রিয় সখি'
খোদাই করা টিনের বাক্স নিয়ে
একেবারে মধ্যরাতে স্তূপ-শ্বশুরবাড়ি এসে হাজির।

আমরা গভীর রাতে টের পেয়েছিলাম—
বজ্রনৌকা পদ্মখালে পড়ল।

র চ না স ম গ্র

গ্রন্থখানির রচয়িতা কে, আমরা জানি না।
গ্রন্থখানি আইন বিষয়ক অথবা হিসাবশাস্ত্র
কিংবা প্রেমের উপাখ্যান
— এর বিন্দুবিসর্গ জানার উপায় নেই।
খুলে দেখলে সবকিছু মনে হয়।

এর কোনও প্রচ্ছদ নেই।

এক মৃত ফকির একে তার ঝোলায় করে নিয়ে ঘোরে।
গরু-বাছুরের মতো নির্লিপ্ত দিন
তার পিছন পিছন যায়
যেন ফকির কোনও পাঠশালার গুরুমশায়
শূন্য-জ্ঞান লাভের আশায় চলেছে পড়ুয়ারা।

মিথ

কবিতা হল আসলে বেড়া বাঁধা
এখানে এই অন্তরভূমিতে যে কৃষিকাজ করেছি,
জল দিই, ধ্যান দিই, দুঃখের সার দিই—
ছাগলের রূপ ধরে অবজ্ঞা তা খেয়ে ফেলে।

বেড়া বাঁধি। ছোট্ট বাগানের নম্র কৃষিকাজ।
দুটো একটা ফল যা হয়ে ওঠে
নিজেরই দু বেলা অন্নে লেগে যায়,
বিক্রি করি না।

কিন্তু, বেড়া বাঁধতে গিয়ে দেখি—
আকাশ থেকে কিশোরী এক নক্ষত্র নেমে এসেছে,
বলছে: আমি দড়ি ধরি আত্মার ওপাশে দাঁড়িয়ে!

আ ন র্থ্য

জলের ধারে ঘোরে শিয়ালী
এ-দুঃখের আখড়া এই মন।
মন বহে নিয়ে যায় রাধিকা-বায়ু।
ঘোমটায় ঢাকা কদম্বগাছ।

ওরে ও শিয়ালি, তোর অনন্ত পিপাসা,
ঘরে তোর সংসারের কঙ্কাল।
এ-জীবনে কে কী পায় তা জানলি না!
জলের ধারে ধারে ঘুরে সন্ধে হল!

কাহিনী

পিসেমশায় বললেন, যাত্রা নাস্তি।
এদিকে পিসিমার বাপের বাড়ি যাওয়া প্রয়োজন—
ছোটবউয়ের বাচ্চা হবে, প্রথম পোয়াতি।
হৃষ্টপুষ্ট পাখি ডাকছে; নদীর জল
ব্রতকথার মতো শান্ত; আকাশভরা তারা,
পানসুপারী মুখে দিয়ে চাঁদ।

বহুদিন পর এক পীর এসেছে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে।
পীর জানত না যে ঠাকুর্দা গত হয়েছেন;
ঠাকুর্দার আত্মার প্রতি তার দুর্বোধ উচ্চারণ।

দাওয়ায় আজ পড়শীদের ভিড়—
এ-বাড়ির মাথাখারাপ মেজবউ
একখানি কাহিনী লিখে খবরের কাগজে পাঠিয়েছিল
আজ তা ছাপা হয়ে এসেছে।
তাতে এ-সংসার চিত্রিত হয়েছে।

কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

৬

চিৎপুর রোড

'চিৎপুরের বড় রাস্তা মেঘ করলে কাদা হয়-ধুলোয় ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গটরার সঙ্গে গাজন বেরিয়েচে। প্রথমে দুটো মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘড়ি বাঁশে বেঁদে কাঁদে করেছে—কতকগুলো ছেলে মুগুরের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে-তার পেচোনে এলো মেলো নিশেনের শ্রেণী। মধ্যে হাড়িরা দল বেঁদে ঢোলের সংগেতে 'ভোলা বোম ভোলা বড় রঙ্গিলা লেংটা ত্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে হাড়ের মালা', ভজন গাইতে গাইতে চলেছে।'

—হুতোম পেঁচার নকশা

হুতোম প্যাঁচার নকশা থেকে চিৎপুরের রাস্তার যে-ছবি ফুটে ওঠে তা একেবারে ক্যামেরাবৎ। না, ক্যামেরায় যে-ছবি ধরা যায় তা তো এক হুবহু আলোকচিত্র, কিন্তু হুতোমের বর্ণনায় যে-ছবি দৃশ্যমান তা হল ক্যামেরা ও দৃশ্যের মধ্যে যদি একটি প্রিজম রাখা যায় তা হলে যে বঙ্কিম চিত্র দেখা যেতে পারে লেন্সে, হুতোমের নকশা ঠিক তেমনই।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজকে জানতে হলে হুতোম পেঁচার নকশা পড়া অবশ্যপ্রয়োজনীয়। তাঁর গ্রন্থটির প্রতি পদে পুরনো কলকাতার নানা ছবি এক আশ্চর্য প্রিজমের মধ্য দিয়ে বিদ্ধ করবে পাঠকের চোখ। হুতোম প্যাঁচা মানেই পুরনো কলকাতা।

কিন্তু হুতোমের আগেও তো ছিল আর এক কলকাতা। ইতিহাসের পিছু পিছু ধাওয়া করে সেই পুরনো কলকাতা খুঁজে বার করাই তো এই কলামের লক্ষ্য।

কলকাতার যে-কয়টি রাস্তায় এখনও ট্রাম দেখা যায় তাদের মধ্যে চিৎপুর একটি। কলকাতার পুরনো রাস্তাগুলি প্রস্থে যথেষ্ট কম, ফলে সেই রাস্তাগুলি ঘিঞ্জি হওয়াটাই স্বাভাবিক। ধীরগতির ট্রামের মতোই ঘিঞ্জি চিৎপুরের জনজীবনের ধীর গতি। সেই শ্লথ জীবনযাপনের পিছু পিছু ধাওয়া করলে পাঠকের সামনে প্রতিভাত হবে এক অন্য চিৎপুর। চিৎপুর ঠিক এমনই একটা রাস্তা যার সঙ্গে ওতপ্রোত আছে নানা মিথ।

দ্বিজ মাধবাচার্যের চণ্ডীকাব্যে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রা বর্ণনা প্রসঙ্গে বরানগর কালীঘাট ইত্যাদি জায়গার সঙ্গে চিত্রপুরের উল্লেখ আছে। মোগল বাদশাহের আমল থেকে এই পথটির অস্তিত্ব।

উত্তরে দক্ষিণেশ্বর থেকে দক্ষিণে বেহালা— এই এলাকা একসময়ে ছিল সাবর্ণদের জমিদারি। তখন চিৎপুরের এই রাস্তার দু'দিকে ছিল অসাড় জঙ্গল। তখন এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত ছিল এক জাগ্রত চিত্তেশ্বরী দেবীর মন্দির।

সাবর্ণদের পুরনো কাগজপত্র দেখে জানা যায় চিৎপুরের চিত্তেশ্বরী কালীও ছিল তাঁদের সম্পত্তি। চিত্তেশ্বরী মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি রাস্তা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল কালীঘাটের কালীমন্দির পর্যন্ত। রাস্তাটিকে কোনও একসময় পিলগ্রিম রোডও বলা হত।

কিংবদন্তি এই যে, চিত্তেশ্বরী দেবী চিতু নামে এক ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত দেবী। এই দেবীর সামনে নাকি নরবলি দেওয়া হত। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে, মনোহর ঘোষ বা মহাদেব ঘোষ নামে এক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করেন চিত্তেশ্বরী মন্দির। মন্দিরের মাথায় লেখা আছে ১৬১০, অর্থাৎ এই সালেই প্রতিষ্ঠা এই মন্দিরের। মনোহর ছিলেন হুগলি জেলার বালির ঘোষ পরিবার। ইনি ছিলেন রাজা টোডরমলের গোমস্তা। পরে হন মুহুরি। বাস করতেন সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। মোগল-পাঠান যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সুবর্ণরেখার কাছ থেকে উঠে এসে বসতি করেন চিৎপুরে। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাও সেই সময়ে। কিন্তু পরে ডাকাতের অত্যাচারে চিৎপুর ত্যাগ করে চলে যান ব্যারাকপুরের নোনাচন্দনপুকুরে।

সম্ভবত এই ডাকাতই চিতু। সে-ই অতঃপর এই মন্দিরের দখল নিয়ে পুজোয় বসত ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে।

চিৎপুর রোডের শুরু একদিকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী রোড, অন্যদিকে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড। বেশিরভাগ লোকেরই ধারণা চিৎপুর রোডই আসল চিৎপুর। কিন্তু আসলে তা নয়। এই রাস্তার আদিরূপ বাগবাজারের খালের উত্তর থেকে আরম্ভ করে 'গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরি' পর্যন্ত। চিৎপুর রোডের আসল নাম 'রোড টু চিৎপুর' বা চিৎপুর যাওয়ার রাস্তা।

আরও স্পষ্ট করে বললে চিৎপুর রোড আসলে উত্তরের সুতানুটি ও দক্ষিণের কলকাতা— এই দুটি গ্রামের মেরুদণ্ডের মতো।

বিশেষজ্ঞদের মতে, হয়তো একসময় চিৎপুরে ছিল সুতার নুটির হাট, তখন পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি বা ইংরেজ বেনিয়ারা সুতো কেনাকাটি করতে জাহাজ নোঙর করত ভাগীরথীর তীরে— সেই থেকে জায়গার নাম হয় সুতানুটি।

বাগবাজারের খালের উত্তরদিকের পারে ছিল চিৎপুর। চিত্তেশ্বরীর মন্দির-সংলগ্ন অঞ্চলকে চিত্তেশ্বরীপুর বা চিৎপুর বলা হত।

চিৎপুর রোডের ধারে সতেরোশো তিরিশ সালে গোবিন্দরামের প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন সতেরোশো সাঁইত্রিশ সালের মহাঝড়ে ও ভূমিকম্পে ভেঙে পড়েছিল। স্যার হলওয়েল সাহেবের আমলের ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন নতুন করে। গোবিন্দরাম মিত্রের নানা রকম খ্যাতি ছিল। তিনি কুমারটুলির মিত্রগণের আদিপুরুষ। ছিলেন সরকারি দপ্তরের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর নামে নাকি ডাকাতেরাও কেঁপে উঠত ভয়ে।

আজ সেই চিৎপুরের রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য দোকানপাট, অট্টালিকা গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন কলকাতার পাশে আজকের চিৎপুর এখনও ধরে রেখেছে পুরনো কলকাতার এক খণ্ডচিত্র। হুতোম যে আশ্চর্য কলকাতার ছবি এঁকেছেন অতি সযত্নে, সেই কলকাতা খুঁজতে গেলে পাঠককে বলি চিৎপুরে এসে তিষ্ঠ ক্ষণকাল, এই হল হুতোমের তির্যক বাণে বিদ্ধ হওয়া সেই পৃথিবীর একটি টুকরো।

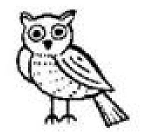

অনলাইনে কিনতে ▸ www.swarnakshar.in

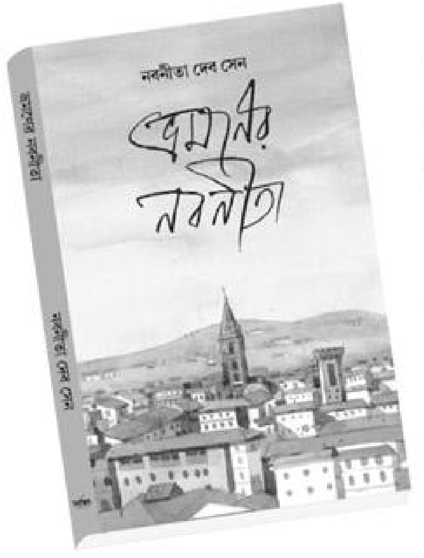

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণকথা
ভ্রমণের নবনীতা
নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

ক য়ে ক টি চি ঠি

সুদিন ফেরার প্রতীক্ষায়

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকাটি নিয়মিত পড়ছি। বড় অসময়ে পত্রিকাটি বের করছেন আপনারা। জীবনকে এখন টানছে ফাস্ট ফুডের মতোই 'ফাস্ট' জীবনযাপন, 'ফাস্ট' জানাশোনা, 'ফাস্ট' পড়াশোনা। আলস্যময় বর্ষার বিকেলে বিভূতিভূষণ-পাঠ কিংবা শীতের দিনে লেপের ওমে শরদিন্দুর ব্যোমকেশ-কাহিনীর কাঁটায় শিহরিত হওয়ার দিন হয়তো আজ অতীত। সেই কবে ১৯২১ সালের ২৪ নভেম্বর লেখা রবীন্দ্রনাথের গানটির কথা মনে পড়ে যায়— 'সময় কারো যে নাই'। মনে পড়ে সেই গানে তাঁর সেই আর্তি: গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে। পরিস্থিতিটা ইতিবাচক দিকে তো পাল্টায়নি-ই, বরং আরও খারাপ হয়েছে। ফলে, এটা স্পষ্ট যে, সমাজের একটি অতি মুষ্টিমেয় শ্রেণির কথা ভেবেই আপনাদের এই উদ্যোগ। নিশ্চিতভাবেই বেশ খানিকটা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও, একটা মহান আদর্শে ভর করে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিক ভাবে 'কালের কষ্টিপাথর'-এর মতো একটি উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশের কাজটি করে চলেছেন আপনারা। বর্তমান যেমনই হোক, মহাকালের খাতায় আপনাদের কাজ নিশ্চয়ই অমরত্ব পাবে।

বর্তমানটা অন্যরকম বলে দুঃখ করার কোনও কারণ দেখি না। বরং তলিয়ে দেখলে একটা অন্যরকম স্বাদ পাচ্ছি। আধুনিক শহরের মাপে গড়ে উঠতে থাকা এক মফস্‌সল জনপদে থাকি। অবসর জীবন কাটাই। মাঝেমধ্যে কলকাতা শহরে যখন আসি কার্যোপলক্ষে, ছুটতে থাকা জনস্রোতের দিকে চেয়ে থই পাই না। এখন মফস্‌সলের আস্তাতেও ইংলিশ মিডিয়াম, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নেট-স্লেট, কেরিয়ার। অফিস-টাইমে আমাদের নিরিবিলি ছায়াচ্ছন্ন স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটাও অসংখ্য অফিসগামী যুবক-যুবতীর কলহাস্যে ভরে থাকে। ভাবতে থাকি পশ্চিমবঙ্গের গভীরে, আরও গভীরে, স্টেশনে স্টেশনে এরকমই মুখরিত ভিড় আরও কিছুক্ষণের মধ্যেই কলকাতার অফিস-চত্বরে উত্তাল ঢেউয়ের মতোই আছড়ে পড়বে। সকাল থেকে রাত এঁরা 'টার্গেট' নামে এক মায়াহরিণীর পিছু ধাওয়া করে আবার গাঢ় রাতে ফিরে আসবেন নতুন গজিয়ে ওঠা কোনও ফ্ল্যাটবাড়ির খোপে। তার আগে সঠিক যানবাহন পাওয়া নিয়ে উদ্বেগ থাকবে, সময়ে ট্রেন ধরার জন্য ছুটোছুটি থাকবে, একটুর জন্য হাত ফসকে যাওয়া ক্লায়েন্টের জন্য অনুতাপ থাকবে, আরও ভাল কোনও পে-প্যাকেজের প্রস্তাব নিয়ে টানাপোড়েন থাকবে, থাকবেই। এর মধ্যে বই এসে দাঁড়াবে কোথায়?

মনে পড়ছে কয়েক মাস আগে 'কালের কষ্টিপাথর'-এর সম্পাদকীয় কলমেই পড়েছিলাম, সম্পাদক রাজ্য সরকারকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, ঘরে ঘরে বই কি পৌঁছে দেওয়া যায় না? ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে শুরু হওয়া 'ছিন্নবিচিন্তা'তেও লেখক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রসঙ্গ টেনেছেন দেখলাম। স্বপ্ন হিসেবে অনবদ্য, কিন্তু বাস্তবে সেই প্রশ্নটাই দেখা দেবে, পড়বে কে? পড়বে কখন?

পরিস্থিতি যা তাতে বরং সাহিত্যের প্রসারে সিনেমা একটা অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছে, যা গত কয়েক দশকে দেখতে পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। এই প্রজন্মের ক'জন 'চাঁদের পাহাড়' পড়েছেন, তা নিয়ে ঘোরতর সন্দেহ হয়। কিন্তু পড়েননি বা পড়ার সুযোগ-সময় পাননি, পড়া উচিত ছিল, এই গ্লানি থেকেও অনেকে ছবিটা দেখতে গিয়েছেন, এটা আমায় মুগ্ধ করেছে। অথচ দেখুন, সিনেমার পর্দাতেও গল্পটিকে মূলানুগ থাকতে হয়েছে এবং শঙ্করের কোনও মোবাইল ফোন নেই, সে ইন্টারনেট কী তা জানে না, অর্থাৎ আধুনিক জীবনযাত্রার উপাদানগুলি সম্পর্কে সে একেবারেই অজ্ঞ— এসব মেনে নিয়েও দর্শকদের একটা বড় অংশ কিন্তু ছবিটি দেখতে গিয়েছেন ওই বোধ থেকে যে, আমাদের অতিসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদকে জানা দরকার, পরবর্তী প্রজন্মকেও জানানো দরকার।

ছবিটি বক্স অফিসে সফল হওয়ার পর অন্তত দশটি কমিকস্ বেরিয়েছে ওই একই কাহিনী নিয়ে, একই নামে। কলেজ স্ট্রিটের এক বিখ্যাত বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে সেদিন দেখে এলাম সেগুলির চাহিদা। দেখলাম, দোকানের মালিক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নির্দেশ দিচ্ছেন, কমিকস-এর ফর্মাগুলি বাঁধাতে দাও, না হলে চাহিদা সামাল দেওয়া যাবে না।

সাহিত্য পড়া হচ্ছে না বলে হা-হুতাশের মধ্যেও এ দৃশ্যগুলিকে কুর্নিশ না জানিয়ে পারি না। তখন মনে হয়, একদিন ছবিটা নিশ্চয় বদলাবে, তার জন্য বেঁচে থাকতে হবে 'কালের কষ্টিপাথর' কিংবা আরও কয়েকটি সহযাত্রী পত্রিকাকে। আমাদের সাহিত্যবোধের খাতে জল শুকিয়ে গেলেও একদিন নয় একদিন অকৃপণ বৃষ্টি কি হবে না? যে প্রেমিকার সঙ্গে বহুকাল দেখা নেই, তার জন্যও কি হৃদয়ের কুঠুরিতে একটি প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে থাকে না অপেক্ষমান প্রেমিক! বাংলা সাহিত্য নিয়ে আমরাও সেরকম অপেক্ষা করার বল পাই মনে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, নিজের আরব্ধ কাজে সফল হোক 'কালের কষ্টিপাথর'।

অমিত তরফদার, *গোবরডাঙা*

প্রাচীন কলকাতার কথা

আমার এই চিঠির অবতারণা আপনাদের পত্রিকায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্ট্রিট লেন বাই-লেন' শীর্ষক লেখাটি পড়ে। এই কলামটি আমি শুরু থেকেই পড়ছি। ভাল লেগেছে কিন্তু কখনও তা নিয়ে সম্পাদকীয় বিভাগে চিঠি লেখার তাগিদ অনুভব করিনি। কিন্তু ফেব্রুয়ারির 'কালের কষ্টিপাথর'-এ আহিরীটোলা স্ট্রিট নিয়ে লেখাটি খুবই মুগ্ধ করেছে। হয়ত সেটা এজন্য, আমি একসময় ওই অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলাম। পরে কলকাতার অন্য প্রান্তে চলে যাই। তবু উত্তর কলকাতার প্রতি একটা টান আজও অনুভব করি।

তপনবাবু খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে তথ্য সংগ্রহ করে আহিরীটোলার নামকরণ ও ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন। রাজা নবকৃষ্ণ দেব, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর হালদারের মতো প্রাচীন কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। এ জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। আমার মনে হয়েছে, আরও কিছু প্রসঙ্গ আলোচনা করলে লেখাটি হয়তো সর্বাঙ্গীণ হতো। যেমন, উত্তর কলকাতার এই অঞ্চলে অসংখ্য আটচালা ছিল, যার কথা তপনবাবু এক জায়গায় বলেছেনও। অষ্টাদশ শতকের এই কলকাতা শহরে আজকের মতো জনবিস্ফোরণ ঘটেনি। সন্ধ্যা নামতে এরকমই এক আটচালায় প্রতিদিন নিয়ম করে গান গাইতেন রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু, যিনি বাংলা টপ্পার জন্মদাতা। স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে, তাহলে মনে হয়, তপনবাবু-উল্লিখিত কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়ের আটচালাতেই এই আসর বসত। পরবর্তীকালে খানিক দূরে আর-এক আটচালায় গানের পাল্টা আসর বসাত রূপচাঁদ পক্ষীর দল। এ সম্পর্কে আলোচনা পড়তে চাই।

ছি ন্ন বি চি ন্তা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনের শেষে ঠিকানা মফস্‌সল—নিজস্ব চিত্র

পর্ব: ২

> বসতের পুজোমণ্ডপের লাগোয়া ক্লাবঘরে লাইব্রেরি বসল। একজন তাঁর ঘরের একটা আলমারি দান করলেন। দুটো সস্তা বুক-র‍্যাক তৈরি করিয়ে নেওয়া গেল। বইয়ে স্ট্যাম্প করে, নম্বর লাগিয়ে ঋণযোগ্য করে তোলা হল।

পুরনো একটা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি।

ছাত্রজীবনের শেষদিকে নতুন একটা বসতপত্তনে বাস-বদল করতে হয়েছিল। নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্তের নয়া বসত। ছোট-ছোট একহারা একতলা বাড়ি, ক্বচিৎ অর্ধসমাপ্ত দোতলা। কোথাও আধখানা পাকা, আধখানা কাঁচা, খানিকটা বাঁধানো ছাদ, বাকি খোলার বা টিন-অ্যাসবেস্টসের চালা। নতুন পথঘাট হল। প্লটে-প্লটে বাঁশ-বাখারির বেড়ার ভিতরে বাড়ির সামনে-পিছনে সবজির-ফুলের আধখেঁচড়া বাগান। কলাবতী ফুলের ঝাড় বেশিরভাগ বাড়িতে। সবুজ ছাপিয়ে সিমেন্ট-বালির গন্ধই তখনও নাকে এসে লাগে। বাসরাস্তা বেশ দূর। রিকশা চালু হয়নি। হাঁটতেই হয় যেতে-আসতে। ক্রমে একটা-দুটো করে দোকান উঠল। বাজার বসল তখনও কাঁচা, আপাকা রাস্তায়। ইশকুলও বসেছে— প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি, গোটা এলাকায়— আরও ক'টা নয়া বসত মিলে ইশকুল ওখানে এই একটিই— তখনও টিনের চাল, পাড়ার এক-আধজন উচ্চপাঠ্য ছেলের স্বেচ্ছাশ্রম প্রয়োজন হয়েছে বেতনভুক মাস্টারমশাইদের সঙ্গে। তাদের কেউ পাশ করে ইশকুলেই বহাল হল। ইশকুলেরও পরিসর বাড়ল, ছাদ হল, ক্রমে দোতলা হল সে, দোতলার ওপরে তিনতলাও হল একদিন। মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিকও হল, আমরা পরিহাস করতুম, যে হারে বাড়ছে, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও না হয়ে পড়ে। কিন্তু তার সমৃদ্ধি-যশ যতই হোক, সেই আদিযুগে আমাদের কয়েক মাসের স্বেচ্ছাশ্রম তার সঙ্গে জড়ানো আছে।

বাড় অবশ্য অনেক দিনই থেমে গিয়েছে। নামযশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে উঠেছে গোটা অঞ্চলের, আমাদের সঙ্গে তার স্পর্শ

হারিয়ে গিয়েছে। আমাদের নয়াবসতও তার Identity হারিয়ে ফেলেছে অনেকদিন। দোকান-পসার-ফ্ল্যাটবাড়ি-হালচাল-গাড়ি-বাইক-অটোর ভিড়ে সে আজ আর-একরকম হালফিল হয়ে উঠেছে একটু-একটু করে। সেখানেও পুরনো স্পর্শ বলতে কিছু নেই। কিন্তু সেই পুরনো সত্যযুগে, বাড়ির জমানো বইয়ের সঙ্গে আরও অনেক উৎসাহীর সঞ্চয়ের বই জোড়াজুড়ি করে সাধারণের একটা স্থানীয় লাইব্রেরি করেছিলাম। 'করেছিলাম' বলছি। তার কারণ আমার সেই অল্পবয়সের উৎসাহই অনেক বড়-ছোট স্থানীয়কে ধোঁয়া দিয়েছিল। বসতের পুজোমণ্ডপের লাগোয়া ক্লাবঘরে লাইব্রেরি বসল। একজন তাঁর ঘরের একটা আলমারি দান করলেন। দুটো সস্তা বুক-র‍্যাক তৈরি করিয়ে নেওয়া গেল। চাঁদা তুলে কিছু গল্প-উপন্যাসের বই কেনা হল। লাইব্রেরির স্ট্যাম্প, চাঁদার বই, বই দেওয়া-নেওয়ার হিসেবের বড় খাতা, ক্যাটালগের জাবদা তৈরি হল। নিজে হাতে ক্যাটালগ লিখলাম। আরও সব প্রাথমিক লেখা। বইয়ে স্ট্যাম্প করে, নম্বর লাগিয়ে ঋণযোগ্য করে তোলা হল। সবই নবিশি ধরনের, বলা বাহুল্য।

বদলির চাকরি নিয়ে যেদিন ঘর ছাড়তে হল, লাইব্রেরি সম্বন্ধে প্রসন্নতা জমে উঠেছিল ততদিনে— অনেকখানি বেড় ধরে পুরুষ-মহিলারা বই বদলাতে আসতেন নিয়মিত। নতুন বইয়ের বাহানা দিয়ে যেতেন কেউ-কেউ। চাকুরিস্থল থেকে বাড়ি আসতাম মাঝে মাঝেই। কিন্তু লাইব্রেরির সঙ্গে সম্বন্ধ, আর লাইব্রেরিও ভাঙতে শুরু করেছিল একটু-একটু করে। আর ক'-বছরের মধ্যেই দেখতে পেলাম, লাইব্রেরি নেই। ভিতরে গিয়ে দেখলাম, আলমারিটা আছে। কিন্তু বইয়ের জায়গায় সেখানে অন্য সব জিনিস। র‍্যাকগুলো উধাও। অত বই হয়েছিল— গেল কোথায়? ছেলেরা কেউই জানে না। জানবার আগ্রহও নেই। বই নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই। তাস আছে, ক্যারাম আছে, আরও কিছু আছে— কী হবে জেনে?

বেশ কতকবছর পর, নতুন সময় তখন সত্যি চাক্ষুষ হয়ে উঠেছে, মনে পড়ল পুরনো সে লাইব্রেরি-ঘরটার কথা। ঘর আছে, কিন্তু নতুন সাজ চড়েছে, টিভি বসেছে, পুরনো আলমারিটা নেই, নতুন শো-কেস, তার মধ্যে হরেক সামগ্রী— কী, তা জানার আর কৌতূহল নেই। নতুন ছেলেরা আছে, তাদের একমাত্র ব্যসন বোধকরি তাস— নিরিমিষ্যি তাস নয়, তাসের জুয়া। আমার রবাহূত ঢোকা বোধহয় কেউ অনুমোদন করল না। বেরিয়ে এলাম। পুরনো সব সম্বন্ধই কবে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে অজানিতে।

স্থানীয় কাউন্সিলরের বয়স কম। রাজনীতির মানুষ, কিন্তু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতে অতি সজ্জন। খোঁজখবর করেন, সদালাপী। আমায় সম্ভবত ভিতর থেকেও অপছন্দ করেন না, কথায় মনে হয়, সেই সুবাদে একদিন কথাটা পাড়লাম। বললাম, আপনারা তো নানা কাজে অনেক খরচাপাতি করেন! গোটা অঞ্চলে একটা লাইব্রেরি নেই। আজকের ছেলেদের সময়ও নেই, হয়তো লাইব্রেরিতে উৎসাহও নেই। একটা লাইব্রেরি করুন না এখানে। বাছাই বই নিয়ে আসুন। বাংলা-ইংরেজি কাগজ রাখুন যতগুলো পারেন। একটা ফ্রি রিডিংরুম করুন। সাধারণের উৎসাহে আজ আর কোনও কাজ হওয়ার নয়। সরকারি উদ্যোগেই হোক। আপনারা তো পত্রিকাও বের করেন মাসে-মাসে। এটাও তো একটা জনকল্যাণের কাজ। অন্তত আমায় স্বেচ্ছাশ্রমিক হিসেবে পেতে পারবেন।

আপনার ওই বাজে বই যারা ছাপে, ফলাও বিজ্ঞাপন দিতে থাকে, লোক ডেকে বক্তৃতা দেওয়ায়, পুরস্কার দেয়, তারপর নামজাদা লোক ধরে লম্বা-লম্বা লেখায়, নানান সরকারি দপ্তর বা লাইব্রেরি আছে, সেখানেই চড়াদামে হাজার-দু'হাজার বেচে দুনো মুনাফা তুলে নেয়।

ধৈর্য ধরে শুনলেন সব কথা। একটু পরেই উচ্চ হাসি। তারপর সংক্ষেপে খালি বললেন, 'পাগল হয়েছেন?'

উচ্চ হাসি আর সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে সম্পূর্ণ পরাস্তই হওয়ার কথা। তবু একটু পর দম নিয়ে ফের বলি, 'কেন, পাগল কেন?'

আবারও সংক্ষেপেই বললেন, 'বই কে পড়বে?'

বললাম, 'যদি না পড়ে তো বুঝতে হবে পায় না তাই পড়ে না। আপনারা তো চারধার ঘোরাঘুরি করেন, বহু মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেন, আপনার কি মনে হয়নি, অনেক লোক আছেন। সাধারণ সংসারে ব্যতিব্যস্ত লোক, কিন্তু একটা ভালো বই পেলে খুশি হন। একটা সাধারণ পাঠাগার যদি হাতের কাছে থাকত, নিদেন সেদিনের কাগজটা দেখতেও যেতেন, 'আর একটা বই নিয়ে আসতেন খুশির পাঠ্য বলে।'

'ওই ধারণাতেই থাকুন।' হাসলেন, উচ্চ হাসি নয়, তবু হাসি। 'বিনা দরকারে কেউ বই পড়ে? পাঠ্য ছেলেও নোটবই পড়ে, নয়তো টিচারের নোটস্। আগের থেকে প্রশ্ন যদি আঁচ করতে পারে। ওই ক'টা প্রশ্নেরই আনসার পড়ে যায় নোটস্ থেকে। কী হবে পড়ে? তাছাড়া সময় কোথায় আজকের দিনে? আর আপনি বলছেন বাজে বইয়ের কথা। তাও টেক্সট বুক লাইব্রেরি হলে এক কথা। ও-সব বইয়ের মধ্যে বড়মানুষদের ঘরে চলে যাকে বলে বেডসাইড বুক। না হলে লোকে পড়তে পারে সিনেমাস্টারদের বা ক্রিকেটস্টারদের কথা। আপনার ওই বাজে বই যারা ছাপে, ফলাও বিজ্ঞাপন দিতে থাকে, লোক ডেকে বক্তৃতা দেওয়ায়, পুরস্কার দেয়, তারপর নামজাদা লোক ধরে লম্বা-লম্বা লেখায়, নানান সরকারি দপ্তর বা লাইব্রেরি আছে, সেখানেই চড়াদামে হাজার-দু'হাজার বেচে দুনো মুনাফা তুলে নেয়। আপনি ভাবছেন, লেখার কদর! লোকের অবসর থাকলে তো পড়বে। বড়-বড় সংস্থা নিজেদের লেখক বানিয়ে নেয়, তারপর তাদের দিয়ে লিখিয়ে রংদার মলাটের মধ্যে ছেপে ন'লাখি খবরকাগজ মারফত নিত্যি জানান দিতে থাকে, লেখককে মঞ্চে তুলে মালাটালা দিয়ে বই প্রকাশ করে। প্রেস-ব্যবসারই একটা অঙ্গ।'

দিব্যজ্ঞানের কথা শুনে পুরোই রক্তশূন্য লাগতে থাকে।

মনে পড়ে যায় জানিত এক কবির কথা। শরৎ চলে যাওয়া, ঠান্ডা পড়ে যাওয়া দিনের ঢলা দুপুরে শ্যামখৃস্টান বাগানের বড় গাছে ঠেস দিয়ে আধশোয়া শতকওয়ারি কবিতার সংকলন খুলে পড়ছেন পুরনো কবির কবিতা 'কুকু'— পড়তে-পড়তেই অদূর মহীরুহের আবডালা থেকে ভেসে এল আনচান করা কুহু ডাক, আর পরক্ষণে তারই অনুরবের মতো আরও পাঁচটা গাছ থেকে বেজে উঠল অগুন্তি তীক্ষ্ণ কুহুর লহর।

পড়ন্ত বেলা। উঁচু-উঁচু গাছের ফাঁক দিয়ে জাফরি-কাটা নরম লালচে রোদের নকশা পড়েছে বাগানের ঘাসজুড়ে। স্বপ্নের মতো সত্যিকার কায়বস্ত দিবাস্বপ্ন। ধর্মের তুরীয় তো জানা নেই, কবিতার দিব্যস্বাদ এইটুকু। মনোগত ছাপার পঙ্‌ক্তি কায় ধরে ভরে উঠেছে সামনে। চিত্ত আর দর্শের মিলন ঘটেছে এক অক্ষররেখায়। সৎ, চিৎ আর আনন্দের ঐকতানের মতো।

বই-টই

বহুমূল্য সাহিত্যকোষ

আমাদের সমাজে বহু মানুষ নীরবে, প্রত্যাশাহীনভাবে, নিজের জিজ্ঞাসায় আর আনন্দে এমন সব কাজ করে গিয়েছেন যা সমাজের মঙ্গলে লেগেছে। যেমন, অভিধান রচনার কাজ। এঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রয়েছেন। এইসব কাজ বিপুল মেধা ও শ্রমসাধ্য। তাত্ত্বিকভাবে সৃষ্টিশীল কাজ হিসেবে এইসব কাজকে গণ্য না-ও করা হতে পারে। কিন্তু এইসব কাজের মূল্য যে-কোনও সৃষ্টিশীল কাজের সমান সন্দেহ নেই। এই বর্গে মনে আসবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন বা চলন্তিকা-প্রণেতা রাজশেখর বসুর নাম বা একালের অশোক মুখোপাধ্যায়ের নাম। এই বর্গে আরও বহু নামের পাশে স্থান পাওয়ার দাবি থাকবে জাহিরুল হাসানের। এই কথা তাঁর 'বহুমুখী সাহিত্যকোষ' হাতে নিয়ে বলতে হচ্ছে। জাহিরুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই বইটি নিয়ে আরও কিছু মুগ্ধতার কথা বলার থাকবে আমাদের, কিছু প্রশ্ন থাকবে, হয়তো দু'একটি প্রস্তাবও থাকবে।

যে মনোভাব নিয়ে জাহিরুল কাজটি করছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। তিনি জানিয়েছেন 'আমার এই স্বল্পসঞ্চিত ধন পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে দেখেছি মানুষের কাজে লাগে এগুলি।' নিজের সঞ্চিত ধন ভাগ করে নেওয়ার বা অন্যকে তার ভাগ দেওয়ার মনোভাব সমাজকে এগিয়ে দেয়। আমরা জানি, তিনি বেশ কিছু কাল ধরে *সাহিত্যের ইয়ারবুক* প্রকাশ করে যাচ্ছেন। প্রকাশ করেছেন *সাহিত্যসঙ্গী* (১৯৯৬), মুসলমানকোষ (২০১৩)। বর্তমান গ্রন্থে তিনি যুক্ত করেছেন দশটি বিভাগ, যথাক্রমে—জীবনীকোষ, অব্যক্তিগত সাহিত্যকোষ, ইতিহাসকোষ: ভারত ও বিশ্ব, ইতিহাসকোষ: বাংলা সাহিত্য, পুরস্কারকোষ, বানানকোষ, পরিভাষাকোষ, উদ্ধৃতিকোষ, প্রবাদকোষ, মিথকোষ। বইটি হাতে থাকলে যে-কোনও সাহিত্যকর্মী উপকৃত বোধ করবেন। 'জীবনীকোষ' অংশে তিনি বাংলা ভাষার লেখকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন যার শুরু অক্ষয়কুমার দত্ত ('অ') থেকে। শেষে হেমেন্দ্রকুমার রায় (হ)। অবশ্য মৃত লেখকদেরই শুধু স্থান হয়েছে এই পরিচ্ছেদে। তা-ই হওয়ার কথা। নির্বাচনের এই

ন তু ন ব ই

জাহিরুল হাসানের

বহুমুখী সাহিত্যকোষ

পরিসর রাখতেই হয়। এই তালিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও স্থান পেয়েছে অবশ্যম্ভাবীভাবে। কিন্তু প্রশ্ন, তাঁর জন্যও মাত্র ১২/১৩ লাইন, যেমন বরাদ্দ হয়েছে রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী বা অন্য যে-কোনও লেখকের জন্য। এই সাম্যবাদ কি চলে? তাঁর সৃষ্টিধারা ও জীবনের পরিচয় দিতে গেলে কমপক্ষে ৮/১০টি পাতা রাখা উচিত ছিল। তাঁর সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিচয় ও একটি গ্রন্থতালিকা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। তবে তাঁর বিষয়ে লেখকের একটি মন্তব্য মনে রাখার মতো: কৃতী বাঙালিদের মধ্যে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। স্কুলের পাঠ শেষ না করেও সারা পৃথিবীর শিক্ষক।' কৃতী মানববিশ্বের মধ্যেও নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের স্থানের দাবি থাকবে। এই *জীবনীকোষ* নির্মাণের কাজে আরও বেশি সচেতনতা ও তথ্যনির্ভর সংযম থাকলে ভালো হত। রমেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী সম্পর্কে সুন্দর বিশ্লেষণ রাখার পর তিনি মন্তব্য করেছেন 'জীবিতকালে উপযুক্ত স্বীকৃতি পাননি।' কিন্তু রমেন্দ্রকুমার যে রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছেন তার উল্লেখ নেই। রমেন্দ্রকুমার ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধিত কবি। কিন্তু জ্ঞানমার্গের এই কবি, যিনি, জাহিরুলের ভাষায়, 'জ্ঞানের কণার সঙ্গে অনায়াসে মিশিয়ে দিতে পেরেছিলেন দৈনন্দিনের ধুলোবালি', তাঁর পক্ষে জনপ্রিয় হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রকৃত কবির স্বীকৃতি তিনি পেয়ে গিয়েছেন বলেই আমাদের মনে হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কত সালে মহেন-জো-দারোর সভ্যতা আবিষ্কার করেছিলেন তার উল্লেখ থাকলে ভালো হত। লেখকের আরও কিছু মন্তব্য মেনে নিতে অসুবিধে হয় আমাদের, যেমন— বিমল কর সম্পর্কে এই আলগা মন্তব্য, 'তবে উপন্যাসের চেয়ে গল্পই খুলত বেশি তাঁর হাতে।' এই জাতীয় বিচারকসুলভ মন্তব্য এড়িয়ে যাওয়াই কোষগ্রন্থের রচয়িতার কর্তব্য বলে মনে হয়। এই মন্তব্য পড়ার পর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যাবে বিমল করের অসাধারণ উপন্যাসগুলির কথা—*অসময়, খড়কুটো, দেয়াল বালিকাবধূ* ইত্যাদি। এইরকম আর একটি মন্তব্য সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সম্পর্কে, 'তবে উপন্যাসের চেয়েও বেশি পাঠক আকর্ষণ করেছে তাঁর গোয়েন্দা কাহিনিগুলি।' সাহিত্যের পাঠক জানেন, সাহিত্যকার হিসেবেই সিরাজের মহত্ত্ব, গোয়েন্দা-গল্পের লেখক হিসেবে নয়। ভাবতে ভালো লাগে যে আমাদের বন্ধু সামসুল হক ও ভাস্কর চক্রবর্তীর স্থান হয়েছে তাঁর তালিকায়। ভাবতে ইচ্ছে করে মানিক চক্রবর্তী ও শামসের আনোয়ারেরও স্থান হলে ভালো হত। খুবই দুঃখ হয় এই তালিকায় রবিজীবনীর মহালেখক প্রশান্তকুমার পালের বা আর একজন

রবীন্দ্রগবেষক ও জ্ঞানী লেখক সমীর সেনগুপ্তের নাম খুঁজে না পেয়ে। দুঃখ হয় হুমায়ুন আজাদের মতো সাহসী ও যুক্তিবাদী ভাবুক ও লেখকের স্থান হয়নি দেখে। ভালো লাগে মুসলমান-সমাজে বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের অন্যতম নেতা মোতাহার হোসেন চৌধুরীর কথা পড়ে, বেগম রোকেয়া বা সুফিয়া কামালের কথা পড়ে, এবং অবশ্যই সনজীদা খাতুনের পিতা কাজী মোতাহার হোসেনের কথা পড়ে। রামপ্রসাদ সেন সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন, 'রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর কিছু গান গাইতেন।' আগে এই তথ্যটি জানা ছিল না আমাদের যদিও একথা সর্বজনবিদিত যে তিনি প্রসাদি সুর ব্যবহার করেছেন তাঁর অনেক গানে, যেমন করেছিলেন বাউলের সুর, কীর্তনের সুর, সারিগানের সুর। জাহিরুলের দেওয়া তথ্যটি খুঁজে দেখতে হবে।

এবার *অব্যক্তিগত সাহিত্যকোষ* পরিচ্ছেদটি সম্পর্কেও কয়েকটি নিবেদন থাকবে আমাদের। *অক্ষরবৃত্ত* ছন্দ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য 'এতে শব্দধ্বনির অতিরিক্ত একটা সুর বা তান থাকে।' কথাটা বুঝতে কিছু অসুবিধে হয়। কী এই 'শব্দধ্বনির অতিরিক্ত একটা সুর বা তান'? অন্য দুটি ছন্দের তুলনায় অক্ষরবৃত্ত যে ধীরলয়ের ছন্দ, এই কথাটাই কি বোঝাতে চেয়েছেন লেখক? *উপভাষা* সম্পর্কে লেখক একটি মন্তব্য করেছে যা ভেবে দেখার মতো, 'বাংলায় এখন সাধুভাষার যে অবস্থা তাতে তাকে উপভাষা ছাড়া আর কীই বা বলা যায়!' রেনেসাঁস সম্পর্কে লেখকের একটি মন্তব্য সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে আনা অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করি, 'ইউরোপের এই নবজীবনের স্ফুরণ ঘটেছিল আরব যুক্তিবাদীদের সূত্রে গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যের সঙ্গে পুনপরিচয়ের ফলে!' গদ্যকবিতা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য, তা 'গদ্যের মতোই স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী।' আরও বলছেন, 'পর্ববৈচিত্র্য গদ্যকবিতার লক্ষণ।' আমাদের বিনীত বক্তব্য, গদ্যের যেমন নির্দিষ্ট পর্ব হয় না, গদ্যকবিতারও নির্দিষ্ট পর্ব হয় না, কেননা গদ্যকবিতা গদ্যে লেখা কবিতা, যদিও তা স্বেচ্ছাচারী কিনা জানি না। এক্ষেত্রে পাঠক নিজের মতো করে পর্ববিভাজন করে থাকেন। ব্যাকরণ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন, 'সুনীতিকুমারের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাকরণ দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ...।' তাই? ও ডি বি এল ব্যাকরণ? *মঙ্গলকাব্য*-কে লেখক 'প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলা-সাহিত্যের মধ্যে একটা বড় স্থান দিয়েছেন। আমাদের মনে যে প্রশ্ন উঠে আসে তা হল, মঙ্গলকাব্য-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য কি ঔপনিবেশিক সাহিত্য? এর সমাপ্তি তাহলে কবে কোথায় ঘটেছিল? *সন্ধ্যাভাষা* সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য, 'বাংলা ভাষার প্রাচীন রূপ, যার কিছু বোঝা যায় কিছু বোঝা যায় না।' তাই? আমাদের জানা ছিল, চর্যাপদের ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলা হয়েছিল বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের তত্ত্বের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করার কারণে।

এই পরিচ্ছেদটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিছু পত্র-পত্রিকার বিবরণও আছে। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা* সোমপ্রকাশ *সন্দেশ শিখা* সবুজপত্র কবিতা বা পূর্বাশা-র পাশে স্থান পেয়েছে *মোহাম্মদী মোসলেম ভারত সওগাত* পত্রিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এর যথার্থ্য প্রশ্নাতীত। তবে প্রশ্ন জাগে, সাম্প্রতিক অতীতের সাড়া-জাগানো পত্রিকা *কবিতা-পরিচয়*-এর স্থান হল না কেন বা কেন *উত্তরসূরি*-র মতো দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত পত্রিকাটি লেখকের নির্বাচনে উঠে এল না! জানি, সমস্তরকম নির্বাচন নিয়েই প্রশ্ন তোলা যায়। আমরা শুধু ত্রুটি খোঁজার যে চেষ্টা করছি না তা আশা করি পাঠক বুঝবেন। আমাদের উদ্দেশ্য লেখককে কিছু বিষয়ে সচেতন করা বা এক অর্থে, তাঁকে সাহায্য করা। আমাদের এত কথার ভিত্তিভূমিতে রয়েছে সংকলকের প্রতি মুগ্ধতার মনোভাব, যা আশা করি পাঠক বুঝতে পারবেন। বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে বহু কিছু জানা হয়ে যায়, যেমন— গাজি মানে ধর্মযোদ্ধা। লেখকের সব থেকে বড় অবদান, মুসলমান লেখক ও পত্রপত্রিকা সম্পর্কে বিবরণগুলি। দুই বাংলার লেখকের কথাই সাধ্যমতো বিস্তারিতভাবে জানিয়ে জাহিরুল আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

ইতিহাসকোষ: *ভারত ও বিশ্ব* অংশটিও নিঃসন্দেহে কাজে লাগবে সচেতন পাঠকের, যেমন প্রতি মুহূর্তে কাজে আসবে *ইতিহাসকোষ: বাংলাসাহিত্য* অংশটি। পড়তে পড়তে অনেক প্রশ্ন মনে আসে, যেমন— কেন বিশ্বের প্রাচীনতম সুমেরীয় সভ্যতার লেখক গিলগামিশের কথা নেই বা কেন নেই তর্কাতীতভাবে প্রথম বাংলা ভাষার সাহিত্যের নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উল্লেখ!

লেখক ৩১৪৪টি শব্দের বা শব্দবন্ধের একটি *বানানকোষ* তৈরি করেছেন। কিন্তু এই নির্বাচিত শব্দ-তালিকার মধ্যে কেন স্থান পেয়েছে ফোনিটিক্স, পোস্ট মডার্ন, পোস্ট মাস্টার প্লাস পয়েন্ট, হট-ওয়াটার ব্যাগ ইত্যাদি ইংরেজি শব্দ— বোঝা যায় না। এখাতে তো বানান নিয়ে কোনও দ্বিধা থাকার কথা নয়! বোঝা যায় না কেন *বিদ্যুৎরেখা* হয়েছে *বিদ্যুদরেখা* বা *বিপদসংকেত* হয়েছে *বিপৎসংকেত*। কেন *বৈদ্যুতিন* ও *বৈদ্যুতিণ*, দুটি বানান-ই রাখা হয়েছে বোঝা যায় না। কোষগ্রন্থে বা অভিধানে নিশ্চয় ভুল থাকা চলবে না। হয়তো সংকলক ভেবেচিন্তেই রেখেছেন তাঁর বানানগুলি! *গণ অবস্থান* বা *গণ আন্দোলন* কেন? আমরা শব্দদুটির মাঝখানে হাইফেন বসিয়ে সমাসবদ্ধ করার পক্ষপাতী। বোঝা যায় লেখক সমাসসচেতন, তাই তিনি সমাসযুক্ত পদের ব্যবহার বা বিযুক্তির অবস্থান বোঝাতে চেয়েছেন আর এ-বিষয়ে কিছু মতভেদ থাকবেই। সমাসবদ্ধ পদকে সমাসবদ্ধ না-রাখলে যে শুদ্ধ বাংলা লেখা যায় না লেখক তা জানেন বলেই এই তালিকায় এত ইংরেজি শব্দ বা শব্দবন্ধ জায়গা পেয়েছে। ঠিকই আছে। *আকুলিব্যাকুলি, আদবকায়দাদুরস্ত, উপপ্রধানমন্ত্রী* বা আমমোক্তারনামা-র মতো সমাসবদ্ধ পদ বা শব্দগুলিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে লেখক নিশ্চয় ধন্যবাদ পাওয়ার কাজ করেছেন।

এর পাশাপাশি পরিভাষাকোষটিও সুন্দর। তবে উদ্ধৃতিকোষ বা মিথকোষ নিয়ে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করিনি। বোঝা যায় না কেন মিথকোষে জায়গা পায় *গানের গুঁতো* বা *ঘাইহরিণী* বা *প্রকৃত সারস* বা *ফুলের বোঝা*।

প্রবাদকোষ-৩ সুকান্তর বিখ্যাত পংক্তি *পূর্ণিমাচাঁদ যেন ঝলসানো* রুটি লিখতে গিয়ে

অন্য স্বর

মুখবন্ধে জানিয়েছেন গ্রন্থকার, এ সব তথ্য নিয়ে তাঁকে সারা বছর ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়, এবং সব তথ্যই জমিয়ে রাখা তাঁর অভ্যাস। ক্রমে ক্রমে ভাঁড়ারও পুষ্ট হয়ে উঠেছে বিশাল। সে সব থেকেই বাছাই করে যা গড়েছেন, নিজেই বলেছেন, তা 'যতদূর সম্ভব নির্ভুল পরিবেশন'-এর চেষ্টা করেছেন। 'যতদূর সম্ভব' শব্দটি কিন্তু সামান্য সংশয়ের খোঁচা দিতেই পারে। যেমন হরেন ঘটকের মতো সাহিত্যিকের নাম বাদ গেছে। আবার 'অভ্যাসবশত বিচ্যুতি'র কথাও বলেছেন। যেমন একই বানান— কোষ একই পাতায় 'কোশ' হয়ে রয়েছে। এ সবই নগণ্য 'বিচ্যুতি'। সব কিছু নিয়ে শুভেচ্ছা-সহই আমার নিবেদন তাঁকে— এমন স্বীকারোক্তিতে খুঁত খোঁজার লোকজনও এ বঙ্গে কম নয়। কে জানে, সংক্রামকের মতো তা ছড়িয়ে পড়বে কি না! তবে স্যালুট আপনাকে, ভুল-বিচ্যুতির সম্ভাবনার কথা ভুলে হাত তুলছি আপনার দিকেই!

অনীশ ঘোষ

জাহিরুলের মতো পণ্ডিত মানুষও লিখলেন *পূর্ণিমার চাঁদ*। ভুল অবশ্য হতেই পারে। লেখক পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের পুরস্কারপ্রাপক লেখকদের তালিকা দিয়ে একটি প্রত্যাশিত ও প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। পাশাপাশি রয়েছে নোবেল পুরস্কারের তালিকাও।

আমরা এই আলোচনা আর দীর্ঘ না-করে এই কথা বলে শেষ করতে চাই যে এই বইটি প্রত্যেক লেখক ও সাহিত্যচর্চাকারী বা অনুরাগী বাংলা ভাষার পাঠক নিজের সংগ্রহে রাখলে উপকৃত হবেন। বলতেই হবে জাহিরুল হাসান একার প্রচেষ্টায় যে কাজ দিনের পর দিন করে যাচ্ছেন তাতে তাঁর প্রতি আমাদের আভূমি কৃতজ্ঞতার কারণ ঘটেছে। আশা করি কাজটি ক্রমশ আরও পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। এইরকম হওয়াই নিয়ম। লেখক নিজেও জানেন, 'এই ধরনের সংগ্রহ কখনোই সম্পূর্ণ নয়।' তাঁর এই জানাও প্রমাণ করে যে তিনি জ্ঞানী।

কালীকৃষ্ণ গুহ

ফিরে পড়া বই

ৎসাও শুয়ে চিনের
দি স্টোরি অব দি স্টোন

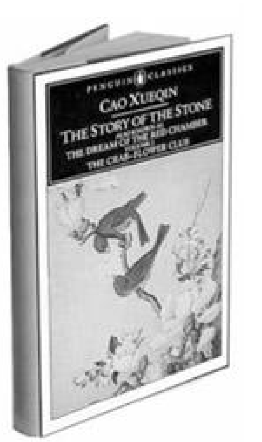

গাও ঝিংজিয়ান তাঁর নোবেল-ভাষণে কাফকার জীবনের সঙ্গে ৎসাও-এর জীবনের তুলনা টেনে বলেছেন, এই দুই প্রান্তবাসী মহৎ লেখকই স্রেফ আধ্যাত্মিক আনন্দ পাওয়ার জন্য লিখে গিয়েছেন, বিনিময়ে কখনও কোনও সামাজিক স্বীকৃতি আশা করেননি।

এযাবৎ লিখিত বিশ্বসাহিত্যের সেরা উপন্যাস কোনটি? সমালোচকরা, বিশেষত পশ্চিমি সমালোচকরা বহু বছর ধরে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। ইউরোপ-আমেরিকার সেরা ঔপন্যাসিকদের নাম উঠে এসেছে আলোচনায়। এখন উঠে আসছে বাকি বিশ্বের মহৎ লেখকদের নাম। স্তঁদলের 'লাল-কালো', গোগলের 'মৃত আত্মা', বালজ্যাকের 'বুনো গাধার চামড়া', গালদোসের 'ফরচুনাতা ও জাকিন্তা', মেলভিলের 'মবি ডিক', উগোর 'দুর্গতেরা', ডিকেন্সের 'বিবর্ণ বাড়ি', কুয়েরোজের 'পিতা আমারোর অপরাধ', ফ্লবেয়ারের 'আবেগপ্রবণ শিক্ষা', জয়েসের 'ইউলিসিস', ফকনারের 'ধ্বনি ও রোষ', রোঁলার 'জঁ ক্রিস্তফ', গোর্কির 'ক্লিম সামগিনের জীবন', মুসিলের 'একজন মানুষ যার কোনও গুণ নেই', ব্রচের 'স্বপ্নচারী', মানের 'জাদু পাহাড়'-এর পাশাপাশি উঠে এসেছে চিনুয়া আচেবে, হুয়ান রুলফো, আলেহো কার্পেন্তিয়ের, গার্সিয়া মার্কেজ, গুইমারেজ রোজা, কার্লোস ফুয়েন্তেস, এনগুগি ওয়া থিয়োংগো, র‍্যালফ এলিসন, লেজামা লিমা, রোয়া বাস্তোস, ভার্গাস লোসা, গ্র্যাসিলিয়ানো র‍্যামস, হোর্হে আমাদু, নাগিব মাহফুজ, ইয়াসের কামাল, জুনিচিরো তানিজাকি, য়ুকিও মিশিমা, হুলিও কোর্তাসার, অয়ি কোয়ি আরমা, জর্জ ল্যামিং, তায়েব সালেহ্, মোংগো বেতি, প্রমৌদিয়া অনন্তা তোয়েরের মতো লেখকদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির নাম (আমরা ভারতীয়রা আরও বেশ কিছু ভারতীয় নামের সংযোজন ঘটাতেই পারি, যাঁরা অনায়াসে এদের পাশাপাশি উল্লেখিত হতে পারেন)।

কিন্তু সব উপন্যাসকে ছাপিয়ে পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরের মতো বারবার উঠে এসেছে সাতটি গ্রন্থের কথা। আর সব উপন্যাসের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এই সাতটি উপন্যাসকে। এগুলি হল মুরাসাকি শিকিবুর 'গেঞ্জি-কাহিনি', ৎসাও শুয়ে চিনের 'পাথরের গল্প', সার্ভান্তিসের 'দন কিহোতে', দস্তয়েভস্কির 'কারামাজভ ভাইয়েরা', তলস্তয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি', প্রুস্তের 'হারানো কালের সন্ধানে' এবং কাফকার 'বিচার'। পৃথিবীর সমস্ত উপন্যাসের বীজ যেন এই সাতটি উপন্যাস। ইউরোপীয় সাহিত্যে 'কারামাজভ ভাইয়েরা' বা 'যুদ্ধ ও শান্তির' যে স্থান, সমগ্র এশিয়ার সাহিত্যে সেই স্থান 'গেঞ্জি-কাহিনি' এবং 'পাথরের গল্পে'র। যে আশৈশব অতীত-খনন এবং ক্ষমতাবান শ্রেণির শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণ প্রুস্তের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, তা আগাগোড়া উপস্থিত ৎসাও শুয়ে চিনের রচনায়। কাফকার লেখাকে যেমন আধুনিক বিশ্ব ও ক্ষমতা-ব্যবস্থার প্যারাবল বা নীতিগর্ভ রূপক-কাহিনি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই আখ্যা অনায়াসেই প্রযুক্ত হতে পারে 'পাথরের গল্প' সম্পর্কেও। প্রুস্ত ও কাফকার রসায়ন ঘটেছে ৎসাও শুয়ে চিনের উপন্যাসে। প্রুস্তকে বলা যায় ফরাসি সাহিত্যের 'ৎসাও শুয়ে চিন'। আবার ৎসাও শুয়ে চিন সম্পর্কে বলা যায়, চিনের 'হারানো কালের সন্ধানে'র রচয়িতা তিনিই। চিনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের মহত্তম ঔপন্যাসিকদের একজন হিসেবে সারা বিশ্ব তাঁকে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর ওপর বিপুল গবেষণার কাজ চলছে বিশ্ব জুড়ে।

প্রুস্ত-কাফকার মতোই ৎসাও শুয়ে চিনও (১৭১৫-১৭৬৩) ছিলেন স্বল্পায়ু। চিনের নোবেল-বিজয়ী গাও ঝিংজিয়ান তাঁর নোবেল-ভাষণে কাফকার জীবনের সঙ্গে ৎসাও-এর জীবনের তুলনা টেনে বলেছেন, এই দুই প্রান্তবাসী মহৎ লেখকই স্রেফ আধ্যাত্মিক আনন্দ পাওয়ার জন্য লিখে গিয়েছেন, বিনিময়ে কখনও কোনও সামাজিক স্বীকৃতি আশা করেননি। ৎসাও-এর প্রপিতামহ ছিলেন হান গোষ্ঠীভুক্ত, প্রপিতামহী ছিলেন সম্রাট খাংসির শৈশবের ধাত্রী। ১৬৪৪ সালে মাঞ্চুরিয়ার মাঞ্চুরা চৈনিক রাজবংশকে উৎখাত করে পিকিং-এ নিজেদের শিঙ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। মাঞ্চু গোষ্ঠীর শিঙ রাজবংশের (১৬৪৪-১৯১১) সম্রাট খাংসির আমলে ৎসাও-এর পরিবার সমৃদ্ধের চরমে পৌঁছয়। সমস্ত চৈনিক পুরুষকে তাঁরা শুয়োরের লেজের মতো টিকি রাখতে বাধ্য করতেন এবং ১৯১১-র বিপ্লব পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার সঙ্গে শাসন চালিয়ে যান।

ৎসাও-এর পিতামহ ৎসাও ওয়াইন (১৬৫৮-১৭১২) ছিলেন খাংসির শৈশবের খেলার সঙ্গী এবং ১৬৬৩-১৭২৮ সময়কালে কেবলমাত্র নানকিং সিল্ক ব্যুরোর কর্তা (টেক্সটাইল কমিশনার) এবং সম্রাটের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুর সরবরাহকারীই ছিলেন না, সেই সঙ্গে দেশের প্রথম ইন্সপেক্টর-

জেনারেল হিসেবে তাঁকে দেশের অভ্যন্তরীণ সমুদয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলিও সম্রাটের গোচরীভূত করতে হত। সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ, নিজে পাঁচ খণ্ডে কাব্যসংগ্রহ ও কয়েকটি নাটক রচনা করেন এবং চৈনিক কবিতার একটি ঐতিহাসিক সংকলন করে যান, যাতে ছিল দু'হাজারের বেশি কবির প্রায় পঞ্চাশ হাজার কবিতা। পরিবারের কেউ কেউ সামরিক বাহিনীতেও যোগ দেন। এই পরিবার এতটাই ধনী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে যে নাংকিং-এর দক্ষিণাঞ্চলে ইয়াং-জে উপত্যকায় সম্রাটের ছ'বারের পরিদর্শনকালে চারবারই তিনি ৎসাও-এর পরিবারে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ৎসাও ওয়াইনের দুই মেয়েকে ঝাংসি নিজের রক্ষিতা হিসেবে গ্রহণ করেন। সম্রাটকে এবং এই রক্ষিতাদের আপ্যায়নের জন্য তিনি একটি সুদৃশ্য বাগানসহ বিশেষ প্রাসাদ বানান। ঝাংসির রাজত্বকালের শেষদিকে নানকিংয়ে এই সম্মানিত পরিবারে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয় ৎসাও শুয়ে চিনের। তার নাম রাখা হয় ঝান।

১৭২২ সালে সম্রাট ঝাংসির মৃত্যুর পর তাঁর সন্তানদের মধ্যে ক্ষমতা-দখলের লড়াই শুরু হয়। চতুর্থ সন্তান সম্রাট ইউং চেং সিংহাসনে বসেন এবং চতুর এই সম্রাট নিজের ভাইদের, পিতার অনুগতদের মধ্যে যাকেই রাজনৈতিক শত্রু মনে করতেন, তাকেই সরিয়ে দিতে উদ্যোগী হন। ৎসাও পরিবারকে তিনি অবিলম্বে সমস্ত দেনা শোধ দিতে নির্দেশ দেন। ১৭২৭ সালে বেশ কয়েকবার সতর্ক করার পর তিনি ৎসাও পরিবারের বৃহৎ বাসভবন সহ সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। রাজ-অমাত্যদের ষড়যন্ত্রই ছিল এর মুখ্য কারণ। পরবর্তী সম্রাট শিয়েন লুঙের আমলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তার অনুচরেরা যখন খুশি লোকের ঘরে ঢুকে অনুসন্ধান, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, জেলে বা নির্বাসনে পাঠানো, ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা শুরু করে।

ৎসাও-এর পিতা তেরো বছরের ৎসাওকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পিকিং-এ চলে আসেন। তাদের পরিবার তখন পতনের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। ১৭৪২ সাল থেকে বাকি জীবন ৎসাও কাটিয়েছেন পিকিংয়ের পশ্চিমে পার্বত্য গ্রামাঞ্চলে। বিপুল পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও জীবনের শেষ ছ'বছর তিনি কাটিয়েছিলেন প্রবল দারিদ্র্যের মধ্যে। সবসময় পেট ভরে খেতেও পাননি। গোটা পরিবারের দিন কাটত শুধুমাত্র পরিজ খেয়ে। নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করে অর্থোপার্জন করতেন। তিনি কবিতা লিখতেন এবং ১৯৪০-৫০ সময়কালে মোটামুটি দশ বছর ধরে এই আত্মজৈবনিক

জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে, শোচনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের গ্লানি বহন করতে করতে যৌবনের সঙ্গিনীদের কথা ভাবছিলাম। নৈতিকতা ও বুদ্ধির বিচারে ওই মেয়েরা ছিল অতি উচ্চমানের। অথচ যার সান্নিধ্যে তারা আনন্দ পেত, সেই মানুষটি এই বিষণ্ণ-গুঁফো মানুষটির আড়ালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে।

উপন্যাসটি লেখেন। কিছুদিন গৃহশিক্ষকতা করেও উপার্জনের চেষ্টা করেন। চল্লিশ বছর বয়সে চাকরির চেষ্টায় সরকারি পরীক্ষাতেও বসেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসতেন এবং উপন্যাসে বহু স্বপ্নদৃশ্য ব্যবহার করেন। ১৭৬২-তে পুত্রের মৃত্যুতে ৎসাও সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েন এবং ১৭৬৩-র ১২ ফেব্রুয়ারি নববর্ষের দিনেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকজন স্বজনবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাসটির বেশ কিছু কপি করেন এবং শীঘ্রই পিকিংয়ে এই নকল করা পাণ্ডুলিপিটি একটি সংগ্রহযোগ্য বিষয় হয়ে ওঠে। পিকিংয়ের মন্দির-সংলগ্ন বাজারে উপন্যাসটির অনুলিখনকৃত পাণ্ডুলিপি বিক্রি হত। ৎসাও-এর মৃত্যুর প্রায় ত্রিশ বছর পর ১৭৯২ সালের জানুয়ারিতে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

মাঞ্চু রাজবংশের আমলে আঠারো শতকে ৎসাও উপন্যাসটি লেখেন। এ এমন এক সময় যখন সমস্ত জমির দখল নিয়ে নিচ্ছিল রাজপরিবারগুলি, অভিজাতেরা, আমলাতান্ত্রিক ভূস্বামীরা এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা। চলতে থাকে অবাধ ভয়প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ। সর্বস্তরে দুর্নীতির প্রকোপ দেখা দেয়। কৃষকেরা ক্রমেই তাদের জমি হারিয়ে ভূস্বামীদের প্রজায় পরিণত হচ্ছিল। সামাজিক বৈষম্য তীব্র আকার নিয়েছিল। কোথাও কোথাও বাধ্য হয়ে বিদ্রোহ করছিল। নানকিংয়ে, যেখানে ৎসাও-এর শৈশব কাটে, বস্ত্র-শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছিল। ছোট ছোট ভূস্বামীরা পর্যন্ত দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়াচ্ছিল। প্রথম অধ্যায়েই দেখা যায়, এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের পর এক ক্ষুদ্র ভূস্বামী দেউলিয়া হয়ে যায়। কৃষকদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ভাবে শোষণ করে সেই সময় বেশ কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর উত্থান ঘটে। শিয়া পরিবারের শেকড় প্রোথিত ছিল এই সামাজিক বাস্তবতায়। দুর্নীতিগ্রস্ত সামন্ত-সমাজের পতন ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থানই চিনের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক ৎসাও শুয়ে চিনের মহৎ উপন্যাসের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট।

উপন্যাসটি রচনা-প্রসঙ্গে ৎসাও লিখেছেন, 'জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে, শোচনীয় দুঃখ-দারিদ্র্যের গ্লানি বহন করতে করতে যৌবনের সঙ্গিনীদের কথা ভাবছিলাম। নৈতিকতা ও বুদ্ধির বিচারে ওই মেয়েরা ছিল অতি উচ্চমানের। অথচ যার সান্নিধ্যে তারা আনন্দ পেত, সেই মানুষটি এই বিষণ্ণ-গুঁফো মানুষটির আড়ালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। সেই মুহূর্তেই আমি আমার শৈশব-কৈশোরের সোনার দিনগুলি নিয়ে লিখব বলে স্থির করে ফেলি। সেই দিনগুলোয় আমি রেশমের পোশাক পরতাম এবং উপাদেয় খাদ্য খেতাম। পূর্বপুরুষদের নিরাপদ ছায়ায় বাস করতাম এবং আমার ওপর স্বর্গের হাসি বর্ষিত হত। জীবনের অর্ধেক সময় কেটে গিয়েছে, ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য কোনও একটি মাত্র দক্ষতাও আমি অর্জন করতে পারিনি। তাই বলে ওই অবিস্মরণীয় নারীদের তো আমি বিস্মৃতির গর্ভে মুছে যেতে দিতে পারি না। আমার চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দারিদ্র্যের ছোট ছোট চিহ্ন খড়ের চাল, ভাঙাচোরা জাফরি, দড়ির বিছানা, মাটির উনুন। কিন্তু আমি যখন আমার কল্পনার জগতে প্রবেশ করব, এসব কিছুই আর বাধা হতে পারবে না। আর ওই তো, আমার দুয়ারের ঠিক বাইরেই প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে। ভোরের বাতাস, বিকেলের শিশির, বাগানের ফুল আর গাছগাছালি— এরাই আমাকে লিখতে সাহায্য করবে।'

ৎসাও শুয়ে চিন নিজের পরিবারের এই উত্থান-পতনের কাহিনিই লিখেছেন 'রক্ত ও অশ্রু' দিয়ে লেখা, যেমন তাঁর এক বন্ধু বলেছেন, দুনিয়াখ্যাত 'পাথরের গল্প' উপন্যাসে। চারশোরও বেশি চরিত্রের সমাবেশে বৃহৎ সমস্ত পরিবার শিয়ার তিন পুরুষের ইতিহাসের ভিত্তিতে বিশাল ক্যানভাসে রচিত হয়েছে এই উপন্যাস। যদিও এই উঁচু দরের পারিবারিক কাহিনির সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে বিয়োগান্ত প্রেম-কাহিনি এবং দার্শনিক অনুধ্যান, রূপায়িত হয়েছে একটি যুগ ও

তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, ইতিহাস এবং সর্বোপরি চিনের ধর্ম-জগৎ। প্রুস্তের শৈশবস্মৃতির মতোই এই আত্মজৈবনিক আখ্যানও শুরু হয়েছে জিয়া পাও-ইউ-এর শৈশবস্মৃতি দিয়ে। যদিও প্রুস্ত নিজের নাম মার্সেলই ব্যবহার করেছিলেন, ৎসাও নাম পালটে হয়েছেন জিয়া পাও-ইউ। বহুদিক থেকেই প্রুস্তের উপন্যাসের সঙ্গে ৎসাও-এর রচনার তুলনা করা যায়। কৈশোরে ৎসাও অভিজাত পরিবার ও শাসকশ্রেণির রীতিনীতি দেখেছিলেন। পরবর্তী জীবনের দারিদ্র তাঁকে জীবনকে আরও গভীর ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করে। দান্তের বিয়াত্রিচের মতোই কৈশোরের এক বান্ধবীর স্মৃতিকে এই আখ্যানে লিন দাইয়ু নামের আড়ালে অমর করে রাখতে চেয়েছেন ৎসাও। এর পাশাপাশি রয়েছে স্বজন, বন্ধু, পরিচারিকাদের জীবন্ত, বিস্তৃত বর্ণনা।

অবশ্য এই উপন্যাসটি একটি বিকল্প নামেও পরিচিত, যা হল, 'লাল কক্ষের স্বপ্ন'। লাল কক্ষ একটি ইডিয়ম, যা আসলে ধনী পরিবারের মেয়েদের নিরাপদ শয়নকক্ষকে বোঝায়। 'লাল কক্ষের স্বপ্ন' বলতে তাই বোঝায় 'যুবতী নারীদের স্বপ্ন'। এরকমই একটা স্বপ্ন দেখেছিল দাইয়ু, উপন্যাসের পঞ্চম অধ্যায়ে, যেখানে বহু নারীচরিত্রের নিয়তির পূর্বাভাস ছিল। 'লাল' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ বৌদ্ধ মতে গোটা দুনিয়াটাই আসলে 'লাল ধুলো'। বৌদ্ধ ও তাও মতে, আলোকিত পথকে খুঁজে পেতে গেলে দুনিয়াটাকে স্বপ্ন ভাবলে চলবে না এবং জেগে উঠতে হবে। সামন্ত-ব্যবস্থার পতন ও অবক্ষয়ের অনিবার্যতাকেই তুলে ধরেছে এই মহান উপন্যাস। পাশাপাশি, পাও-ইউ এবং দাইয়ুর বিয়োগান্ত প্রেম-কাহিনিও সজল করে দেয় পাঠকের চোখ। এর পাশাপাশি আছে রূপকের মোড়ক, আখ্যানরীতির অপ্রত্যাশিত মোচড়। 'দন কিহোতে'তে যেমন সার্ভান্তিস, এই উপন্যাসেও তেমনই ৎসাও শুয়ে চিন নিজেই একটি চরিত্র হিসেবে এসেছেন। কাহিনিটির পাশাপাশি রয়েছে কাহিনিটি গড়ে ওঠার কাহিনি, ফলে দন কিহোতে বা ট্রিস্ট্রাম শ্যানডির মতো এটিও একটি 'মেটা-ফিকশান'।

মূলত জিয়া পাও-ইউ এবং দুই নারী লিন দাইয়ু এবং ঝু বাওচাই-এর একটি ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনিকে ঘিরে উপন্যাসের মূল কাঠামো গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ তো কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ৎসাও একটি নিছক প্রেম-কাহিনি লিখতে চাননি, তিনি একটি ট্র্যাজেডির সামাজিক উৎসে পৌঁছতে চেয়েছেন, শিয়া পরিবারের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতাকে মানবিক স্তরে এবং

'দন কিহোতে'তে যেমন সার্ভান্তিস, এই উপন্যাসেও তেমনই ৎসাও শুয়ে চিন নিজেই একটি চরিত্র হিসেবে এসেছেন। কাহিনিটির পাশাপাশি রয়েছে কাহিনিটি গড়ে ওঠার কাহিনি, ফলে দন কিহোতে বা ট্রিস্ট্রাম শ্যানডির মতো এটিও একটি 'মেটা-ফিকশান'।

শাসকশ্রেণির অবক্ষয় ও সামন্তবাদের অন্তর্নিহিত ভন্ডামি ও নিষ্ঠুরতাকে সামাজিক স্তরে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। দু'টি বিরুদ্ধ রাজনৈতিক শক্তি, একটি সামন্ত-ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে চাইছে, অন্যটি ভেঙে ফেলতে চাইছে, মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। প্রেম-মনস্তত্ত্ব-মানবিকতার পাশাপাশি সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি মিলেমিশে গড়ে তুলেছে উপন্যাসের শরীর। একটি বিয়োগান্ত প্রেম-কাহিনির পরিধি অতিক্রম করে উপন্যাসটি একের পর এক জটিল দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের স্তর পেরিয়ে সামগ্রিকভাবে সামন্ত-সমাজের অনিবার্য পতনের ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে ৎসাও সামন্তবাদ, তার দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি, বিবাহ-ব্যবস্থা, নৈতিকতা, নির্মমতা ও অমানবিকতার তীব্র সমালোচনা করেছেন। পুরো কাহিনিটাই বর্ণিত হয়েছে স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে। বুর্জোয়া ও অভিজাত-সমাজের বিশ্লেষণে প্রুস্তের উপন্যাস যেমন, সামন্ত-সমাজের বিশ্লেষণে ৎসাও-এর উপন্যাসকেও ঠিক সেভাবেই একটি এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে।

এই উপন্যাসের নায়ক জিয়া পাও-ইউ সামন্তবাদী অভিজাত সমাজে জন্মালেও গোড়া থেকেই এক বিদ্রোহী। নিজের বৃহৎ সামন্ত পরিবারের নৈতিক অবক্ষয় ও ভণ্ডামিকে সে ঘৃণা করে এবং পরিশেষে সেই পরিবার ত্যাগ করে চলে যায়। অভিজাত সমাজের প্রতি তার উদাসীনতায় এই বিদ্রোহী চরিত্রটিকে পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পুরুষদের ক্লান্তিকর জীবন সম্পর্কে তার রয়েছে তীব্র ঘৃণা, যদিও সামন্ত-ব্যবস্থায় শোষিত-নিপীড়িত মহিলাদের প্রতি রয়েছে গভীর সমবেদনা। এই সামন্ত-বিরোধী মনোভাব থেকেই সে সারাজীবন ধরে প্রকৃত ভালোবাসার সন্ধান করে গিয়েছে। লিন দাইয়ুর সঙ্গে তার বিয়োগান্ত প্রেম-কাহিনি প্রকৃতপক্ষে একটি সামাজিক ট্র্যাজেডি। লিন দাইয়ু নিজেও এক বিদ্রোহী নারী। তার জীবনের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে সামন্ত-সমাজে নারীর দুর্ভাগ্যপীড়িত নিয়তি এবং শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আখ্যান। পাও-ইউ এবং দাইয়ু চরিত্র দু'টিকে ৎসাও নিজের 'রক্ত ও অশ্রু' দিয়ে নির্মাণ করেছেন। পাশাপাশি, ৎসাও ঝু বাওচাই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সামন্ত-সমাজের প্রথাগত নারীর ছবি আঁকতে চেয়েছেন। কিন্তু সামন্ত-সমাজের অবক্ষয়-পর্বে সে নিজেও হয়ে উঠেছে এক ট্র্যাজিক চরিত্র। এর পাশাপাশি রয়েছে শিয়া পরিবারের নীচের তলায় বসবাসকারী গৃহকর্মে নিযুক্ত বহু সংখ্যক নারীর গ্যালারি যাদের অনেকেই দয়ালু, পবিত্র ও সাহসী। দস্তভয়েস্কি ও প্রুস্তের রচনার মতোই ৎসাও-এর মহান উপন্যাসেরও মূল সম্পদ এর চরিত্রগুলি, যাদের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, চিন্তা ও আবেগ, রোজকার জীবন তিনি গভীর মমতায় ও অন্তর্দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

উপন্যাসের কাহিনিটি এরকম, মায়ের মৃত্যুর পর লিন দাইয়ু নানকিং-এর শিয়া পরিবারে বসবাসের জন্য আসে। দাইয়ুর মা ছিল পাও-ইউ-এর নিজের পিসি। শিয়া পরিবার দেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী সামন্ত-পরিবারগুলির অন্যতম এবং এই পরিবারের বড় মেয়ে ইউয়ান-শুন সম্রাটের সেবাদাসী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ইউয়ান-শুন যখন আসত, তার সম্মানে এবং বিনোদনের জন্য বানানো হয়েছিল একটা সুবৃহৎ দর্শনীয় বাগান। পরিবারের বিরাট গৃহস্থালী সামলাত পাও-ইউ-এর দিদিমা। গোটা পরিবার ওই বাগানেই নৈশভোজ সারত। সুন্দরী ও প্রতিভাময়ী এই কিশোরী প্রথম দর্শনেই পাও-ইউ-এর প্রেমে পড়ে। যদিও অতিরিক্ত সংবেদনশীল হওয়ায় মাঝে-মধ্যেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ত। উচ্ছল স্বভাবের পিসতুতো বোন লিন দাইয়ুকে দেখে পাও-ইউ-এর মনে হয়েছিল, এই মেয়েটি পূর্বজন্মে ছিল এক লতা, যাকে সে বাঁচিয়ে রেখেছিল অনেক জলসিঞ্চনে। কিছুদিন পর পিসিমার মেয়ে সুন্দরী ঝু বাওচাই তার মায়ের সঙ্গে এল শিয়া পরিবারে বসবাসের জন্য। বাওচাই চরিত্রের দিক থেকে দাইয়ুর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সংযমী এবং চতুর।

পাও-ইউ জন্মেছিল রুপোর চামচ মুখে দিয়ে

আর দিদিমার প্রশ্রয়ে তার অপ্রাপ্য কিছু ছিল না। সে ছিল আবেগপ্রবণ, উচ্ছৃঙ্খল এবং অভিজাত জীবনযাপনের একঘেয়েমিতে ক্লান্ত। জন্মের সময় তার মুখের ভিতর পাওয়া গিয়েছিল মূল্যবান পাথর, যা তার জন্মগত আধ্যাত্মিকতার স্মারক। মেয়েদের সাহচর্যই তার প্রিয় ছিল এবং আত্মীয়া-পরিচারিকাদের মধ্যেই সময় কাটত। বাড়িতে ব্যক্তিগত সংগ্রহে প্রচুর ধ্রুপদী গ্রন্থ ছিল, কিন্তু সেগুলি পড়তে তার ভালো লাগত না। সামন্ত-পরিবারে সবাই যা চায়, সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদের প্রতিও তার কোনও মোহ ছিল না। সরকারি পরীক্ষাগুলোর জন্য প্রস্তুতি না নিয়ে সে সারাদিন কবিতা লিখত আর নিষ্পাপ মেয়েদের সঙ্গে খেলে সময় কাটিয়ে দিত। আভিজাত্য ও সামাজিক সম্মানের কোনও গুরুত্ব ছিল না তার কাছে। নারীকে অবদমিত রাখার সামন্তবাদী ঐতিহ্যের সে ছিল ঘোর বিরোধী। মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সে গুরুত্ব দিত। সে চাইত প্রেম ও স্বাধীনতা, অন্য কিছুর প্রতি তার কোনও আকর্ষণ ছিল না। দাইয়ুকে ভালোবাসার স্বাধীনতা চেয়ে সে লড়াই করতে চেয়েছিল, যা ছিল তার পরিবারে গর্হিত অপরাধ। তার ধ্যানধারণাগুলো ছিল যেমন নতুন, তেমনই তীক্ষ্ণ। সুদৃশ্য বাগানের বহু নিপীড়িত দাস-দাসী পাও-ইউ এবং দাইয়ুর সম্পর্কের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং যে যেভাবে পারে সাহায্য করেছিল।

ইতিমধ্যে রাজকর্মচারীদের সঙ্গে বিরোধে পরিবারে দুর্যোগ আসন্ন হয়। এই অবস্থায় পাও-ইউ মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে এবং তাকে ভালো করার জন্য বিয়ের বন্দোবস্ত শুরু হয়। সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী শিয়া পরিবার ছিল নিয়তিবাদী এবং বাওচাইকেই বধূ নির্বাচন করে। তাদের মতে, মূল্যবান পাথর এবং সোনার লকেটের বিবাহ হলে সেটাই হবে সঠিক জুড়ি, বিশেষ করে যখন এই বিয়ের প্রতীকী মূল্য রয়েছে। দাইয়ুর সঙ্গে পাও-ইউ-এর প্রণয়-সম্পর্কের কথা তাঁরা জানতেন এবং এই সম্পর্ক ভাঙার জন্য এক ধূর্ত কৌশল নেন। পাও-ইউকে দিদিমা, বাবা, কাকা প্রমুখেরা জানান, দাইয়ুর সঙ্গেই তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু গোপনে বাওচাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা তার পাকা করে ফেলেন। খবর কিন্তু চাপা থাকে না, শীঘ্রই দাইয়ু সমস্ত জেনে যায়। সে রক্তবমি করতে শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যায়। পাও-ইউ ভাবতে থাকে যে দাইয়ুর সঙ্গে তার বিয়ের দিন আসন্ন। বিয়ের দিনে যখন দাইয়ুর পরিচারিকা কনেকে সাজিয়ে আনছে, তখন অন্য ঘরে সম্পূর্ণ একা ধ্বস্ত শরীরে সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে। অবশেষে পাও-ইউ যখন জানতে পারে তার

পিতা পুত্রকে চিনতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন কথা বলবেন বলে তার দিকে এগোতে থাকেন, তখনই একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ও তাও সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। চিয়া চেঙ তাদের ধরবেন বলে ছুটতে থাকেন, কিন্তু আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।

বিয়ে হচ্ছে অন্য মেয়ের সঙ্গে, ততক্ষণে একাকীত্বে, শোকে, ঘৃণায় দাইয়ুর মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে শোকার্ত পাও-ইউ সম্পূর্ণ পাগল হয়ে যায়। অনেককাল পরে যখন তার সুস্থতা ফিরে আসে তখন সে ভেবেছে কত আনন্দের ছিল সেই কৈশোরের দিনগুলি! দাইয়ু এবং পাও-ইউ দু'জনেই নিজেদের পছন্দে পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করার স্বাধীনতা পেতে চেয়েছে, কিন্তু সামন্ত-পরিবারের নিষ্ঠুর চক্রান্তে তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা এভাবে অপূর্ণই থেকে যায়।

ইতিমধ্যে সম্রাটের সেবা করতে গিয়েছিল যে মেয়েটি সেই ইউয়ান-শুনের মৃত্যু হয়েছে এবং পরিবারের বিপর্যয় চরমে পৌঁছেছে। পাও-ইউয়ের কাকার গোপনে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে পদচ্যুতি ঘটেছে এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি সম্রাট বাজেয়াপ্ত করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে শিয়া পরিবারের বৃহৎ বাসভবন এবং সুদৃশ্য বাগানটিও। পাওয়ের বাবা চিয়া চেঙও এই অর্থনৈতিক ভাঙন ঠেকাতে পারলেন না। বাইরে নৈতিকতা নিয়ে বারফাট্টাই করলেও তিনি ছিলেন ভঙ্গুর স্বভাবের মানুষ। দিদিমা এই শোক সহ্য করতে না পেরে মারা গিয়েছেন। পরিবারের অপর এক সদস্যাকে অপহরণ করা হয়েছে। পাও-ইউয়ের অসুস্থতা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং মৃত্যু আসন্ন, এই অবস্থায় এক শ্রমণের আবির্ভাব ঘটে। জন্মের সময় মুখের ভিতর যে মূল্যবান পাথরটি নিয়ে সে জন্মেছিল, সেই হারানো পাথরটি নিয়ে এসেছেন সেই শ্রমণ। ধীরে ধীরে পাও-ইউ প্রকৃতস্থ হয়ে ওঠে এবং পূর্বের ঐশ্বর্য ও গৌরবের দিনগুলো ফেরাতে সরকারি চাকরির জন্য পরীক্ষা দিতে মনস্থ করে। পরীক্ষায় সে সপ্তম স্থান অধিকার করে, চাকরির আহ্বান আসে, বাওচাই তখন সন্তান-সম্ভবা। এই পরিস্থিতিতে কাউকে কিছু না জানিয়ে পাও-ইউ যেন কোথায় হারিয়ে যায়।

কিছুদিন পরে নানকিংয়ে মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে পাও-ইউয়ের বাবা চিয়া চেঙ পিকিংয়ে ফিরে আসছিলেন। রাতে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে নদী পার হওয়ার আগে তিনি মুণ্ডিত মস্তক খালি পা লাল উলের টুপি পরিহিত একজন শ্রমণকে দেখেন। শ্রমণ তার দিকে এগিয়ে আসে এবং মাথা নিচু করে অভিবাদন জানায়। পিতা পুত্রকে চিনতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন কথা বলবেন বলে তার দিকে এগোতে থাকেন, তখনই একজন বৌদ্ধ শ্রমণ ও তাও সন্ন্যাসী তাকে নিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। চিয়া চেঙ তাদের ধরবেন বলে ছুটতে থাকেন, কিন্তু আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না, তিনি বরফের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান।

বহু বছর আগে স্বপ্নে ঠিক এরকমটাই দেখেছিল পাও-ইউ। গোটা আখ্যানটিই গড়ে উঠেছে সেই স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে। স্বপ্নে সে হারিয়ে গিয়েছিল এক রূপকথার দেশে। সেখানে অনেক ছবি ও কবিতা যাদের অর্থ তার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। এক দেবী তাঁর পরিচারিকাদের মোট বারোটি গান শোনাতে বলেন তাকে। শেষ গানটি ছিল এইরকম : সরকারি উচ্চপদস্থ কর্তার পতন ঘটবে, ধনী মানুষটির সোনা-রুপো গলে যাবে, একমাত্র দয়া-মায়া-হৃদয়বৃত্তিই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে, হৃদয়হীন ব্যক্তিটি তার উপযুক্ত শাস্তি পাবে, যে অন্যের জীবন নেয় নিজের জীবন দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করবে, যে অন্যকে কাঁদায় সে ততক্ষণ কেঁদে যাবে যতক্ষণ না তার চোখ শুকিয়ে যায়, দুনিয়ায় থেকেও যে দেখতে পায় সে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করবে, ভালোবাসার কারাগারে যে বন্দি তার নিষ্ফল মৃত্যু হবে, যখন সব খাদ্য শেষ হয়ে যাবে পাখিরা উলঙ্গ পৃথিবীকে পিছনে ফেলে রেখে বনে চলে যাবে।

মোটামুটি এই স্বপ্নকে অনুসরণ করেই আখ্যানটি এগিয়ে গিয়েছে। বাইরের জৌলুস বেশিদিন শিয়া পরিবারের ক্ষয় ও পতনকে ঢেকে রাখতে পারেনি। এই পরিবারের পরজীবী ভূস্বামীরা ছিল আমোদপ্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত, পার্টিতে গিয়ে, জুয়া খেলে, বেশ্যালয়ে গিয়ে তারা দু'হাতে অপচয় করতেন। কৃষকদের শোষণ করে, তাদের ওপর ভারী করের বোঝা চাপিয়ে, নিজেদের সম্পদ ও

রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অপপ্রয়োগ করে, নিরীহ প্রজা ও পরিচারক-পরিচারিকাদের ঘৃণ্য-নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়ে, এরা নিজেরা অসংযমী ও অমিতব্যয়ী জীবনযাপন করতেন। ভিতরে ভিতরে এদের আত্মিক অবক্ষয় অবশ্য বহু আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিরাট গৃহস্থালীতে প্রভু ও ভৃত্যশ্রেণির মধ্যে, স্ত্রী ও রক্ষিতাদের মধ্যে, স্ত্রীদের সন্তান এবং রক্ষিতাদের সন্তানের মধ্যে, গৃহস্থালীর কর্তৃত্ব নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকত, একে অপরের বিরুদ্ধে সর্বদাই নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত, পরিবারে বহু মৃত্যু ও আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটে। পাও-ইউকেও একবার হত্যার চেষ্টা করা হয়।

এর পাশাপাশি আছে ভূস্বামীশ্রেণির নানা ভণ্ডামি এবং অসংযমের ছবি, প্রজাদের সরল-দরিদ্র জীবনযাপনের পাশে যা এক ধারাল বৈপরীত্যের সৃষ্টি করে। আয়ের তুলনায় বহুগুণ বেশি ব্যয় ও অপচয়ের বিবরণসমৃদ্ধ এই অধ্যায়গুলি পড়লেই বোঝা যায়, খুব শীঘ্রই শিয়া পরিবার দেউলিয়া হয়ে যাবে। পাও-ইউয়ের বৃদ্ধা দিদিমা ও তাদের কাছের মানুষেরা স্থল-জলের দামি খাদ্য ছাড়া আহার গ্রহণ করে না, সেগুলিও খায় সোনার প্লেট বা মূল্যবান পাথরের কাপে, জরির কাজ করা সিল্কের কাপড় ছাড়া পড়ে না, থাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত বৃহৎ বাসভবনে, বাগানের রক্ষণাবেক্ষণেও বেরিয়ে যায় বহু অর্থ। একবেলায় তারা যা খাদ্যের অপচয় করে, তা দিয়ে একজন চাষির সারাবছরের খাওয়া হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি বাইরে যতই ক্ষমতা ও জৌলুস থাক, প্রকৃতপক্ষে তারাও যে সম্রাটের করুণার ওপর নির্ভরশীল, সম্রাটের খেয়াল হলে যে কোনও মুহূর্তে সম্পূর্ণভাবে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিতে পারেন, এ সত্যকেও ভুলতে দেননি ৎসাও। আঠারো অধ্যায়ে দেখা যায়, সম্রাটের সেবাদাসী ইউয়ান-শুন আসবে বলে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে বৃদ্ধা দিদিমা সহ গোটা শিয়া পরিবার ভোর থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, তবু ঠিক কখন সে এসে পৌঁছবে সে ব্যাপারে তাদের সঠিক তথ্য জানানো হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাদের অতিথি এসে পৌঁছয় সন্ধ্যার ঠিক আগে।

শিয়া পরিবারের নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং ভারী করের বোঝা মেনে নিতে কৃষকরাও আর রাজি হচ্ছিল না। জমি ছাড়াও শুয়োর, মুরগি, মাছ, হরিণ, শস্য, কয়লা প্রভৃতির ওপরও কর দিতে হত। বন্যা, খরা, তুষারপাত বা শিলাবৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি হলে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত না। কৃষকরা রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে তাদের আমোদ-বিলাসের অর্থ জোগাত। এর ওপর ছিল মহাজনি ব্যবসা। উচ্চ সুদের হারে গরিব কৃষকদের তারা ঋণ দিত। সুদৃশ্য বাগানে

পরিত্যক্ত পাথরটি বিলাপ করছিল, বৌদ্ধ ও তাওবাদী দুই ভ্রাম্যমাণ শ্রমণ সেখানে হাজির হন এবং পাথরটিকে দেখে বিস্ময়াভূত হয়ে যান। পাথরটি তাদের কাছে পার্থিব জীবন-দর্শনের ভিক্ষাপ্রার্থনা করে যাতে সে আলোকিত পথকে খুঁজে পেতে পারে। শ্রমণদ্বয় পাথরের গায়ে খোদিত করে রচনা করে যায় এক আশ্চর্য আখ্যান।

পরিচারিকাদের প্রভুদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কে যেতে বাধ্য করা হত। তাদের অনেককেই পরে খুন করা হত বা তারাই আত্মহত্যা করতে বাধ্য হত। গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে এইসব ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন ৎসাও। উপন্যাসে বর্ণিত চারশোর বেশি চরিত্রের মধ্যে বেশিরভাগই নিপীড়িত দাস-দাসী। শাসকশ্রেণির সদস্যদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও কম। নিপীড়িত-শোষিত মানুষদের ওপর তারা যথেষ্ট অত্যাচার করত, মারত, গালমন্দ করত, তাড়িয়ে দিত। একদিকে অভিজাত ভূস্বামীদের সমালোচনা করে ৎসাও সামন্ত-সমাজের যাবতীয় অশুভকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এই উপন্যাসের আর-একটি বড় সম্পদ, পিতা-পুত্রের, দুই প্রজন্মের দ্বন্দ্ব, যা তুর্গেনেভের 'পিতা-পুত্র' উপন্যাসটি স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। চিয়া চেঙ যদি হন পুরনো সামন্তবাদী ভাবাদর্শের প্রতীক, পাও-ইউ তবে সামন্ত-বিরোধী সদ্যোত্থিত গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শের। এই বিরুদ্ধ সামাজিক শক্তিগুলিকে ৎসাও অসামান্য দক্ষতায় মিলিয়ে-মিশিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাশাপাশি, এই প্রেম ও পারিবারিক কাহিনিকে ৎসাও আগাগোড়া রূপকের মোড়কে পরিবেশন করেছেন। আর এই মোড়কটির প্রয়োজনেই এসেছে অতিলৌকিক উপাদান। আখ্যানের গোড়াতেই নুয়া নাম্নী দেবী এবং অতিলৌকিক সংবেদনশীল একটি পাথরের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহু যুগ আগে, সৃষ্টির আদিকালে আকাশের মেরামত করতে গিয়ে নুয়া ছত্রিশ হাজার পাঁচশো একটি পাথর জোগাড় করেন। একটি বাদে বাকিগুলিকে তিনি কাজে লাগান এবং ওই একমাত্র অব্যবহৃত সচেতন অথচ অদ্ভুতদর্শন পাথরকে পরিত্যাগ করেন। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পাথরটি যেখানে খুশি যেতে পারে এবং যেমন খুশি আকার ধারণ করতে পারে। যেহেতু অন্য সব পাথরকেই দেবী গ্রহণ করেছেন এবং শুধুমাত্র এই একটিকে পরিত্যাগ করেছেন, তাই তার দিন কাটে লজ্জায়, ক্ষোভে, দুঃখে, অনুতাপে।

একদিন যখন পরিত্যক্ত পাথরটি বিলাপ করছিল, বৌদ্ধ ও তাওবাদী দুই ভ্রাম্যমাণ শ্রমণ সেখানে হাজির হন এবং পাথরটিকে দেখে বিস্ময়াভূত হয়ে যান। পাথরটি তাদের কাছে পার্থিব জীবন-দর্শনের ভিক্ষাপ্রার্থনা করে যাতে সে আলোকিত পথকে খুঁজে পেতে পারে। শ্রমণদ্বয় পাথরের গায়ে খোদিত করে রচনা করে যায় এক আশ্চর্য আখ্যান। হাজার হাজার বছর পর সেই খোদিত লিপি চোখে পড়ে ভানিতাস নামে এক তাওবাদীর। ভানিতাস অমরতা অর্জনের গোপন মন্ত্র খুঁজতে বেরিয়েছেন। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ভানিতাস জানতে পারেন, এই সেই পরিত্যক্ত পাথর দেবী নুয়া যাকে আকাশ মেরামতের পক্ষে অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। যদিও পাথরটি এখন রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে এবং তাকে পার্থিব জগতে গিয়ে গিয়েছেন বৌদ্ধ ও তাওবাদী দুই মহান সন্ন্যাসী। পাথরটি এখন মনুষ্যজীবন কাটাচ্ছে এবং প্রস্তুত হচ্ছে নির্বাণলাভের জন্য। কোন দেশে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার পরিবার-গৃহস্থালী, কৈশোর-যৌবনের ক্রিয়াকলাপ, তার লেখা কবিতা সবই এতে লেখা আছে। শুধু নেই কোনও নির্দিষ্ট রাজবংশের নাম ও সময়কালের উল্লেখ। অথচ যাতে এই আখ্যানটি অনুলিখন করে প্রকাশ করা হয়, সে ব্যাপারে আর্জি জানিয়ে পাথরের গায়ে লেখা রয়েছে চারটি লাইন :

আকাশ মেরামতে ব্যর্থ হয়ে
দীর্ঘদিন বোকা ছিলাম আমি
আমার জীবন এই পাথরে লেখা
কে ছাপাবে করে অনুলিখন?

ভানিতাস জানতে চায়, ভাই পাথর, তোমার কাহিনিতে কী এমন আছে যে, একে তুমি ছাপাতে চাও? আমি তো এর মধ্যে ছাপার যোগ্য তেমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এতে কোনও রাজারাজড়ার কাহিনি নেই, চরিত্রগুলিও নেহাতই মামুলি, তারা কেউ রাজা-

মন্ত্রী-সেনাপতি নয়, কোনও সামাজিক বার্তাও নেই। শুধু কয়েকজন মহিলা, তাদের আবেগ, ভ্রান্তি, মামুলি প্রতিভা বা তাৎপর্যহীন গুণাবলি নিয়ে হাজির। একে ছাপালে তা মোটেই কোনও স্মরণীয় গ্রন্থ হবে না। ভানিতাসের অনুমান মিলে গেল এবং পাথরটিও কথা বলে উঠল। সে বলল, সমস্ত পুরনো প্রথা বর্জন করে ঠিক যেভাবে যা কিছু ঘটেছিল, তারই বিবরণ রয়েছে এই কাহিনিতে। এতে আমি আমার সর্বস্ব ঢেলে দিয়েছি। এ বই এত সতেজ, প্রাণবন্ত, জীবনের রসদে পরিপূর্ণ যে আর কোনও গ্রন্থে তুমি ঠিক এমনটি পাবে না। তোমাদের ঐতিহাসিক রোমান্সগুলোতে অতীতের সম্রাটদের যেসব কুকীর্তির বর্ণনা আছে, আমি তা লিখতে চাইনি। প্রেম-যৌনতার কাহিনিগুলি তো আরও অপাঠ্য, যা পড়ে আমাদের যুবক-যুবতীরা উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। বাকি রইল মহিলাদের বিশেষ পছন্দের রোমান্সগুলি, বইয়ের পর বইতে একই বিষয় নিয়ে লেখা, চরিত্রগুলিও সব এক শুধু নামগুলি আলাদা, প্রেমিক-প্রেমিকা এবং তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টিকারী তৃতীয় কোনও ব্যক্তি, এমনকী কখনও কখনও কুরুচিকরও বটে, আর কী অতিরঞ্জিত ভাষা!

পাথর বলে চলে, এইসবের থেকে ওই যে মেয়েদের কথা রয়েছে বলে তুমি বললে, যাদের আমি নিজের চোখ-কান দিয়ে অনুভব করেছি, তারা কী বেশি উপভোগ্য হবে না? আমি একথা বলছি না যে, আমার আগে লেখা বইগুলিতে যেসব মানুষের কথা আছে তাদের চেয়ে মানুষ হিসেবে তারা বেশি ভালো। আমি যা বলতে চাইছি তা হল, এই মানুষগুলোর আচরণ, অভিপ্রায় বা কার্যকলাপ বিষণ্ণ, একঘেয়ে জীবনে অনেক বেশি রসসঞ্চার করতে সক্ষম। এমনকী আখ্যানের মাঝে মাঝে যে পদগুলি রয়েছে, সেগুলিও প্রয়োজনে আনন্দ দিতে সুপারগ। আমার আখ্যানে যে সমস্ত মিলন ও বিচ্ছেদ, সুখ ও দুঃখ, ভাগ্যের ওঠানামার কথা রয়েছে, তা ঠিক যেভাবে ঘটেছিল সেভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। একটি বাড়তি আঁচড়ও আমি কাটিনি, পাছে প্রকৃত ছবিটি হারিয়ে যায়! শুধু এটুকুই বলার, ঘুম বা নেশার ঘোর কাটার পর, ব্যবসা নিয়ে উদ্বেগ বা বিষাদ কাটিয়ে কোনও ব্যক্তি যদি এই কাহিনি পাঠ করে, তবে সে যে শুধুমাত্র মানসিকভাবে সতেজ হয়ে উঠবে তাই নয়, হয়তো শিক্ষণীয়ও কিছু পাবে এবং জীবনের অসাড়-তুচ্ছ লক্ষ্যগুলির পিছনে ছোটাছুটি করা থামাবে, যে মূল্যবান প্রাণশক্তি সে হারিয়েছে, তার সামান্য হলেও হয়তো পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

পাথরের বক্তব্য শুনে ভানিতাস আত্মমগ্ন হয়ে যায় এবং সযত্নে দ্বিতীয়বার 'পাথরের গল্প' পাঠ করে। সে বুঝতে পারে, এই কাহিনির মূল বিষয় 'প্রেম'। এতে রয়েছে বাস্তব ঘটনাবলির বিবরণ। নৈতিক দূষণ বা দুর্নীতিমুক্ত হয়ে কাহিনিটি বলা হয়েছে। অতএব কাহিনিটি সে আগাগোড়া টুকে নেয় এবং একজন প্রকাশকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এই কাহিনিটির বিভিন্ন জনে বিভিন্ন নাম দিয়েছে। ৎসাও শুয়ে চিন তো দশবছর ধরে নিজের স্মৃতির স্টুডিওতে এই কাহিনিটি নিয়ে ভেবেছেন। অন্তত পাঁচবার তিনি কাহিনিটি আগাগোড়া পুনর্লিখন করেছেন, সম্পূর্ণ কাহিনিটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করেছেন, সেসব অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন, এবং প্রস্তাবনামূলক একটি চতুষ্পদীও কাহিনিটির সঙ্গে যোগ করে দিয়েছেন। এই চতুষ্পদীটি হল :

পৃষ্ঠাগুলি ভরে আছে অলস অক্ষরে
উষ্ণ, তিক্ত যত অশ্রু দিয়ে লেখা
যে পড়ে সে বলে, এই লেখকটি বোকা
বুঝতে না পেরে লুকনো বার্তাকে

অবশ্য এই পাথরের নিয়তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মায়াজগতের অপর একটি বস্তুরও নিয়তি। এই বস্তুটি হল একটি রক্তরঞ্জিত মুক্তোর ফুল। পাথরটি ওই ফুলকে একটি সুন্দরী নারীতে পরিণত করে এবং সেই নারী শপথ নেয় পার্থিব জগতে আজীবন দুঃখভোগ করে চোখের জলে সে পাথরের এই ঋণ শোধ করবে। এইভাবে আখ্যানের মূলসূত্রটিকে ধরিয়ে দিয়ে রূপকটি প্রস্থান করে এবং প্রবেশ ঘটে ৎসাও-এর সমসাময়িক আঠারো শতকের চিনের বাস্তব দুনিয়ার। এই পাথরটিরই পুনরাবির্ভাব ঘটে জিয়া পাও-ইউয়ের মাধ্যমে। পূর্বজন্মে যে ফুলটিকে সে চিনত, তার পুনরাবির্ভাব ঘটে লিন দাইয়ু হিসেবে। পাও-ইউ প্রথমে অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয় এবং আলস্য-শৈথিল্য তাকে আর দশটি সাধারণ পাথরের মতোই করে তোলে। দাইয়ুকে ভালোবাসলেও নিয়তি-তাড়িত জীবনে সে বাওচাইকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরে এক সমুচ্চ অজেয়-শক্তির তাড়নায় 'মূল্যবান পাথর' হিসেবে সে তার স্বমূল্য উপলব্ধি করে এবং তার এই ক্রমিক আত্মোপলব্ধির আখ্যান এই মহা-উপন্যাস। যাদের এখনও ঘুম ভাঙেনি এবং যারা এখনও আলোকপথের সন্ধান পায়নি, এই উপন্যাস তাদের চোখ খুলে দিতে পারে, দিতে পারে পবিত্র, আধ্যাত্মিক আলোকোজ্জ্বল পথের সন্ধান।

রাহুল দাশগুপ্ত

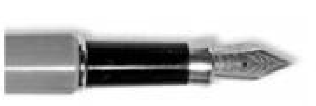

স্বর্ণাক্ষরে পত্রিকা

নারীযুগ

ভারতীয় ভাষায় প্রথম মহিলাদের দৈনিক সংবাদপত্র

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ভ্রমণ

বাঙালির ঘরের পত্রিকা, বাইরে যাবার

কালের কষ্টিপাথর

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ছেলেবেলা

ছোটদের পরমাশ্চর্য মাসিক পত্রিকা

****

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

****

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
গল্প ও কবিতা সংকলন
নিমফুলের মধু ₹৬০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

আমাদের সব বই ও পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যায়:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▶ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরাভ্রমণকাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▶ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
কালের কষ্টিপাথর
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 2 No. 8 □ 1 March 2014 □ Rs. 30 RN WBBEN/2012/50069

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com